ধর্ম
ও
অনুভূতি

ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের
অমৃতবাণীর যৌগিক রূপ

প্রথম ভাগ

কুড়িয়ে পাওয়া মানিক

প্রথম প্রকাশ - ১ম ও ২য় ভাগ ইং ১৯৬১ এবং ৩য় ভাগ ইং ১৯৬৩

বিশেষ পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ
১৭ই আশ্বিন ১৪২০ (ইং ০৪ঠা অক্টোবর, ২০১৩)
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
০৪ঠা অক্টোবর, ২০১৫

প্রকাশক
মানিক
প্রযত্নে - শ্রী স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ ঃ ৯৪৭৫০০৭১৬৮

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ
সূর্য্য কিশোর চন্দ্র
মোবাইল ঃ ৯৭৩২২৯০৩২৫ / ৮৫০৯৮৪২৫২৪

প্রচ্ছদ
শ্রী জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ
গ্যাল্যাক্সি প্রিন্টার্স
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা - ৭০০ ০৬৭

মূল্য ঃ ১০০/-

প্রাপ্তিস্থান
শ্রী পবিত্র কুমার দত্ত
৩৮/২৫ ভুবনমোহন রায় রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৮
দূরভাষ - ০৩৩-২৪৪৭-৩৪৬৩

শ্রী শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, বোলপুর,
বীরভূম - ৭৩১২০৪
দূরভাষ - ৯৪৭৫৪৭৪৬৭০

প্রাক কথন

বোলপুরের কৃষ্ণা ব্যানার্জী গত ৭.১২.২০১২ তারিখে এক স্বপ্নে দেখলেন, ‘‘আমি উঠোন ঝাঁট দিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখি ছোড়দা (বরুণ) ও স্নেহময়দা ‘ধর্ম ও অনুভূতি’ বইটার কিছু কিছু জায়গায় সংশোধন করছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছি - এই বইয়েরও সংশোধন দরকার হচ্ছে !” - স্বপ্নটি আমাদের ভাবিয়েছিল। এরপর ২০১৩-র এপ্রিলে কলকাতার সখের বাজারের এক ভদ্রমহিলা, নাম বাণী ঘোষ, স্বপ্নে দেখলেন, ‘‘বাড়িতে অনেক লোক এসেছে। আমি একজনকে বলছি - এদের জন্য পাণ্ডুলিপি দেখে আমায় রান্না করতে হবে। এমন সময় একটি সুন্দর দেখতে কম বয়সী ছেলে এসে আমাকে একটা বহু পুরোন দিনের খাতা দিল। খাতা খুলে দেখি কীসব লেখা রয়েছে। আমি খাতার পাতা উল্টে রান্নার পদ্ধতি কোথায় লেখা আছে খুঁজছি। ... ঘুম ভাঙল”। ভদ্রমহিলা পাঠে এসে স্বপ্নটি বলে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘পাণ্ডুলিপি” কথাটার মানে কী ? ওনার দর্শন শুনে আমরা বিস্মিত হলাম। কেননা সম্প্রতি ‘**ধর্ম ও অনুভূতি**’-র পাণ্ডুলিপি খুলে দেখা গেছে কয়েকটি স্থানে ছাপানো গ্রন্থের সঙ্গে কিছু অমিল রয়েছে। আমরা আরও অবাক হলাম এই ভেবে যে যিনি পাণ্ডুলিপি শব্দের অর্থও জানেন না তিনি এই স্বপ্ন দেখেছেন। পাঠচক্রে স্বপ্নটির ইঙ্গিত নিয়ে আলোচনা হলে প্রত্যেকে পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থ ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাই “**ধর্ম ও অনুভূতি**” প্রকাশের এই প্রয়াস। ক্ষেত্রবিশেষে পূর্বের সংযোজিত বিষয়গুলি পাদটীকা হিসাবে এখানেও রাখা হ’ল। আগ্রহীজন এই গ্রন্থ পাঠে তৃপ্তি পেলে এই উদ্যোগ সার্থক হবে।

ইতি
প্রকাশক

০৪ঠা অক্টোবর, ২০১৩
বোলপুর, বীরভূম

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

বিশেষ পরিমার্জিত সংস্করণের কপিগুলি দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ায় ২য় সংস্করণ ছাপানো হ’ল। পাঠকদের মধ্যে বইখানি যে বিপুল সাড়া ফেলেছে তা আমাদের আনন্দ দিয়েছে ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সত্য আপন তেজে নিজেকে প্রকাশ করুক।

-- ইতি প্রকাশক

ধর্ম ও অনুভূতির পাণ্ডুলিপি

মার্চ - ১৮৮২।
শ্রীমন্দির - দক্ষিণেশ্বর।

~~উপক্রমণিকা~~।

~~প্রথম খণ্ড - শ্রীগুরু-পরিচ্ছেদ~~।

"বিশ্বাস হ'লে সবেতেই হয়।"

বিশ্বাস - ভগবানের কৃপা - দেহ থেকে আত্মার মুক্তি ও দর্শন।

দর্শন - দুই রকম আংশিক ও পূর্ণ।

আংশিক - ইষ্টমূর্তি অথবা জ্যোতি দর্শন, কিন্তু ইষ্ট ও জ্যোতি দুই দর্শন।

পূর্ণ দর্শন - সচ্চিদানন্দসত্তা যখন আত্মাকে দেখিয়ে দেন। এই হ'ল পূর্ণ দর্শন।

ঠাকুর স্বামী সারদানন্দকে (অভেদানন্দ স্বামী) বলেছেন 'না দেখলে ভালবাসা হবে কি?',

দর্শন না হ'লে বিশ্বাস হয় না।

"বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁকে লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার সেতুর দরকার নাই।"

পরাবিদ্যা পরিচয়

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য -
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।

- কঠ - ১/২/২৩

****

"ঐ একটা আলো আসছে, কিন্তু কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারছি না।"

— শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত)

****

"এই মানুষের প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী রাজযোগের মাধ্যমে সহস্রারে ব্রহ্মত্ব লাভ করে (অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তো'সি)। আর হাজার হাজার নরনারী – শিশুবৃদ্ধ তাঁকে তাদের অন্তরে দেখে সেই কথার প্রমাণ জগতে স্থাপন করে। ধর্ম-জগতের সর্বজনীন প্রমাণ এই। ব্যষ্টির প্রমাণ হলো - বিশ্বাস; আর এই সর্বজনীন প্রমাণ হলো — বাস্তব (Reality)।
– শ্রীমানিক

****

অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়
পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে
এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতম্ অভয়ম্
এতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।

– ছান্দোগ্য-৮/৩/৪

****

'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'– বৃহদারণ্যক, ১/৪/১০
'আনা-উল-হক্' (Ana-Ul-Huq – "I am The Truth") – মনসুর, বাগদাদ।

****

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' – চণ্ডীদাস।

****

"Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION, which is Oneness."

– Swami Vivekananda.

(Letter No. CXLII written to Mohammed Sarfaraz Hussain of Nainital).

..... “Therefore Vedanta formulates not universal brotherhood but Universal Oneness.”

“The hour comes when great men shall arise and cast off these kindergartens of religions and shall make vivid and powerful the true religion, the worship of the Spirit by the Spirit.”

– Swami Vivekananda.

(Complete Works of Swami Vivekananda, Mayavati Memorial Edition, Vol VII- ‘Is Vedanta the Future Religion?’-Delivered in San Francisco in April, 1900)

“So far it is all right theoretically, but is there any way of practically working out this harmony in religions? We find that this recognition that all the various views of religion are true has been very old. Hundreds of attempts have been made in India, in Alexandria, in Europe, in China, in Japan, in Tibet and lastly in America, to formulate a harmonious religious creed, to make all religions come together in love. They have all failed, because they did not adopt any practical plan. Many have admitted that all the religions of the world are right, but they show no practical way of bringing them together, so as to enable each of them to maintain its own individuality in the conflux. That plan alone is practical, which does not destroy the individuality of any man in religion and at the same time shows him a point of union with all others.”

– Swami Vivekananda

“The Ideal of a Universal Religion’’
(Complete works, Mayavati Memorial Edition. Volume II. Page No. 384)

****

‘‘সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ – যেহেতু ভগবান্ সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেই জন্যই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্য বন্ধনে। ..... স্বলক্ষণন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি, সেই শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।’’

– রবীন্দ্রনাথ

(মানুষের ধর্ম)

নিবেদন

বার বছর চার মাস বয়সের এক বালক। ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা তখন ছিল না। একদিন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উদয় হলেন তাঁর দেহে। রাত্রে শুয়ে ছিলেন তিনি। ঘুম থেকে জেগে উঠলে যেমন হয় – ঠাকুর ঠিক তেমনি ভাবে উঠে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে। এক দিন নয়, – পর পর দু'দিন রাত্রে ঠাকুর দেখা দিলেন তাঁকে। অথচ যাঁকে দেখলেন তিনি যে কে – তাই তাঁর জানা ছিল না। তের বছর আট মাস বয়সে তিনি দেখলেন স্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে), অবশ্য তাঁকেও তিনি তখন জানতেন না। সারারাত শিয়রে বসে শিক্ষা দিলেন স্বামীজী। ভোর হলে সে মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল; মাথার মধ্যে একটা ধ্বনি ফুটে উঠল – "রাজযোগ!" 'রাজযোগ' কথাটির সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম পরিচয়। পনের বছর বয়সে তিনি প্রথম দেখলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি; বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন ছবির দিকে আর ভাবলেন — ইনিই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি মাঝে মাঝে আমায় দর্শন দেন!

তারপর শুরু হলো দর্শন আর অনুভূতির বৈচিত্র্যময় অধ্যায়। বার বছর চার মাস বয়স থেকে শুরু আর এখন চুয়াত্তর বছর বয়স; এখনও চলেছে এই অধ্যায়ের নিত্য নূতন সংযোজন। কতই মৌলিক অনুভূতি হয়েছে তাঁর! সে সব অনুভূতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না কোন ধর্মগ্রন্থে। অথচ কিছুই করতে হয়নি তাঁকে; স্বয়ম্ভু আত্মার স্বয়ং প্রকাশ হয়েছে তাঁর মধ্যে। সাধন ভজনের কোন কথা কখনও তাঁর মনে উদয় হয়নি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীতে আমরা পাই ঠাকুর মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছেন, কাঁদছেন আর বলছেন – "রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি, মা, আমায় দেখা দিবি নে?" কিন্তু শ্রীভগবানকে যে দেখা যায়, শ্রীভগবানকে দেখার জন্য যে কাঁদতে হয় তাই তাঁর জানা ছিল না। জীবনে পূজা করেন নি কখনও, – একটা মন্ত্রও জানা নেই তাঁর। যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া জীবনে আর কিছু তিনি জানতেন না সেই ঠাকুরের চরণে কখনও একটা ফুল অর্পণ করেন নি, – ভোগরাগ, জপতপ তো দূরের কথা। সাধারণ মানুষের মতই দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন আর দেখতেন আপনা হ'তে অনুভূতি হয়ে চলেছে।

চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন – কী গভীর উপলব্ধি হয়েছে তাঁর, সাধন জগতের কত অজ্ঞাত রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর জীবনে। তাঁরই উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছে – এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা। কিন্তু তবুও ব্যষ্টির সাধনকে তিনি গ্রহণ করেন নি। ব্যষ্টির সাধনকেই মনুষ্যজাতির পক্ষে চরম সত্য বলে মেনে সেখানেই থেমে যান নি।

তিনি ত' জানতেন না যে শ্রীভগবানকে দেখা যায়, – তবে দেখলেন কেমন ক'রে? তিনি বলেন যে মানুষ জন্মায় অসংখ্য সংস্কার নিয়ে। তার পরিবারের সংস্কার – গোষ্ঠির সংস্কার – দেশের সংস্কার – সব সংস্কার থাকে তার মধ্যে। শুধু তাই নয়; পৃথিবীতে আবহমানকাল ধরে যা কিছু হয়েছে সব কিছুর সংস্কার থাকে তার মধ্যে। জন্মগতভাবে সেই সংস্কার প্রকাশ পায় ব্যষ্টির সাধনে। তাই যিনি ভগবান দর্শন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তিনিও দেখেন শ্রীভগবানকে। অতীতের ভগবান-দর্শনের সংস্কার অজ্ঞাতভাবেই ফুটে ওঠে তাঁর মধ্যে। তাই

দ্রষ্টার পক্ষে, সাধকের পক্ষে সত্য হলেও, যা সর্বজনীন নয়, যার কোন প্রমাণ দেখানো যাবে না মানুষকে, তাকে তিনি গ্রহণ করতে রাজী নন।

এইভাবে 'নেতি' 'নেতি' করেই চলে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু যেখানে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে সেটি হলো – তাঁকে কেন্দ্র করে সমষ্টিগত সাধনের এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। তাঁর রূপ ফুটে ওঠে হাজার হাজার মানুষের অন্তরে। তাঁকে স্বপ্নে, ধ্যানে, জাগ্রত অবস্থায়, Trance – এ দেখে, আবালবৃদ্ধবনিতা। তাঁকে দেখে হিন্দু, দেখে মুসলমান, দেখে খ্রীষ্টান, দেখে পারসী, দেখে ইহুদী, দেখে ভারতবাসী, আবার বিদেশী। এঁদের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ শিক্ষিত, কেউ বা নিরক্ষর। তাঁর কাছে আসার পর যেমন লোকে তাঁকে দেখতে শুরু করে তেমনি আবার তাঁকে না দেখে, তাঁকে না জেনে, তাঁর কথা না শুনেও বহুলোক তাঁকে দেখছে; আর তাদের সংখ্যাই হলো বেশি। পরে ঘটনাচক্রে তারা এসেছে তাঁর কাছে – কথা প্রসঙ্গে নিবেদন করেছে তাদের পূর্ব দর্শনের কথা। তাঁর কাছে মেয়েদের আসতে দেওয়া হয় না। তবুও তারা ঘরে থেকেই তাঁকে দেখে। বাড়ির কোন একজন লোক তাঁর কাছে এল; সে লোকটি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তাঁকে দেখা শুরু হয়ে গেল সে বাড়িতে। আবার কখনও কখনও বাড়ির কর্তা যিনি তাঁর কাছে এসেছেন তিনি দেখেন পরে, বাড়ির মায়েরা ঘরে বসেই তাঁকে দেখেন আগে। বাপ, মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে – সকলেই তাঁকে দেখতে থাকে – দাস দাসীরাও বাদ পড়ে না। পিতামহ দেখেন, পিতা দেখেন, পৌত্রও দেখে তাঁকে। কোন বিচার নেই, কোন ভেদাভেদ নেই, কোন গণ্ডিও নেই। তাঁকে দেখার জন্য শুধু প্রয়োজন হলো – মনুষ্যদেহ, আর কিছুই না।

যারা দেখছে তাঁকে তাদের মধ্যে কতই না পার্থক্য ! বয়সে, বিদ্যায়, বিভবে – এদের মধ্যে কতই প্রভেদ। একজনের ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে আর একজনের অনুভূতির কোন মিল নেই। তবু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে ঐক্য,– বহুত্বের মধ্যে ফুটে উঠেছে একত্ব; আর সে একত্বের যোগমূর্তি হলো – তাঁর রূপ ! সসীম ব্যক্তিসত্ত্বা ব্যাপ্ত হয়েছে অসীম আত্মিক চৈতন্যে। ব্যষ্টির গণ্ডি ছেড়ে তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন সমষ্টিতে – জগতের মনুষ্যজাতির মধ্যে। অনুকূল ক্ষেত্র পেলে তাঁর রূপ ফুটে উঠছে। "একো'হম্ বহুস্যাম্"– একথা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তিনি এক, আবার তিনি বহু। ব্যবহারিক জগতে তিনি বহু, আবার আত্মিক জগতে তিনি এক। 'স একঃ'। মানুষের অন্তরে উদয় হয়ে মানুষকে এ কথা বলার অধিকার তিনি দিয়েছেন যে – 'আমিও সেই ব্রহ্ম'। "অহম্ ব্রহ্মাস্মি !"

'শিব ঐক্য বন্ধনে'। এই ঐক্য বন্ধন কি তা আজ আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি। ঈশোপনিষদ বলেছেন – "সূর্যমন্ডলস্থ পুরুষ" আর "হিরণ্ময়কোষস্থ ব্রহ্ম।" সক্রেটিস বলেছেন "Absolute Equality" and "Abstract Equality"। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন – "One" and "Oneness"। মনুষ্যজাতির মধ্যে একত্বের যে বহু আকাঙ্খিত চিত্র মহাপুরুষেরা মানসনয়নে এঁকে গেছেন আমরা দেখছি সেই একত্বের বাস্তব সূচনা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে –

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।"

বহু শতাব্দী পূর্বে রচিত উপনিষদের ঋষির বন্দনা গান আজ ধ্বনিত হচ্ছে হাজার হাজার নরনারীর কণ্ঠে যারা তাঁকে দেখছে। আমরা নিঃসন্দেহে অতি ভাগ্যবান। যে ভারতবর্ষে সাংখ্যদর্শনে একদিন লেখা হয়েছিল – "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" সেই ভারতবর্ষে তার বিপরীত ধ্বনি করে আজ বলবার সময় এসেছে – ঈশ্বরঃ সিদ্ধঃ সপ্রমাণম্। আর সে ঈশ্বর হচ্ছেন জীবিত মানুষ। মানুষই ঈশ্বরে পরিবর্তিত হন, আর তার প্রমাণও দেয় মানুষ, তথা জগৎ।

মানুষ কিভাবে ঈশ্বরে পরিবর্তিত হন তার প্রাঞ্জল ধারাবাহিক বিবরণ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিবৃত্ত ছিল অস্পষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এ সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁর এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থের রচনা কাল এপ্রিল ও মে, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। কোন অবসর গ্রহণ না করে, দৈনন্দিন জীবন যথারীতি যাপন করেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; সময় লেগেছিল সাত সপ্তাহ। এই গ্রন্থটি তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ। প্রথম ভাগে ব্যষ্টির সাধনের কথা, মহামানবের দেহে আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যুদয়, বিকাশ ও তার পরিণতির বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগে ব্যষ্টির ও সমষ্টিগত সাধনের সমন্বয়। তৃতীয় ভাগে ধর্মজগতে সম্পূর্ণ নূতন কথা – ধর্ম অনুমান, কল্পনা বা বিশ্বাস নয়, ধর্ম অনুভূতিমূলক ও প্রমাণ সাপেক্ষ। মানুষের ব্রহ্মত্বলাভ বাস্তব সত্য – বিশ্বব্যাপিত্বে তার প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা। এই গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ 'Religion & Realisation' by 'Diamond Picked up in the street' ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। 'ধর্ম ও অনুভূতি' প্রকাশের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পাঠচক্রে এই গ্রন্থগুলি পাঠ ও আলোচনা করা হয়ে থাকে। যাঁরা পাঠ শ্রবণ করেন বা নিজেরা ঘরে গ্রন্থগুলি পাঠ করেন তাঁরা অনেকেই এই মহা-বেদ রচয়িতাকে স্বপ্নে দেখেন এবং পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মত্বের বিকাশে তাঁদের জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। ধর্মগ্রন্থের ইতিহাসে এও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। নূতন যুগের পুণ্য অরুণোদয়ে ধর্মজগতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূরীভূত হোক, সত্যের ঝর্ণাধারায় পৃথিবী মুক্তিস্নান করুক, মনুষ্যজাতির আত্মিক উদ্বোধনে 'ধর্ম ও অনুভূতি'র অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হোক।

১৫ই জুলাই, ১৯৬৬ — বিনীত
১৯, ভি. রোড — জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
পোঃ দাসনগর, হাওড়া। — এম.এ.

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতবাণীর যৌগিক রূপ

(দেহতত্ত্বে ব্রহ্মবিদ্যায় অবতারলীলায়
সচ্চিদানন্দ-চিৎ-ঘন-কায়-বিগ্রহ ঠাকুরের কৃপার কাহিনী)

"কুড়িয়ে পাওয়া মানিক – "
মানিক কুড়িয়ে পাওয়া যায়, কিনতে মেলে না।
রত্ন অমূল্য।
বিদ্বতে বস্তু – বিবিদিষায় নয়।
সচ্চিদানন্দের কৃপায় সচ্চিদানন্দ লাভ।
সাধন করে সচ্চিদানন্দ লাভ করা যায় না।
"আত্মা যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।"

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণঃ জয়তি

গোড়ার কথা

"আমার এসব কথা বলায় কিছু অপরাধ হচ্ছে কি, মা ? না, অপরাধ কেন হবে ! আমি ওদের ভক্তি বিশ্বাস বাড়বে বলে বলছি –"

ধারণা অনেকের, অনুভূতির কথা বললে অপরাধ হয়।

ঠাকুরের পাঁচখানি কথামৃত ঠাকুরের দেহে মায়ের লীলার কাহিনী

এর অপর নাম – শরীরে ভগবানের প্রকাশ।

দেহেতে ভগবান।

তিনি কৃপা করে প্রকাশ হন। এই প্রকাশ হওয়াকে 'লীলা' বলে। এর অপর নাম সত্যের প্রতিষ্ঠা বা স্বয়ম্ভু আত্মার (পাতাল ফোঁড়া শিবের) স্বতঃস্ফুরণ। সত্য স্ফুরিত হয় প্রচারের জন্য। চাপরাস বা আদেশ প্রাপ্তির পর এই প্রচার। চাপরাস লিখিত দলিল। শ্রীভগবান (ঠাকুর) দেখান। আদেশ দু প্রকার। ১ম – মূর্তি ধারণ করে সচ্চিদানন্দ বলেন। ২য়- মাথার মধ্যে দৈব বা আকাশবাণী। আরও দু'রকম দৈববাণীর কথা ঠাকুর বলেছেন – শিশুর মুখ দিয়ে কিম্বা পাগলের মুখ দিয়েও দৈববাণী হয়।

ঠাকুরের দেহে আত্মার প্রকাশ। সেই প্রকাশের কাহিনীর নাম ভাগবত। সেই ভাগবত তিনি বলেছিলেন। এই ভাগবত প্রচারে কোন অপরাধ হয় না। তিনি নিজেই এ কথা বলেছেন। এতে অপরের ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে।

'গোপন'– অষ্টপাশের একটি পাশ। গোপনে থাকার জন্য সত্যের প্রতিষ্ঠা বা আত্মিক স্ফুরণ হয় না। তাঁর (ভগবানের) দরকার হলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেন। তাঁর দরকার, দেহেতে তাই সচ্চিদানন্দগুরু লাভ, আত্মার প্রতিষ্ঠা, ভগবানের লীলা, চাপরাস লাভ, ভাগবত প্রচার।

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী, তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি ও ভক্ত নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হলো, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি করছে।"

এরা যে সব সাধন করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে – তাদের হিতের জন্য।

ঠাকুরের বাণী – এতে অপরাধ হয় না।

(২)

"কারু কারু সাধন না ক'রে ঈশ্বর লাভ হয়, তাদের নিত্যসিদ্ধ বলে। যারা জপতপাদি সাধন ক'রে ঈশ্বর লাভ করেছে, তাদের বলে সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ

কৃপাসিদ্ধ – যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে এককক্ষণে আলো হয়ে যায়।”

“আবার আছে হঠাৎসিদ্ধ – যেমন গরিবের ছেলে বড়মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে – সেই সঙ্গে বাড়ি – ঘর – গাড়ি - দাস – দাসী সব হয়ে গেল।”

“আর আছে স্বপ্নসিদ্ধ – স্বপ্নে দর্শন হল।”

নিত্যসিদ্ধ

নিত্যসিদ্ধ দু'প্রকার - ১ম – নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারাদি।
- ২য় – ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ।

(১) নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারাদি

সব মতের সাধনই এই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারের হয়। এঁদের একাধারে পূর্ণভাবে পঞ্চসিদ্ধি স্ফূর্ত হয় – অর্থাৎ এঁরা পঞ্চসিদ্ধ।

বেদমতের সাধনই শ্রেষ্ঠ। বেদমতের সাধন – পঞ্চকোষের সাধন।

পঞ্চকোষ – অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ আর আনন্দময় কোষ।

অন্নময় কোষ – স্থূল দেহ।

প্রাণময় কোষ – তিনভূমি – লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি।

অনুভূতি – “আলেখ্ লতার জল পেটে পড়লে গাছ হয়।” – ঠাকুর। ‘আলেখ্ লতা’ – অলক্ষ্যে দেহকে যে আত্মা ওতপ্রোতভাবে লতার মতন জড়িয়ে আছেন। তিনি দেহ থেকে কৃপা করে মুক্ত হয়ে, পেটের দক্ষিণ দিকে স্বচ্ছ নীলাভ জলে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকিরণে জড়িত হয়ে দেখা দেন।

মনোময় কোষ – চতুর্থভূমি – হৃদয়।

অনুভূতি – জ্যোতিদর্শন। যে দিকে চাওয়া যাবে সেই দিকেই জ্যোতিদর্শন। একটা গাছের ডালের দিকে নজর পড়ল, ডালের ভিতর পারা কিম্বা রূপা গলার মতন দেখা গেল। ঠাকুর মায়ের ঘরে পূজা করছেন – মা দেখিয়ে দিলেন – সমস্ত চিন্ময়, জ্যোতির্ময়।

বিজ্ঞানময় কোষ – পঞ্চমভূমি, ষষ্ঠভূমি এবং সপ্তমভূমির কিয়দংশ।

বিজ্ঞানময় কোষ – বিশেষ রূপে জ্ঞান হচ্ছে – ‘আমি কে?’

পঞ্চমভূমির অনুভূতি – অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। দ্রষ্টা নিজে নিজেকে আধখানা মেয়েছেলে আর আধখানা বেটাছেলে দেখতে পান – চোখ বুজে নয় – চোখ খুলে, অবাক হয়ে। দিন দুপুরে কট্‌কট্‌ করছে সূর্যের আলো।

"তাই সচ্চিদানন্দ প্রথমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করলেন।"

সচ্চিদানন্দ – আত্মা – ভগবান – ব্রহ্ম।

সচ্চিদানন্দ দেহেতে। তিনি দেহ থেকে মুক্ত হয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করেন। ভক্ত দেখেন। অর্ধনারীশ্বর মূর্তির দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হলো সচ্চিদানন্দগুরুর মূর্তি অর্ধনারীশ্বর রূপে দেখা যায়। প্রথম স্তরের অনুভূতি দ্রষ্টার স্থূল শরীরে বর্তায়। দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি দ্রষ্টার কারণশরীরে।

ষষ্ঠভূমি – ভ্রূ-মধ্যে।

প্রথম দ্বিদল পদ্ম – দুটি চক্ষু হতে দুটি চক্র বেরিয়ে ভ্রূর ওপর এসে এক হয়ে যায়। একে বলে – তৃতীয়নেত্র বা জ্ঞানচক্ষু। এই জ্ঞানচক্ষুর মধ্যে জ্ঞানের মূর্তি দেখা যায় – যথা বুদ্ধমূর্তি। এ অবস্থায়ও দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি আছে। সচ্চিদানন্দগুরুর শরীরে জ্ঞানচক্ষু বা ত্রিনেত্র পরিস্ফুট হয়, আর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও কল্পতরু দেখতে পাওয়া যায়।

তারপর, দিনদুপুরে খোলা চোখে নৃত্যপরা রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন। অপূর্ব নারীমূর্তি – অপূর্ব দর্শন! এই নারীমূর্তি – দূরে নয়, অতি নিকটে দর্শন হয়। ইনি কৃপা ক'রে দ্বার খুলে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান বা সপ্তমভূমিতে প্রবেশ হয়।

এই নারীমূর্তির গায়ের রং – স্নিগ্ধ ঘাসফুলের রং। বসন – ফিকে নীলাম্বরী। নাসায় নীল পাথরের বেশর। দৃষ্টি ভূমিতে আনত এবং আবদ্ধ। ভ্রূ-মধ্যে হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে নৃত্যপরা। নৃত্য ধীর। মূর্তিতে আনন্দ যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ইনি রহস্যময়ী মায়ামূর্তি। আনত ও আবদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন – মায়া রহস্যময়ী। অনুভূতির দ্বারা মায়ার রহস্য ভেদ হয়। জীবন-মৃত্যু রহস্যভেদ হ'লে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

সপ্তমভূমি – শিরোমধ্যে।

এই সপ্তমভূমিতে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

"কেউ এসে বলবে, 'এই–, এই' – !"

এ 'কেউ' হলেন সচ্চিদানন্দগুরু। তিনি কথা কন এবং আত্মাকে দেখিয়ে দেন। তারপর অদৃশ্য হয়ে যান। এ সমস্ত দর্শন মাথার ভিতরেই হয়।

এই আত্মার সাক্ষাৎকারের পর ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ। শেষে 'আমি দেহ নই,

আমি আত্মা’– এই বোধ হয়। এই হলো বিজ্ঞানময় কোষ – অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞান হলো নিজের স্বরূপের। সমাধির আরম্ভ এবং এক প্রকার সমাধি।

আনন্দময় কোষ – অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে অবস্থান। সচ্চিদানন্দ লাভ।

“বাবা, সচ্চিদানন্দ লাভ না হ’লে কিছুই হ’ল না।”

গাঢ় সমাধি অবস্থায় অনুভূতি হয়। ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

“ঘি কেমন? না, ঘি যেমন।”

“পাঁচ বছরের শিশুকে রমণ - সুখ বোঝানো যায় না।”

(২) ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ

এঁরাও দৈবী মানুষ, তবে অবতার নন। এঁদের বেদমতে পঞ্চকোষের সাধন হয় না। এঁদের কেউ অখন্ডের ঘর, কারও বা উঁচু সাকারের ঘর।

“নরেন্দ্রের অখন্ডের ঘর।”

“রাখালের উঁচু সাকারের ঘর।”

কৃপাসিদ্ধ

কৃপাসিদ্ধের দুই অবস্থা।

“হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে প্রদীপ নিয়ে গেলে, একক্ষণে আলো হয়ে যায়।” আত্মা কৃপা ক’রে দেহ থেকে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে দর্শন ও শিক্ষা দেন। এই হলো প্রথম অবস্থা।

দ্বিতীয় অবস্থা – “তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বলবেন – তবে জানবি ঠিক হয়েছে।”

স্বস্বরূপ দেহ থেকে বেরিয়ে বলেন, “তোর ওপর ভগবানের কৃপা আছে।” তবে পূর্ণ কৃপাসিদ্ধ হয়। মনে চিন্তার বিষয় নয়। সাক্ষাৎকার, অনুভূতি ও শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী-সাপেক্ষ।

হঠাৎসিদ্ধ

এগার বছর বয়সে আনুড় গ্রামে বিশালাক্ষী দেবী দর্শনে যাবার সময় মাঠের মাঝে ঠাকুরের জ্যোতি দর্শন ক’রে সমাধি। এগার বছরের পাড়াগাঁয়ের ছেলের মনে কল্পনায় এ অনুভূতির কথা কখনও উদয় হয় নি, কিংবা, অপরের কাছেও কখন শোনেনি। কৃপাসিদ্ধও হঠাৎসিদ্ধ। হঠাৎ একদিন সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করেন।

পথ দিয়ে একজন লোক চলে যাচ্ছেন। তিনি একটি মানিক কুড়িয়ে পেলেন।

এই হঠাৎসিদ্ধের অবস্থা।

যিনি মানিক কুড়িয়ে পেয়েছেন, তিনি ত জানেনই। এইখানেই এর শেষ নয়। মানিক নিজেই প্রচার করে মানিক কুড়িয়ে পাওয়ার কথা। অন্তরঙ্গ কেউ দেখে বলবে, "আমি দেখেছি আপনি মানিক কুড়িয়ে পেয়েছেন!" আবার দর্শনের প্রমাণস্বরূপ দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ দেখে বলবে, "আপনি অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন।" তবে যোল আনা হবে।

ঠাকুরের হঠাৎ সিদ্ধের উপমা – "গরিবের ছেলে বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে – সেই সঙ্গে বাড়ি – ঘর – গাড়ি – দাস – দাসী সব হয়ে গেল।"

'বাবু' – শ্রীভগবান।

'মেয়ে বিয়ে দেওয়া' – দেহের মধ্যে ভাগবতীতনু।

'বাড়ি' – ভূমি বা চক্র। 'সাততলা'।

'ঘর' – প্রতি স্তরের অনুভূতি।

'গাড়ি' – কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি।

'দাস' – ইন্দ্রিয়গণ দাস।

'দাসী' – মায়া দাসী।

স্বপ্নসিদ্ধ

"স্বপ্নসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তাঁর ঠাঁই।"

শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রথম স্বপ্ন দেখেন 'কাপ্তেন' – চিরপ্রণম্য শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের মহারাজার কন্সল (Consul)।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ি। বেলতলার দিকে দরজা। দরজার বাইরে গোবরের স্তূপ। স্তূপের উপর বিরাট পদ্ম। ঠাকুর পাশে দাঁড়িয়ে পদ্মফুলটি দেখাচ্ছেন 'কাপ্তেন'– কে।

শ্রীভগবান দেখিয়ে দিলেন তাঁর লীলার কাহিনী এ যুগে।

'পদ্মফুল' – সহস্রার।

'গোবরের স্তূপ' – দেহ – সংসার।

চারিদিকে কামিনীকাঞ্চন, ভোগের বিপুল আয়োজন, বিকট আস্ফালন। তারই মাঝে তবুও ফুটবে সহস্রার – পদ্মফুল। তাঁর ইচ্ছা!

রামবাবু স্বপ্নে ঠাকুরের নিকট মন্ত্র পেয়েছিলেন। তার পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে বললেন, "স্বপ্নে মন্ত্র দিয়েছেন।" ঠাকুর বসেছিলেন; উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলেন আর বললেন, "স্বপ্নসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি

তার ঠাঁই।”

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে স্বপ্নতত্ত্বের কথা আছে। জাগ্রত অবস্থার অনুভূতির চেয়ে স্বপ্নের অনুভূতি শুদ্ধতর।

জোসেফ (Joseph) মিশরে ফ্যারাওয়ের (Pharaoh) স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতেন। মসেস্‌কে (Moses) শ্রীভগবান বলেছিলেন, “আমি এর পর সাক্ষাৎকার হয়ে কথা বলবো না, স্বপ্নে আদেশ দেবো।” ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament) স্বপ্ন ত্বত্ত্বে পূর্ণ।*

মহম্মদ স্বপ্নে সাত ঘোড়ার গাড়ি ক'রে খোদাতাল্লার কাছে যেতেন আর তার আদেশ এবং উপদেশ গ্রহণ করতেন।

শ্রীরামানুজ স্বপ্নে আদেশ পেয়ে দিল্লীর সম্রাটের প্রাসাদ থেকে বিগ্রহ মূর্তি এনেছিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছিলেন। “স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া বহু ভাগ্যে হয়”—ঠাকুর।

মহাপ্রভু সেই মন্ত্র কেশবভারতীর কানে প্রদান ক'রে আবার সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন। স্বপ্নে মন্ত্র পেলে আর মন্ত্র নিতে নেই। মানুষের দেহে, অন্তরে, শ্রীভগবান আছেন। তিনি কৃপা ক'রে অন্তরে ফুটে উঠলেন – স্বপ্নে বাণীরূপে অর্থাৎ তাঁকে তিনি ধারণ করলেন ঐ শব্দের দ্বারা (নাদ)। শূন্যতত্ত্ব থেকে শব্দতত্ত্ব – নাদ। মন্ত্র – শব্দ – নাদ। নাদের ‘খেই’ পাওয়া – এ মন্ত্র ধরে গেলে নাদ ভেদ হবে। “শেকলের পাব্‌ ধরে ধরে গিয়ে জলের ভিতর নোঙর পাওয়া যায়”—ঠাকুর।

মহাপ্রভু গম্ভীরায় শেষাশেষি স্বপ্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, নৌকাবিহার, বনবিহার ইত্যাদি অনুভূতি করেছিলেন। স্বপ্নে আত্মা শ্রীকৃষ্ণরূপে মহাপ্রভুর দেহ মধ্যে প্রকট হয়ে এই রকম লীলা করেছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত সমাপ্ত করেছিলেন শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্ব প্নের অনুভূতিতে। স্বপ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীবলরাম উভয়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের গালে আচ্ছা ক'রে থাবড়া মেরেছিলেন। গাল ফুলে উঠেছিল। আংটিসমেত আঙুলের দাগ গালে ছিল। প্রভাতে শ্রীস্বরূপদামোদর এসে দেখেন বিদ্যানিধি মশায়ের গাল ফোলা আর গালে আংটিসমেত আঙুলের দাগ। ধন্য পুণ্ডরীক!

---

* বৌদ্ধযুগে (ত্রিপিটক) পালিগ্রন্থে শ্রীশ্রীভগবান বুদ্ধের প্রথম জীবনে স্বপ্নের বহু কাহিনী আছে। নিউ টেস্টামেন্টেও (New Testament) বহু স্বপ্ন কাহিনীর কথা পাওয়া যায়।

শত শত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আমার এবং সারা জগতের। ‘ভাগবত – ভক্ত – ভগবান’– তিনই এক। তোমার জীবনই তার প্রমাণ।

শ্রীতুকারামের জীবনী বিঠোবার (তুকারামের গৃহদেবতা) স্বপ্ন লীলার কাহিনীতে পূর্ণ। স্বপ্নে বিঠোবা তুকারামকে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে বরণ করেছিলেন, সাধন শিক্ষা দিয়েছিলেন, দোঁহা লিখতে শিখিয়েছিলেন আর তুকারামের জীবনে প্রায় সব কাজে নির্দেশ দিতেন।

স্বপ্নসিদ্ধ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুর আবার প্রাণদান ক’রে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাস্টার মশাইকে ঠাকুর বলছেন, “যদি স্বপ্নে আমায় উপদেশ দিতে দেখ, জানবে সে সচ্চিদানন্দ।”

সচ্চিদানন্দ–আত্মা–ভগবান–ব্রহ্ম ‘চিৎ-ঘন-কায়’ মূর্তি ধারণ ক’রে, দেহ থেকে মুক্ত হয়ে দেহীর প্রতি কৃপা করেন।

“বাপে ধরেছে ছেলেকে।”

রামবাবু, মাস্টারমশাই, বাবুরাম মহারাজ (পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ) এবং আরও কয়েকজন ঠাকুরকে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে লাভ করেছিলেন। তাঁরা ভাগ্যবান। আমাদের চিরপ্রণম্য।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় – এই চার অবস্থাতেই ঈশ্বরের বহুবিধ রূপ ও ভাব অনুভূতি হয়। কোন ভাগ্যবান জাগ্রত অবস্থায়, ধ্যানে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে এবং তুরীয় অবস্থায়ও শ্রীভগবানের লীলা দেখেন। কেউ বা শুধু ধ্যানে, স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে দর্শন করেন। কারও বা ধ্যানে আর স্বপ্নে দর্শন হয়। কারও বা শুধু স্বপ্নে– দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, সচ্চিদানন্দগুরু লাভ থেকে আরম্ভ ক’রে জ্যোতিদর্শন ক’রে সমাধিলাভ, অবতারতত্ত্ব পর্যন্ত সমস্ত স্বপ্নে অনুভূতি হয়। অবশ্য সমস্তই ঠাকুরের কৃপায়।

স্বপ্নসিদ্ধ একাধারে পঞ্চসিদ্ধ। তাঁর স্বপ্নে সাক্ষাৎকার হচ্ছে, অতএব তিনি স্বপ্নসিদ্ধ। এই স্বপ্ন হঠাৎ হয়, অতএব তিনি হঠাৎসিদ্ধ। কৃপা ব্যতীত এই দেবস্বপ্ন কেউ দেখেন না, অতএব তিনি কৃপাসিদ্ধ। আবার স্বপ্নসিদ্ধ নিত্য সিদ্ধও বটে। কারণ শুদ্ধ সংস্কার ও প্রারব্ধ না থাকলে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয় না। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হ’লে সাধন হয় না। আবার স্বপ্নসিদ্ধ সাধন সিদ্ধ বা ধ্যানসিদ্ধও হন। সচ্চিদানন্দগুরু তাঁকে দিয়ে সাধন করান এবং সাক্ষাৎকার হয়ে বলেন, “তুমি ত ধ্যানসিদ্ধ”। সাধনসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন – অবশ্য যাঁরা বিবিদিষায় ভগবান লাভ করতে চান তাঁদের পক্ষে। সাধক এই সময়ে দেখতে পান ও বুঝতে পারেন বাঁকা নদী ঘুরে গন্তব্যস্থানে গিয়েছে।

এই সিদ্ধ হওয়ার পরিমাণ আছে। আত্মা দেহ থেকে যতটুকু পরিমাণ মুক্ত হন,

ততটুকু তাঁর অনুভূতি হয়। তাই ঠাকুরের – এক আনা, দু'আনা, চার আনা, আট আনা, বার আনা – এই আনার পরিমাণ। ঠাকুর মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আমার ক'আনা জ্ঞান হয়েছে?"

স্বপ্নে সর্বাঙ্গীণ সমস্ত সাধন হওয়া আর এই রকম অনুভূতি হওয়া – জগতে ঠাকুরের যুগে প্রথম।

সাধনসিদ্ধ বা ধ্যানসিদ্ধ

চণ্ডীদাস বলেছেন, "কোটিতে গুটিক হয়।"

রামপ্রসাদ বলেছেন, "ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, তুমি হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।"

ঠাকুর বলেছেন, "বহু কষ্টে কেউ বা সাধন ক'রে তাঁকে লাভ করেছে।" ঠাকুর 'অস্তি-জ্ঞানে' কথা বলতেন। তাই স্বামীজীকে বলছেন, "দুটো আছে অস্তি আর নাস্তি, তুমি অস্তিটাই নাও না।" ঠাকুর 'না' জানতেন না। যেখানে তিনি "তত সোজা নয়", "বহু কষ্টে", "কঠিন" ইত্যাদি কথা বলেছেন সেখানে সে বাক্যের অর্থ 'না' – অর্থাৎ হয় না।

শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবানের দর্শন – চেষ্টায় নয়।

বিদ্বতে বস্তুলাভ – বিবিদিষায় নয়।

সাধনসিদ্ধ হয় না।

তবে আপ্রাণ সাধন করতে করতে সাধক শ্রীভগবানের কৃপা পেয়ে যেতে পারেন। "অনেক ফুল চুষে একটু মধু"।*

ধ্যানসিদ্ধ হলে শ্রীভগবান সাক্ষাৎকার হয়ে বলেন, "তুমি ত ধ্যানসিদ্ধ।" নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারের হয়। নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটির ধ্যান করতে বসলেই মন অখণ্ডে লীন হয়ে যায়।

ঠাকুর বলেছেন, "নরেন ধ্যানসিদ্ধ।"

তিনি আরও বলতেন, "ধ্যানসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তার ঠাঁই।"

(৩)

সুন্দর বাগান। অপরূপ সৃষ্টি। বর্ণনা অসাধ্য।

চমৎকার বাড়ি। ছবি অত সুন্দর নয়। বাড়ির আকার গোলাকার। খুব উঁচু ভিতের উপর বাড়িটি। চারিদিকে বারান্দা। বারান্দা সুসজ্জিত – নিপুণতা ও রুচির আদর্শ।

বৃহৎ একখানি ঘর বারান্দার মধ্যভাগে। ঘরখানি কল্পনার ইন্দ্রসভা। ঘরের

---

* ষষ্ঠভূমি – উন্মনা সমাধি।

মাঝে অতি সুন্দর একখানি খাট – আর খাটে অতি সুন্দর একটি বিছানা।

বিছানায় শুয়ে আছেন বাবু। মাথায় তাকিয়া। দেখলেই বোধহয় তিনি ষোল আনা বাবু।

আকার – মাঝামাঝি স্থূল।

মুখটি ছাড়া সমস্তই সাদা চাদরে ঢাকা।

মেঝেতে বৃহৎ গড়গড়া ও নল। ভাষা নেই – গড়গড়া ও নলের অপরূপত্ব বর্ণনা করি।

নলটি বাবুর মুখে। শুধু লাগানো আছে।

মুখটি অতি নিঁখুতভাবে কামানো।

বাবুর মুখের রঙটি 'মাদাম টুসো'র মোমের পুতুলের রঙ।

বাবু বয়স্ক।

তিনি নীরব।

নয়ন মুদ্রিত।

স্বপ্নদ্রষ্টা করজোড়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে।

দৃষ্টি – বাবুর শ্রীমুখে গাঢ়ভাবে আবদ্ধ।

ঘর নীরব – স্তব্ধ।

অনেকক্ষণ কাটল।

স্বপ্নদ্রষ্টা* ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। বারান্দার কোলে অনেকগুলি সিঁড়ি। সিঁড়ির কোলে ছবির মত রাস্তা। স্বপ্নদ্রষ্টা সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন।

রাস্তা সোজা।

রাস্তা দিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা খানিকটা গিয়ে দেখলেন বাগানের ফটকের দ্বার। ফটকের দ্বারে লোহার দন্ড এবং দন্ডের মাথায় গোল চক্র সারি সারি পোঁতা আছে। পথ রুদ্ধ। সামনে জগতের রাস্তা – রুদ্ধ পথের সামনে।

স্বপ্নদ্রষ্টার শরীরে বিশেষ শক্তি। তিনি একটানে চক্রসমেত একটি দণ্ড তুলে ফেললেন। জগতের রাস্তার সঙ্গে বাগানের রাস্তা এক হয়ে গেল। চক্র সমেত দণ্ডটি স্বপ্নদ্রষ্টার হাতে রয়ে গেল, আর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল....।

২৬ বা ২৭ বছর আগে এই স্বপ্ন দেখে স্বপ্নদ্রষ্টা শ্রীশ্রী ঠাকুরের উপমাগুলির দেহতত্ত্বে ব্রহ্মবিদ্যায় অবতারলীলার যৌগিক রূপের অনুভূতি করতে আরম্ভ করেন।

---

*লেখক

(৪)

ঠাকুরের বায়বীয় শরীর। বাতাসের ওপর রেখাপাত মাত্র। তিনি বলছেন, “আমায় শুনিয়ে খাইয়েছিস!” এই বাণী শোনামাত্র দ্রষ্টার মনে হলো লিখে খাওয়াতে বলছেন। মন ভারী হয়ে উঠল। দ্রষ্টা বেজার হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, “দলিল কোথায়?” তিনি দ্রষ্টার চেয়ে চারগুণ চেঁচিয়ে বললেন, “ঐ মহিন্দর মাস্টারের কাছে”– আর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন দূরে মাস্টার মশাইকে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।....

দ্রষ্টা বুঝলেন তাঁকে ঠাকুরের অমৃতবাণীর যৌগিকরূপ বর্ণনা করতে আদেশ করছেন।

--- --- ---

ঘরটি ছোট। থাকা সেখানে। বার তেরটি বন্ধুর সঙ্গে সেখানে নিত্য কথামৃত পড়া–প্রায় সর্বক্ষণ–সকাল, দুপুর, বিকাল, রাত্রি–পাঁচ বছর যাবৎ–১৯৪৩ জুলাই থেকে ১৯৪৮ জুলাই মাস পর্যন্ত।

বন্ধুগুলি বহুকালের পরিচিত – ২৫ বছর আগে থেকে, এমন কি কেউ কেউ তার চেয়েও বেশি – মাত্র দুটি ছাড়া। তাঁদের একটি স্বপ্নে আদেশ পেয়ে এসেছেন এবং আর একটি তাঁর সাথী।

এঁদের সকলকার স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়েছে।

স্বপ্নে, ধ্যানে, সুষুপ্তিতে* নানারকম অনুভূতি হয়েছে।

ঠাকুর কৃপা করেছেন এই বন্ধুগুলিকে।

দেখিয়েছেন – তাঁর কৃপায় গোবরে পদ্মফুল ফোটে।

এঁরা সিদ্ধ পুরুষ।

ভারী মজা করে ঠাকুর এঁদের অবস্থা জানিয়েছেন।

একজনের অবস্থা আর একজনকে জানিয়েছেন, আবার দ্বিতীয়ের অবস্থা জানিয়েছেন তৃতীয়কে – স্বপ্নে।

আবার কেউ নিজের অবস্থা নিজে দেখেছেন, – স্বয়ংবেদ্য।

একজন স্বপ্নে দেখেছেন – আর একজন সাততলা বাড়ির সাততলার ঘরের মধ্যে বসে সমাধিস্থ।

আবার কেউ স্বপ্নে সহস্রারে জ্যোতি দর্শন ক'রে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন – নিজেই দেখছেন।

---

* এবং Trance – এ (‘নিদ্রার আবেশে’– চণ্ডীদাস)

কথামৃত পড়ার সময় খুব ঠাকুরের বাণীর যৌগিক রূপের কাহিনী বলা হ'ত। এই রূপগুলির অর্থবোধ হয়েছিল ঠাকুরের কৃপায় স্বপ্নে আর অনুভূতিতে। একটি উদাহরণ –

"সূর্যের কিরণ মাটিতে পড়লে এক রকম, জলে পড়লে আর এক রকম, আবার আয়নায় পড়লে অন্য এক রকম।"

এই ছোট ঘরে ঠাকুর এর রূপ দেওয়ালেন – দেহে সর্বত্র ব্যেপে শ্রীভগবান আছেন। এই হলো – 'মাটিতে পড়লে এক রকম।' শ্রীনারায়ণ ক্ষিরোদসাগরে নিদ্রিত।

কারণশরীরে ভাগবতীতনু ইষ্টমূর্তি ধারণ করেন কিংবা নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তিতে দেখা দেন। এই হলো– 'জলে পড়লে আর এক রকম।'

সহস্রারে সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা ক'রে আত্মা সাক্ষাৎকার করান, তখন আবার অন্য রকম, – 'আয়নায় পড়লে অন্য এক রকম।'

– – –

কথামৃত পড়া এখন ঢিলে হয়ে গেছে। সেও স্বপ্নে জানতে পারা গিয়েছিল।

একটি বন্ধু স্বপ্ন দেখছেন একটি পরিচিত বন্ধুর মূর্তিকে। সেই মূর্তি তাঁকে বলছেন, "আর কথামৃত পড়তে পারি না।"

ঠাকুর কৃপা করে এই লিখে খাওয়াতে আদেশ করেছেন।

এই 'লিখে খাওয়াবার' আদেশের আগে তিনটি বন্ধুতে লেখা সম্বন্ধে কতকগুলি স্বপ্ন দেখেছিলেন।

একজন স্বপ্ন দেখলেন* – তিনি ট্রেনে করে চলেছেন, ট্রেনে অনেক লোক। তাদের সঙ্গে হরিকথা হলো। দ্রষ্টার হাতে একটি পেন্সিল। শেষ স্টেশনে ট্রেন থামতে দ্রষ্টা নেমে গেলেন। হাতে কিছু নেই। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে তিনি যাচ্ছেন। একটি লোক ট্রেন থেকে নেমে ছুটে এসে হাতে একটি পেন্সিল দিয়ে গেল। পেন্সিলটি হাতে রইল – স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

এই স্বপ্নের অর্থ আগে বোঝা যায় নি। লেখবার আদেশে স্বপ্নের অর্থ বোঝা গেল।

একটি সন্ন্যাসী বন্ধু (পূর্বে কথিত ১২/১৩ জনের মধ্যে একজন) স্বপ্নে দেখলেন – আমাদের আর একটি বন্ধু তাঁকে বলছেন, – "কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হোক – নূতন কারও কাছে আসতে মানা।"

---

*দ্রষ্টা লেখক স্বয়ং

আবার এই সন্ন্যাসী বন্ধুটি দেখলেন – একটি মূর্তি বিছানায় বসে লিখছেন। তিনি কাছে আসতে ইতস্ততঃ করছেন। তাঁর মনে উদয় হলো – ইনি ত' আমাদের আপনার লোক – এঁর কাছে যেতে কিসের ভয়?

আর একটি দূরের বন্ধু স্বপ্ন দেখলেন – "যা হবার তা হয়েছে – এখন নূতন করে ঠাকুরের কাছে কবুলতি দিতে হবে।"

এই তিনটি স্বপ্নের সম্পূর্ণ অর্থ আগে বোঝা যায় নি।

লেখার আদেশের স্বপ্নে বোঝা গেল।

ঠাকুরের – 'আখ্যার তাই ব্যাখ্যা'।

ঠাকুর কৃপা করে গ্রহণ করুন।

ঠাকুরের দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত – অপরের মুখ থেকে – এই লেখা বন্ধ রইল (১০ই এপ্রিল, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৯ –

সাত দিন লেখা বন্ধ ছিল।

১২/১৩ জন বন্ধুর মধ্যে তিনজন আপত্তি করেছিলেন।

স্থির হলো – দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত, লেখকের মুখ থেকে নয়, অপরের মুখ থেকে – লেখা বন্ধ।

এই কথা হতে না হতেই সেই ঘরে একটি বন্ধু বললেন, "আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, এখনও বলা হয়নি, তাতে লেখার কথা আছে।"

তিনি স্বপ্নটি বললেন (তাঁর নিজের হাতের লেখা হতে স্বপ্নটি দেওয়া হলো) –

"২৫শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৫৫ সাল। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম – আমি ও তারাকাকা বিষ্ণুদার বাড়ির চিলেঘরের মধ্যে পাশাপাশি বসে আছি। আমাদের সম্মুখে বেদীর ওপর শ্রী ... বসে ঠাকুরের বাণীর অংশ বিশেষ ব্যাখ্যা করছেন। ঠিক এই সময়ে দরজার দিকে উগ্র আলো দেখতে পেয়ে সেইদিকে চাইলাম। আলোর মধ্যে শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি পাঠককে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমায় শুনিয়ে খাইয়েছিস!' ঠিক এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এবার কি লিখতে হবে?'

শ্রীশ্রী ঠাকুর – 'হ্যাঁ'।

পাঠক – 'দলিল কোথায়?'

শ্রীশ্রী ঠাকুর – 'মহিন্দর মাস্টারের কাছে।'

এই সময় আমি যেন কী বলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে ঠাকুরের পদতলে পড়ে গেলাম। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত অসাড় হয়ে পড়েছিলাম। সম্পূর্ণ দেহজ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম খুব ঘেমে গেছি। ওঁ শান্তি!"

বন্ধুর এই স্বপ্নটি প্রথম আদেশের সমর্থন (Confirmation)।

এতে তৃপ্তিলাভ করা গেল না।

যাঁরা লিখতে প্রথম আপত্তি তুলেছিলেন, অন্ততঃ তাঁদের একজনের মুখ থেকে আবার আদেশ শোনবার জন্য লেখা বন্ধ রইল।

রবিবার এই আপত্তি উঠেছিল। যিনি প্রথম আপত্তি তুলেছিলেন তিনি সোমবার এই স্বপ্নটি দেখেন –

"স্থান – বাজার। বাজারের একটি দেওয়াল।

দেওয়ালে একটি বিশেষ মোটা টিনের নল। সেই টিনের নলের নিচে একটি বড় চৌকো টিনের পাত্র। ওপরের মোটা নল দিয়ে, সমস্ত নলটির ফাঁক জুড়ে, নিচের চৌকো পাত্রটিতে মধুর অবিচ্ছিন্ন ধারা পড়ছে। দুটি লোক ঐ টিনের পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁরা বন থেকে ঐ মধু এনেছেন। নিচের ঐ বড় চৌকো পাত্রে একটি সরু রবারের নল লাগানো আছে। ঐ সরু নল থেকে খুব জোরে ঐ মধু বাজারে বিতরণ হচ্ছে।"

'মধু' – চৈতন্যের প্রতীক।

স্বপ্নে মধু দর্শন – দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি – চৈতন্য দর্শন।

স্বপ্নের সমস্ত অর্থ বলা হল না, কারণ এর ষোলো আনাই ব্যক্তিগত।

এই স্বপ্নদ্রষ্টা আপত্তি তুলে দ্বিতীয় দিনে স্বপ্নটি দেখেন, চতুর্থ দিনে স্বপ্নটি আমাদের বলেন, আর ছয় দিনের দিন এসে বলেন "এই স্বপ্নের অর্থ আমি বুঝেছি। এতে লেখবার আদেশ আছে, – স্বপ্নে জোরের সঙ্গে বিতরণ হচ্ছে মধু।"

দ্বিতীয় আপত্তিকারী বন্ধু এই স্বপ্নটি দেখলেন –

একটি প্রশস্ত রাস্তা।

রাস্তাটি দ্বিতল – উপরতলা আর নীচেরতলা। রাস্তার অনেকগুলি উপগলি আছে। রাস্তার মাঝে আছে ফাঁক। উপর তলা থেকে নিচের তলা দেখা যায়; উপরতলা থেকে নীচের তলার কথা শোনা যায়। স্বপ্নদ্রষ্টা উপরের রাস্তায় আর তার সচ্চিদানন্দগুরু নীচের রাস্তায়। উভয়ে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা।

দুজনেই চলেছেন। রাস্তার মাঝের যে ফাঁক – সেই ফাঁক দিয়ে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় এবং আলাপ হচ্ছে। সচ্চিদানন্দগুরু নীচের রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন স্বপ্নদ্রষ্টাকে, "তুই কোথায় রে?"

দ্রষ্টা – "আমি এই যে।"

সচ্চিদানন্দগুরু নীচের রাস্তা থেকে উপরের রাস্তায় এলেন।

উভয়ের মিলন হল – এ যেন পূর্বের ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী – "শব্দার্থ আর মর্মার্থ"।
উপরের রাস্তা – শব্দার্থ।
নীচের রাস্তা – মর্মার্থ।
স্বপ্নটি ঠাকুরের শব্দার্থ আর মর্মার্থ কথার যৌগিক রূপ।
তৃতীয় আপত্তিকারী বন্ধু ধ্যানে এইটি দেখেছেন –
"তিনি গাঢ় ধ্যানে মগ্ন। সমাধিস্থ।
সেই অবস্থায় দেখছেন – চাঁদ।
সেই চাঁদ গ'লে মাটিতে পড়ছে।
ঠাকুরের কথা – 'ভক্তি-চন্দ্র'।
সেই চাঁদ অর্থাৎ ভক্তি গ'লে পৃথিবীতে পড়ছে।"
লেখার তিনটি আপত্তিকারী বন্ধু – তিনজনেই এই লেখা সম্বন্ধে দেখলেন –
১ম। মধু ক্ষরণ – খুব জোরে।
২য়। শব্দার্থ আর মর্মার্থ।
৩য়। ভক্তিচন্দ্র গ'লে পড়ছে।
ঠাকুরের বাণীর যৌগিকরূপ।
তিনটি বন্ধুর এই দর্শনে ঠাকুর কৃপা ক'রে তাদের সংশয় দূর করেছেন।
জয় ঠাকুর!

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই 'রামকৃষ্ণ' নাম কে রেখেছিলেন? বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রকম বলেছেন। তাদের প্রণাম করি – তাঁরা আমার ঠাকুরের কথাই বলেছেন।

যে ভাগ্যবান ঠাকুরের কৃপায় শুদ্ধদৃষ্টি লাভ করে ঠাকুরকে 'রাম' এবং 'কৃষ্ণ'রূপে দেখেছিলেন, তিনিই ঠাকুরকে প্রথম রামকৃষ্ণরূপে পুজো করেছিলেন – তাই 'রামকৃষ্ণ'।

জটাধারী রামলালাকে ঠাকুরের দেহে লীন হতে ও খেলা করতে দেখতেন।

দেবেনবাবু ঠাকুরকে ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণমূর্তিতে দেখেছিলেন।

গোপালের মা দেখেছিলেন – গোপাল ঠাকুরের দেহে লীন হচ্ছে আবার বেরোচ্ছে।

কারও ইচ্ছা হলো আর অমনি 'গদাধরের' পরিবর্তে 'রামকৃষ্ণ' নাম হয়ে গেল, তা নয়।

এ হলো সাকার ধ্যানসিদ্ধের কথা।

যিনি নাম রেখেছিলেন – তিনি নন।

ঠাকুরের বহু ঈশ্বরীয় অবস্থার একটি অবস্থা।

সিদ্ধপুরুষকে তাঁর ইষ্টের মতন দেখায়, আর উঁচু সাকার ঘরে বহুবিধ ঈশ্বরীয় রূপে দেখা যায়।

মহাপ্রভুর পার্ষদরা মহাপ্রভুর বহুবিধ ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছিলেন।

শুদ্ধদৃষ্টি হলে ভক্ত এই রকম দেখতে পান, অবশ্য ঈশ্বর কৃপায়।

সাকার ইষ্ট-সিদ্ধ।

ঠাকুর বেড়াচ্ছেন – মথুরবাবু কুঠির ঘর থেকে দেখছেন। ঠাকুর সামনে ফিরছেন – মন্দিরের মা ভবতারিনী মূর্তি, আর পিছনে ফিরছেন – শিবমূর্তি।

গিরীশবাবুর ছোটভাই অতুলবাবু ঠাকুরকে মা-কালী রূপে দেখেছিলেন।

শ্যামপুকুরের বাড়িতে শ্যামাপূজার রাত্রে ঠাকুরের বরাভয় মূর্তি বহু ভক্ত দেখেছিলেন।

আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী চিরকাল ঠাকুরকে মা কালী রূপে দেখতেন। কাশীপুরের বাগানে এর প্রকাশ। ঠাকুরের ঘরে এসে ঠাকুরের লীলা-সম্বরিত দেহ দেখে ব'লে উঠলেন, "মা কালী, আমায় কেন ছেড়ে গেলে গো!"

"উঁচু সাকার ঘর।"

ভক্ত দেখেন – সিদ্ধপুরুষ একাধারে 'রাম' এবং 'কৃষ্ণ'।

নীলকন্ঠ ঠাকুরকে বলছেন, "আপনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

মাস্টারমশাই বলছেন, 'Jesus, চৈতন্য আর আপনি – তিনই এক।"

কেশববাবুর কথায় এরকম ইঙ্গিত আছে, "এরূপ মুহুর্মুহু সমাধি Jesus, মহম্মদ ও চৈতন্যের হতো।"

উপলব্ধির তারতম্য আছে। ভক্তদের আধারে (শরীরে) আত্মিক শক্তির স্ফুরণের পরিমাণেই এই তারতম্য।

তাই ঠাকুরের নাম 'রামকৃষ্ণ'।

"যেই রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।"

এ হলো অবতারলীলার কথা।

যে অখন্ড চৈতন্য শ্রীরামচন্দ্রের দেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যে অখন্ড চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের দেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই অখন্ড চৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এই অবতরণ দেখতে পাওয়া যায়।

দেহের মধ্যে চৈতন্যের অবতরণ।

ঠাকুর দেখেছিলেন।

“নিজে মনে মনে ভাবা নয়, চাক্ষুষ দেখা যায়, তবে জানবি ঠিক হয়েছে।”

তাই ঠাকুর বলেছিলেন, “যেই রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।”

অমৃতবাণী

বাণী, কার বাণী?

শ্রীভগবান দেহেতে মূর্ত হয়ে লীলা করেন। সেই লীলার বাণী।

আবার, তিনি দেহেতে বাণীরূপেও মূর্ত হন – শব্দ ব্রহ্ম।

সেই বাণী –নাম-নামী অভেদ।

শ্রীভগবান – অমৃত – শাশ্বত–সনাতন।

শ্রীভগবানের বাণী– দেহেতে মূর্ত হওয়ার বাণী– ভাগবত কাহিনী – অমৃত – মরে না– ‘নিত্য-লীলা’– শাশ্বত – সনাতন।

“তদবধি নিত্যলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।”

‘গৌররায়’– আত্মা।

দেহতত্ত্ব

শ্যামা মা কি কল করেছে।
কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতর
কত রঙ্গ দেখাতেছে।।
আপনি থাকি কলের ভিতরি
কল ঘোরে ধরে কলডুরি।
কল বলে আপনি ঘুরি,
জানে না কে ঘোরাতেছে।।
যে কলে জেনেছে তাঁরে,
কল হতে হবে না তারে।
কোন কলের ভক্তিডোরে,
আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।।

“মানুষে ভগবানের বেশি প্রকাশ।”

কতখানি বেশি?

"আমার কয় আনা ?"

"কেউ কেউ বলে পূর্ণ।"

ঠাকুর নিজের কথা বলেছেন।

ঠাকুরের মধ্যে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ।

নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারাদির মধ্যে ভগবানের পূর্ণ–যোলো আনা প্রকাশ। আর কোথাও নেই। "ঘুটির ভিতর মাছ, কাঁকড়া এসে জমেছে।"

"শুনহ মানুষ ভাই–
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

এই প্রকাশের তিনটি অবস্থা–

(১) সগুণ, (২) নির্গুণ আর (৩) অবতারতত্ত্ব।

(১) সগুণ অবস্থা

সচ্চিদানন্দগুরু লাভ। তিনি আশীর্বাদ করেন – বলেন, "তোর হবে।"

এই সচ্চিদানন্দগুরু মূর্ত হয়ে সম্পূর্ণ রাজযোগ শিক্ষা দেন।

তারপর কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা ব্যতীত এই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন না।

কুণ্ডলিনীকে 'প্রাণশক্তি' বলে – এও ভগবানের আর একটি রূপ।

সপ্তভূমি বা চক্র। ঠাকুরের 'সাততলা বাড়ি।'

প্রত্যেক ভূমির অনুভূতি বিভিন্ন রকমের।

এও দেহের মধ্যে ভগবানের রূপ প্রকাশ। সাধক দেখেন।

শেষে সপ্তমভূমি।

এই সপ্তমভূমিতে আত্মাসাক্ষাৎকার।

সচ্চিদানন্দগুরু দেখিয়ে দেন, আর মিলিয়ে যান।

এই দেহ থেকে এই আত্মা উত্থিত হয়েছে – পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়।

এরপর ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ কাটে।

নানাবিধ অনুভূতি – দীর্ঘ বার বছর চার মাস ধরে।

এই অবস্থার শ্রেষ্ঠ অনুভূতি – "আমি দেহ নই – আমি আত্মা!"

এরপর – "আত্মা যদি কৃপা করে সাধন করে।"

এর পরের অনুভূতি – বেদান্তের সাধন বা অনুভূতি।

আত্মা কী?

যাঁর ভিতর জগৎ আছে—আত্মার মধ্যে এই জগৎ দেখা যায়।

দেহের মধ্যে আত্মা—আত্মার মধ্যে জগৎ।

বৃহদারণ্যকেও একথা আছে।

এই-ই অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন।

কবীর বলেছেন, "কামহীন সরল জীবন যাপন কর—তাহলে আত্মার মধ্যে বিশ্বসংসার দেখতে পাবে।" *

ঠাকুরের —'ম' আর 'রা'। 'ম' মানে ঈশ্বর, আর 'রা' মানে জগৎ।

আত্মা, ঈশ্বর আর ব্রহ্ম—তিনই এক।

এই হলো ঠাকুরের 'বিজ্ঞানীর' প্রথম অবস্থা। বহু আনন্দেই দিন কাটে এই অবস্থায়। দেহীর এই অবস্থা—তিনি নিজে তো জানেনই, ভগবানের দান এইখানেই শেষ হয় না। অপরকে দেখান স্বপ্নে—ঐ দেহী একটি 'গ্লোব' (Globe) মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন—গোস্বামী।

'এত বড় বিশ্বসংসার আমার ভিতরে। আমি আত্মা! আত্মা ভিতরে!' একটা খুঁত খুঁত ভাব আসে। মনে উদয় হয়, –'এত বড় জগৎ! এত বড় জগৎ!!' ভেল্‌কি লেগে যায়।

জগৎ বীজে পরিণত হয়।

ঠাকুরের, "গিন্নীদের ন্যাতাকাতার হাঁড়ি-নীলবড়ি, সমুদ্রের ফেনা, শশাবীচি সব আছে। সৃষ্টি নাশের সময় মা সমস্ত বীজ কুড়িয়ে রেখে দেন।"

দেহী এই ভেল্‌কি দেখে অবাক হয়ে যান।

আবার খুঁত খুঁত ভাব। আবার ভেলকি—বীজ স্বপ্নবৎ হয়ে যায়।

আবার খুঁত খুঁত ভাব। স্বপ্ন ত' আছে।

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল—কিছুই রইল না।

আমি—আত্মা—জগৎ—বীজ—স্বপ্ন—কিছু না, —বোধাতীত!

এই মহাকারণে লয় হওয়া।

"বেদান্তের সার—ঈশ্বর সত্য আর জগৎ মিথ্যা"—এ তত্ত্বজ্ঞানে।

'আমি এই দেহ'—এই সংস্কার থেকে আত্মার মুক্ত হওয়া, বিকাশ আর লয়—আর কিছু নেই।

---

* "Lead pure and simple life and behold the whole of creation within your own self" — Cultural Heritage of India, Sri Ramkrishna Centenary Volume.

এখানেই সগুণ সাধনার পরিসমাপ্তি।

(২) নির্গুণ

নির্গুণ ব্রহ্ম – কিছুই বলবার নেই।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা – তিন-ই নেই।

জ্ঞান – সচ্চিদানন্দগুরুমূর্তি।

'সে বড় কঠিন ঠাঁই
গুরু শিষ্যে দেখা নাই।'

জ্ঞেয় – আত্মা, সগুণ ব্রহ্ম।

জ্ঞাতা – দেহে আত্মার লীলার সাক্ষী স্বরূপ। শেষে বোধ মাত্র।

এই লয় হওয়াকে 'স্থিতসমাধি' বলে।

"সব জিনিস এঁটো হয়েছে – বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র – সব; কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।"

"সে সাগরে নামলে আর কেউ ফেরে না" – অবতার ছাড়া।

শ্রীভগবান যে দেহে অবতীর্ণ হবেন – সেই দেহ তিনি রেখে দেন। সেই দেহে তিনি নিজের রস নিজে আস্বাদন করেছেন এবং আরও করবেন।

দত্তাত্রেয় এবং জড়ভরতের জড়সমাধি। এঁরা আর ফিরতে পারেন নি।

শুক আর নারদের চেতন সমাধি – নিগমে।

নির্গুণ থেকে সগুণ – সচ্চিদানন্দগুরু।

সগুণ থেকে নির্গুণ – দুটি অবস্থা, জড় সমাধি আর স্থিত সমাধি। যাদের স্থিত সমাধি তাঁদের দেহ টুটে যায়। শুক সচ্চিদানন্দ সাগর দর্শন স্পর্শন করেছিলেন মাত্র।

আবার নির্গুণ থেকে তত্ত্বজ্ঞান – "তুমি", – "তুমি"!

তত্ত্বজ্ঞান থেকে অবতারত্ব – ভাগবত লীলা বলবার জন্য।

তত্ত্বজ্ঞান

সাধন আরম্ভ হলো – এই দেহই আমি – এই থেকে। সমাপ্ত হলো – কিছুই নেই – শূন্য! – তাও বলবার যো নেই।

"আদ্যাশক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ" হয়ে গেছে।

আদ্যাশক্তি নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণত হয়েছে।

আমি নেই – বোধ নেই – কিছু নেই।

এরপর যখন চেতনা ফিরে আসে তার রূপ হলো – "আমি – না"।

তবে কে?

"তুমি – তুমি – তুমি!"

এই হলো ঠাকুরের– " তুঁহু! তুঁহু!"

এই 'তুমি'তে অবস্থান করাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে।

তত্ত্বফল আহরণ করতে (নিজেকে পাড়তে) হয়। দেখতে পাওয়া যায়। তড়াং করে নিজে গাছে উঠেছি। গাছটি অপরূপ। সে রকম গাছ কোথাও দেখা যায় না। ফলটিও অপরূপ। ফলটি গাছ থেকে ছিঁড়ে হাতে ধরা রইলো – সাধারণ জ্ঞান ফিরে এল।

এই তত্ত্বজ্ঞানই ক্রমশ অবতারের রূপ ধারণ করে ফুটে ওঠে। এর অপর নাম 'নিগম'।*

(৩) অবতারতত্ত্ব

শ্রীভগবান দেহেতে অবতীর্ণ হচ্ছেন। তিনি জানিয়ে দেন – তিনি অবতীর্ণ হবেন।

ঋষিরূপে সাক্ষাৎকার হয়ে বলেন, 'চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে আসছেন।'

ঋষি নেমে এলেন শূন্য থেকে, আর নিকটে এসে শূন্যেই রইলেন। সেখান থেকে কথা বলেন।

বিরাট দেহ, বিশাল বক্ষঃস্থল, আর পাখির পালকের মতো মোটা শক্ত দাড়ি।

এই দাড়ি বুঝিয়ে দেয় – ইনি পুরাতন পুরুষ।

দ্বিতীয় অনুভূতি – চৈতন্য – অখন্ড চৈতন্য।

" যে চৈতন্যে জগতের চৈতন্য।"

সহস্রারের মধ্যে দপ্ করে লাল দীপকের আলো জ্বলে ওঠে।

"অন্ধকারে লাল চীনে দেশলায়ের আলোর মতন।"

দেহে চৈতন্য উদ্ভূত হলো।

আবার এই চৈতন্যের অবতরণ।

প্রথম অবতরণ – সহস্রার থেকে কন্ঠ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অবতরণ – সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত।

জ্যোতিরূপে এই অবতরণ। জ্যোতির রূপ অবর্ণনীয় – তুলনারহিত।

তারপর মানুষ-রতন – অবতার।

"মানুষের ভিতর মানুষ-রতন আছে"।

---

*একে বলে পৌরানিক নিগম

এই 'মানুষ-রতন' দেখতে পাওয়া যায়— দেহের মধ্যে। তিনি পরম ভক্ত। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা – সারা কপাল জুড়ে,– বর বিয়ে করতে যাবার সময় যেমন কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা পরে। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন। সেই সঙ্গে দ্রষ্টার হাতের তালু কির্‌কির্‌ করে ওঠে।

ঠাকুরের –"মানুষ-রতন"।

মহাপ্রভুর আত্মা – শ্রীকৃষ্ণ, আর মহাপ্রভুর দেহ – শ্রীমতী।

যীশুর – বর (bridegroom)।

এই হলো অবতারতত্ত্ব।

অবতারতত্ত্বে আর এক বিশেষত্ব – তিনি একাই আছেন – আর কিছু নেই।

তিনি একা এবং বহু।

এই জগৎ তাঁর ভিতরে।

সৃষ্টি – স্থিতি – প্রলয় সব তাঁর ভিতরে।

সৃষ্টি হয়নি,– স্থিতি ও প্রলয়ের কথাই ওঠে না – সেও তিনি,– অজ।

সগুণ, নির্গুণ – দুই অবস্থাতেই তিনি।

'খোসা আর আঁটিটি থাকলে তবে আমটি বাড়ে, পাকে।'

দেহসমেত এক তিনিই আছেন – আর কিছুই নেই। তাই ঠাকুর (কৃষ্ণ অবতারে) যখন দ্রৌপদীর এক কণা অন্ন ও একটু শাক খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলেন – সেই সঙ্গেই দুর্বাসা বাইশ হাজার শিষ্যসমেত তৃপ্ত হয়েছিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। নৌকা করে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরছেন; কাশীপুর কষ্টহারিণী ঘাটের সামনে নৌকা। নৌকায় আছেন – ঠাকুর, কালী মহারাজ, লাটু মহারাজ আর গোলাপ মা। ঠাকুরের বড় খিদে – ঝাঁ ঝাঁ করছে। গোলাপ মা'র কাছে মাত্র চারটি পয়সা, আর কারো কাছে কিছু নেই। নৌকা কষ্টহারিণীর ঘাটে বাঁধা হলো। চার পয়সার ছানার মুড়কি কেনা হলো। নৌকা আবার চলল। ছানার মুড়কির ঠোঙাটি ঠাকুরের হাতে। তিনি এক এক করে ছানার মুড়কিগুলি সব খেয়ে ফেললেন। তারপর আঁজলা করে গঙ্গার জল। খুব তৃপ্তি। খিদে সকলেরই পেয়েছিল। সকলেই ভেবেছিলেন ঠাকুর দু'একটা ছানার মুড়কি খেয়ে ঠোঙাটি তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। কাজে কিন্তু তা হলো না। সকলেই হতাশ এবং চুপ। কিন্তু ঠাকুরকে যখন তৃপ্ত বলে বোধ হলো, তখন তাঁরাও যেন পরম তৃপ্তিলাভ করলেন।

দক্ষিণেশ্বরের ঘাট। নৌকার মাঝিরা মারামারি করছে। একজন মাঝি আর একজন মাঝির পিঠে দারুণ আঘাত করেছে। ঠাকুর তাঁর নিজের ঘরে বসে আছেন।

পিঠে আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠল। আর ঠাকুর ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

গণেশ বিড়ালকে মেরেছিলেন। ভগবতীর কাছে এসে দেখলেন – মারের দাগ ভগবতীর গায়ে।

ব্রহ্মবিদ্যা

ঋষিরা এই আত্মিক স্ফুরণকে ব্রহ্মবিদ্যা বলেছেন। নিষ্কাম ঋষিরা বিদ্যার জন্য বিদ্যালাভ – এই কথা বলেছেন।

দেহতত্ত্ব আর ব্রহ্মবিদ্যা এক।

ব্রহ্মবিদ্যার চার অবস্থা– সচ্চিদানন্দগুরু, সগুণ, নির্গুণ, আর অবতারতত্ত্ব।

সচ্চিদানন্দগুরু – আত্মার বরণ – শ্রীভগবানের কৃপা।

সগুণ অবস্থা – আত্মাসাক্ষাৎকার।

নির্গুণ অবস্থা – লয় হওয়া – দেহ আছে।

অবতারবাদ – আমি একাই আছি। বামদেবের 'অহমস্মি'।

আত্মাসাক্ষাৎকারের পর – আমি আত্মা এই জ্ঞান – আর সেই আত্মার মধ্যে জগৎ।

'আমি - না, তুমি'।

এই 'আমি' 'তুমি'তে পরিবর্তিত হয়েছে।

আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ হয়েছে – তত্ত্বজ্ঞান।

সেই 'তুমি' মূর্তি ধারণ করে দেহের মধ্যে লীলা করছেন।

সাধারণ ধারণা – আত্মাসাক্ষাৎকার হলেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হলো।

"জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি আর হয়। সে দু'এক জনার।"

ঠাকুরের এই জ্ঞান – অর্থাৎ আত্মাসাক্ষাৎকার।

আর এই 'দু'টিকে বাদ দিতে হবে। এটি কথার মাত্রা মাত্র। অর্থাৎ সে ঠাকুরের মতো অবতার পুরুষের হয়। এক সময়ে পৃথিবীতে একটি মাত্র।

শ্রীকেশব – "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নন। এখন পৃথিবীতে এঁর চেয়ে বড়লোক আর কেউ নেই।"

'ঈশ্বর বস্তু সব আধারে ধারণা হয় না।'

বস্তু – আত্মা – দেখা যায়, তাই বস্তু – সগুণ।

'সব' মানে – এক সময়ে (যুগে) একটি, – ঠাকুর।

"আত্মা যাকে বরণ করেন.............।"

এগার বছর বয়সে ঠাকুরের জ্যোতিদর্শন করে সমাধি – আনুড় গ্রামে যাবার মাঠে। আত্মার বরণ ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ।

অবতারলীলা

দেহেতে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন।

অবতারতত্ত্বের সমস্ত কথা দেহতত্ত্বে প্রকাশ।

“আত্মা যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন”– এই থেকে আরম্ভ করে দেহের মধ্যে অখণ্ড চৈতন্যের ‘মানুষ-রতন’ হওয়া পর্যন্ত – সমস্তই অবতারলীলা।

এই মনুষ্যদেহে তিনি স্ফূর্ত হয়ে নিজের রস নিজে আস্বাদন করছেন।

“আমি কি, আমি কি, বলে শিব স্বস্বরূপ দর্শন করে নাচ্‌ছেন।”

অবতারলীলার মধ্যে আর চার রকম লীলা আছে – নরলীলা, জগৎলীলা, ঈশ্বরলীলা আর দেবলীলা।

(১) নরলীলা

নরদেহে শ্রীভগবান প্রকাশ হয়ে লীলা করেন।

“মানুষ হয়েছেন ত’ ঠিক মানুষ”।

সেই মানুষের মত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, দুঃখ, অসুখ, সব আছে – অবশ্য কাম-কাঞ্চন বাদ।

“পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র সীতার শোকে কেঁদেছিলেন।”

অক্ষয় (ঠাকুরের বড় ভাইয়ের ছেলে) মারা গেছেন। তার পরদিন ঠাকুর ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিলেন, –“ওরে অক্ষয় রে, তুই কোথায় গেলি রে।”

হাত ভেঙেছে – ঠাকুর কাঁদছেন। মুখে কিন্তু এক কথা। সেই অবস্থায় শ্রীমহিম চক্রবর্তী মশায়কে বলছেন, –“বাবু, সচ্চিদানন্দ লাভ না হ’লে কিছু হলো না।”

গলায় ঘা হয়েছে। ঠাকুর অস্থির হয়ে ডাক্তারের জামার হাতা ধরে বলছেন, “বাবু, বাবু, আমার এই অসুখটা সারিয়ে দাও”।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পা মেলে বসে কাঁদছেন আর বলছেন, “মা, আমায় ....ভাত চিরটা কাল খাওয়াচ্ছিস।”

মা ভবতারিণীর যে ব্রাহ্মণ ভোগ রাঁধতেন, তিনি ঠাকুরকে জামাই বলতেন, – অর্থাৎ শ্বশুর জামাই সম্পর্ক। শ্বশুরমশাই সকালে ঠাকুরের দ্বারে এসে উপস্থিত – জামাইকে জিজ্ঞাসা করতে, “মায়ের কি ভোগ রান্না হবে?” ঠাকুর বলতেন,–“বড় বড় রাধাবল্লভী আর চাপ্ চাপ্ ছোলার ডাল।”

ফাগুর দোকানের হিং-এর কচুরি শাশ্বত – ঠাকুরের নরলীলার স্মৃতি জড়িত।

(২) জগৎলীলা

"এ জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য।"

"তিনিই এই জগৎ হয়েছেন।"

আত্মার মধ্যে জগৎ।

"মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।"

'আমি' রূপ আয়নাতে – আত্মার মধ্যে যে জগৎ তারই প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বও সত্য।

"আমি সব লই।"

অফুরন্ত এই জগতের ঐশ্বর্য। অসাধ্য বর্ণনা।

"এক সের ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না।"

আত্মাই একরূপে (অর্থাৎ অনুভূতির অবস্থায়) জগৎ হয়ে লীলা করছেন।

"ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ – সব এক সঙ্গে দেখে।"

বাহ্য জগৎও চৈতন্যময় – চতুর্থভূমিতে অর্থাৎ মনোময় কোষের অনুভূতি। সাদা চোখে দেখতে পাওয়া যায়।

"যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য।"

দুটি অবস্থা – চতুর্থভূমির ও বিজ্ঞানীর প্রথম অবস্থার অনুভূতি।

আমার মধ্যেই জগৎ।

আমিই এই জগৎরূপে প্রকাশ হয়েছি।

এই হলো ঠাকুরের জগৎলীলা,– ঠাকুর দ্রষ্টা মাত্র। তিনি ভক্তি ও ভক্ত নিয়ে ছিলেন।

(৩) ঈশ্বরলীলা

"আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম – তিন-ই এক।"

"আত্মা যদি কৃপা ক'রে সাধন করেন....।" এই আত্মার সাধন হলো – ঈশ্বরলীলা।

আত্মা – আত্মার মধ্যে জগৎ (বিশ্বরূপ) – আবার সেই বিরাট জগৎ বীজবৎ – সেই বীজও স্বপ্নবৎ – সে স্বপ্নও থাকে না – নেই।

সগুণ ব্রহ্মের নির্গুণ হওয়া। এই হলো ঈশ্বরলীলা।

(৪) দেবলীলা

সিদ্ধপুরুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন – জীবত্ব নাশ হয়েছে। ছোট শিশুর দল পূজার উপকরণ নিয়ে উপস্থিত। সিদ্ধপুরুষকে বেদীতে বসিয়ে পূজা ক'রে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত

করে। এই হচ্ছে প্রথম স্তরের অনুভূতি।

আবার দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি আছে। একটি বন্ধু স্ব প্নে দেখছেন – তিনি আর তার বন্ধু, যে ঘরে বসে কথামৃত পাঠ হয়, সেখানে বসে আছেন। শিশুর দল স্বপ্নদ্রষ্টার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, "এ বুড়োটা এতদিন পরে ব্রাহ্মণ হলো।"

বন্ধুটির ব্রাহ্মণ শরীর। বয়স ৫২। এই স্বপ্ন দেখার আগে – স্বপ্নে তাঁর জ্যোতিদর্শন ক'রে সমাধি হয়েছিল। আরও বহুবিধ অনুভূতি হয়েছে স্বপ্নে।

এই শিশুর দল – দেবতা।

এইরকম দেবলীলা দেখতে পাওয়া যায়।

দেবতারা স্তবস্তুতি করেন।

ব্রাহ্মণ হওয়া স্বপ্নদ্রষ্টা বন্ধুটি আর একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি, এই ঘরের একটি বন্ধু, আরও দু'জন বন্ধু একটি বেঞ্চিতে বসে আছেন। দূরে উচ্চ হরিনামের গান শুনতে পাওয়া গেল। হরিনামের দল হরিনাম করতে করতে বন্ধুদের সামনে এসে দাঁড়াল। মূল গায়েন –তাঁর নটবর বেশ, মাথায় চূড়া, পরনে রঙিন কাপড়, আকৃতি স্থির ও শান্ত।

তিনি একটি বন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে তাঁকে 'নিমাই' ব'লে স্তব করতে লাগলেন। এই অবতারলীলা। হরিনামের দল আর মূল গায়েন – নটবর বেশ – এঁরা হলেন দেবতা। বন্ধুকে জানিয়ে দিলেন – ঐ 'নিমাই' বন্ধুটির মধ্যে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।

ঠাকুরের "অসংখ্য অবতার"। আবার বন্ধুটি নিজের দেহের ভিতরে স্বপ্ন দেখছেন – তাই অবতার লীলার ফল তাঁকেও বর্তাচ্ছে।

যৌগিক রূপ

যোগ মানে পরিবর্তন – যুক্ত হওয়া নয়।

"আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।"

আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হচ্ছে সগুণ এবং নির্গুণ দুই অবস্থায়।

অলক্ষ্যে ও নির্লিপ্তভাবে আত্মা ওতপ্রোত অবস্থায় দেহের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে রয়েছেন।

আত্মা কৃপা ক'রে দেহ থেকে মুক্ত হলেন – তিনি রূপ ধারণ করলেন।

রূপ মানে 'আকার'। সাধককে দেখান – "আমি কী"।

সচ্চিদানন্দগুরু – প্রথম রূপ।

ভক্ত দেখেন – চিৎ-ঘন-কায়।

"হিমালয়ের গৃহে পার্বতী জন্মাল, হিমালয়কে বহুবিধ রূপে দর্শন দিল। তখন হিমালয় বলল, 'মা, তোমার একটি সত্যিকারের রূপ আছে। আমায় সেইরূপে দেখা দাও।' পার্বতী বলল, 'বাবা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও তাহলে সাধুসঙ্গ কর।"

"হিমালয়"– পর্বত হিমালয় নয় – এই দেহ।

"পার্বতী"– ভাগবতী তনু। ভক্ত দেখে তাঁর কৃপায়।

"বহুবিধ রূপ" – উঁচু সাকার ঘর।*

"সত্যিকারের রূপ"– আত্মা।

"ব্রহ্মজ্ঞান"– সগুণ অবস্থা, আর নির্গুণে লয় হওয়া – স্থিত সমাধি।

"সাধুসঙ্গ"– ঈশ্বর সৎ আর সমস্ত অসৎ।

এই সৎসঙ্গ – সতে পরিবর্তিত হওয়া।

'আমি দেহ নই-আমি আত্মা' – 'সো'হং' – আর ক্রমশ আত্মার বিকাশ, বিশ্বরূপ, বীজবৎ, স্বপ্নবৎ, লয়।

সৎসঙ্গ – সতে পরিবর্তিত হওয়া, আর সৎ হয়ে যাওয়া – এই হলো সাধুসঙ্গ।

দ্বিতীয় স্তরের সাধুসঙ্গ -

সচ্চিদানন্দগুরু যদি কাউকে দেখিয়ে দেন আর বলেন, "এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সঙ্গ কর"– সেও সাধুসঙ্গ।

তৃতীয় স্তরের সাধুসঙ্গ –

সচ্চিদানন্দগুরুরূপে আত্মা যে মূর্তি ধারণ করেন – ঐ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সঙ্গ।**

দেহেতে ফুটে ওঠে – আত্মা রূপ ধারণ করে – এই-ই যৌগিক রূপ।

---

* রাম, কৃষ্ণ, শিব, বুদ্ধ, যীশু, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি। ** যদি তিনি জীবিত থাকেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের অমৃত বাণীর যৌগিক রূপ

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮২খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীমন্দির – দক্ষিণেশ্বর

১। **"মাস্টার দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতেছেন।"**

শ্রীভগবানকে দেখলে সকলে বাক্যশূন্য হয়ে যায়।

বাক্যশূন্য হওয়া – সমাধিস্থ হওয়া।

ঠাকুরকে দেখে পূজনীয় মাস্টার মশাই বাক্যশূন্য হয়েছেন – সমাধিস্থ হয়েছেন। এখানে সমাধির আভাস মাত্র।*

দৈব প্রতিষ্ঠা করছে – বাক্যের দ্বারা আর মাস্টার মশাইয়ের দেহে। মাস্টার মশাই ঠাকুরকে দেখছেন ও ঠাকুরের কথা শুনছেন – তাই অবাক্।

ঠাকুর যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ – নররূপে শ্রীভগবান।

২। **".....যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা কহিতেছেন।"**

"ওগো, সে যে দৈবী মানুষ"।

অশ্বিনীবাবুর প্রশ্নে কেশববাবুর সম্বন্ধে ঠাকুর ঐ কথা বলেছিলেন।

দৈবী মানুষ আছে, – মাস্টার মশাইও সেই দৈবী মানুষ। অবতারের সঙ্গে অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ আসেন। ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হরিনাম সংকীর্তনের দলে মাস্টার মশাই ও বলরামবাবুকে দেখেছিলেন – ভাবে নয়, খালি চোখে।

সেই দৈবী মানুষ মাস্টার মশাই দৈবী চোখে জগৎ দেখছেন, আর দৈবী কথা তাঁর শ্রীমুখ থেকে বার হলো – "সাক্ষাৎ শুকদেব।"

শুক ব্রহ্মর্ষি – জ্ঞানের ঘন মূর্তি। সাধন ক'রে হয়নি – আপনা হ'তে হয়েছে।

পুরানের শুক নিত্য।

সেকালে ছিল আর হবে না – তা নয়। আত্মা যাঁকে বরণ করবেন তিনি ব্রহ্মর্ষি শুক হবেন আর পরীক্ষিৎকে হরিকথা বলবেন।

১০/১১ বছর বয়সে আনুড় গ্রামে যাবার মাঠে ঠাকুরের জ্যোতিদর্শন ও সমাধি। আত্মা ঠাকুরকে বরণ করলেন – দেহেতে ছিলেন, প্রকাশ হলেন।

১২ বছর ৪ মাস বয়সে – সচ্চিদানন্দ, চিৎ-ঘন-কায় মূর্তি ধারণ ক'রে ভক্তের কাছে গুরুরূপে আসেন – ভক্তকে আশীর্বাদ করেন এবং পরে সম্পূর্ণ রাজযোগ ভক্তের দেহেতে ধারণা করিয়ে দেন।

---

* 'যতো বাচো নিবর্তন্তে'- তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

পুরানের শুক বার বছর চার মাস গর্ভবাসে ছিলেন।

আত্মা বার বছর চার মাস দেহেতে অলক্ষ্যে ছিলেন – তারপর যোগনিদ্রা ভেঙে চিৎ-ঘন-কায়ে দেহীর দেহে উদয় হলেন। দেহী দেখলেন।

শুকের জন্ম হলো– দেহেতে।

এবার 'হোমা' পাখির চোঁচা দৌড় মায়ের কাছে–পাছে মাটি গায়ে ঠেকে।

দেহেতে আবদ্ধ হবার আগেই–সাধনের অনেক রকম অবস্থার পর শূন্যে লীন হওয়া–জড় সমাধি–পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

তারপর দেহে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন আর হরিকথা বলেন।

শুকের দুই অবস্থা।

প্রথম অবস্থা–দেহেতে আত্মার বরণ থেকে আরম্ভ আর 'মানুষ-রতন' হওয়া পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অবস্থা–ভাগবত বলা অর্থাৎ ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকা।

ভাগবত কথা–যেসব অনুভূতি হয়ে সহস্রারে আত্মাসাক্ষাৎকার হয়, নির্গুণ ব্রহ্মে লয় হয় আর পরে 'মানুষ-রতন' হয়–সেই সব অনুভূতির কথা।

যাঁরা এই হরিকথা শুকের মুখ থেকে শোনেন, তাঁদের দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হয়। আবার আধার বিশেষে এই অনুভূতির তারতম্য হয়।

৩। **"সর্বতীর্থের সমাগম.....".**

দেহে সপ্তভূমি–বেদমতে, আর ষড়চক্র–তন্ত্রমতে, পরিস্ফুট হয়।

এই ভূমি বা চক্রকে তীর্থ বলে।

কুণ্ডলিনীর ষষ্ঠভূমি অতিক্রম ক'রে সপ্তমভূমিতে আগমন–আত্মা সংকলিত হওয়া আর আত্মার সাক্ষাৎকার।

শ্রীভগবানের প্রকাশ।

যেখানে শ্রীভগবান সেইখানেই সর্বতীর্থ।

৪। **"শ্রীচৈতন্য পুরীধামে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাম গুণকীর্তন করিতেছেন।"**

এই হলো শুকের দ্বিতীয় অবস্থা–ভগবান, ভক্ত আর ভাগবত।

৫। **"যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়..।"**

নাম নামী অভেদ।

নাম স্মরণে নামীর উদয়।

দেহেতে ভগবান–যেমনি স্মরণ, অমনি উদয়।

ভগবানের উদয়ে দেহ আনন্দে পরিপূর্ণ !
পুলক আর অশ্রু – সাত্ত্বিক বিকার ;
দেহের পূর্বাবস্থার পরিবর্তন – ভগবান দেহেতে সাড়া দিচ্ছেন তাই দেহব্যাপ্তি আনন্দ।

৬। **"সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"**
'সন্ধ্যা'—স্থূল।
'গায়ত্রী'—সূক্ষ্ম।
'ওঁকার'—কারণ।
স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ।

৭। **"পরমহংস আছেন।"**
বেদ ও বেদান্তমতের সাধনে যিনি সিদ্ধ হন, তাঁকে 'পরমহংস' বলে।
বেদমতের সাধন—পঞ্চকোষের সাধন—আগম।
দেহ থেকে শ্রীভগবান উঠছেন—জল আর দুধ আলাদা হচ্ছে।
ভাগবতী তনু আত্মা রূপে পরিণত হলো।
জল আর দুধ আলাদা হয়ে গেল।
দেহ আর আত্মা পৃথক হয়ে গেল।
শারীরিক লক্ষণ – ঘাড় সমেত মাথা ডাইনে বাঁয়ে ঘট্ ঘট্ ক'রে নড়তে থাকে। শব্দ হয় পাকা সুপারি বা খোড়ো নারকেলের মত।

"কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, আবার কেউ বা দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।"
'দুধের কথা শোনা'– দেহে আত্মা আছেন, – এই কথা শোনা।
'দুধ দেখা'– আত্মাসাক্ষাৎকার হওয়া।
'দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া' – বিজ্ঞানীর অবস্থা। ইনিই পরমহংস।

৮। **"আহা কি সুন্দর স্থান ! কি সুন্দর মানুষ ! কি সুন্দর কথা ! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা ক'রছে না।"**
ভগবান এখানে বিরাজ করছেন। এখানে সমস্ত সুন্দর – সমস্ত মধুময়।
চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করছে—নড়বার সাধ্য নেই।

৯। **"আর বাবা বই টই ! সব ওঁর মুখে।"**
দৈব চালিত হয়ে বৃন্দে ঝি'র মুখ দিয়েও সত্য প্রকাশ পাচ্ছে—ঠাকুরের সান্নিধ্যে – সংস্পর্শ বশতঃ।
'বই টই'—জ্ঞানের প্রতীক।

'ওঁর মুখে'—ওঁর ভিতরে।

মানুষের ভিতরে আত্মা। আত্মার মধ্যে জগৎ। সেই জগৎ যাঁর চৈতন্যে চৈতন্য, সেই চৈতন্য অবতীর্ণ হয়ে ঠাকুরের ভিতর থেকে কথা কইছেন।

১০। **"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক হলেন।"**

মাস্টার মশাই ইংরেজী-পড়া লোক।

ইউরোপের পণ্ডিতদের ধারণা—জ্ঞান বাইরে থেকে আসে। তাঁরা জগৎ বিশ্লেষণ ক'রে সত্যে পৌঁছাতে চান। মাস্টার মশাইয়ের তখনও সেই ধারণা। তাই ঠাকুর বই পড়েন না শুনে অবাক হয়েছেন।

ঠাকুর দু'টি মাত্র অক্ষরে এ সমস্ত উল্টে দিয়ে গেছেন।

'ম' আর 'রা'।

'ম' মানে ঈশ্বর। 'রা' মানে জগৎ।

আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ।

আগে আত্মা—দেহের মধ্যে সাক্ষাৎকার।

তারপর আত্মার মধ্যে জগৎ—অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শন।

আত্মা কৃপা ক'রে সাধন ক'রে দেখিয়ে দেন।

এই হলো বেদান্তের প্রথম স্তরের বিদেহ সাধনের অনুভূতি।

স্বয়ম্ভু আত্মার – স্বয়ং প্রকাশ।

১১। **"ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন এরই নাম ভাব।"**

অর্ধবাহ্য অবস্থা।

দেহের অর্ধেকে ভগবান বিকাশ হয়েছেন – লম্বিতভাবে। হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম—এ সমস্ত অর্ধেক প্রকৃতি আর অর্ধেক পুরুষ – ভাব মূর্তি।

আধখানা দেহের পরিবর্তনে এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেদিকের গাল ফুলে ওঠে, চোখটি বুজে যায়, জিভের আধখানা অসাড় ও অঙ্গে পুলক। দেহের দক্ষিণ দিকেই এটা হয়।

১২। **"ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হন।"**

'সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর'—শুদ্ধদেহে দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে এইরকম পরিবর্তন।

ভগবান বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে আছেন। বাইরে পরিবর্তন—তাই ঠাকুরের শুদ্ধ

দেহে—শ্রীভগবানের, 'বাবুর' বৈঠকখানা ঘরেও পরিবর্তন।

'বাহ্যশূন্য' – পূর্ণ সমাধিস্থ –অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লীন, কখনও বা অখন্ড চৈতন্যে লীন।

১৩। **"না – সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।"**

'সন্ধ্যা'—বৈধী ধর্ম।

ঠাকুরের ব্রহ্মবিদ্যা— 'করামলকবৎ' ছিল।

স্মরণ, মনন, শ্রবণ মাত্র দেহেতে শ্রীভগবান বিরাজ করতেন—সমাধিস্থ হতেন। কোন রকম বৈধী ধর্ম পালন করতে গেলে অঙ্গ বিকল হয়ে যেত।

"ত্রি-সন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়।"

১৪। **"এ সৌম্য কে? –যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে – বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়? – কি আশ্চর্য! আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে । ইনিও বলিয়াছেন, 'আবার এসো।' কাল কি পরশ্ব সকালে আসিব।"**

ভগবানের সংস্পর্শে মাস্টার মশাইয়ের চিত্তশুদ্ধি আরম্ভ হয়েছে।

মাস্টার মশাই ঠাকুরের চিন্তা করছেন।

ভগবানের চিন্তায়—চিত্তশুদ্ধি—সাধন।

বাদুলে পোকা আলো দেখেছে।

আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। তবে এ মণির আলো, ঝাঁপ দিলেও পোড়ে না।

২৬শে ফেব্রুয়ারির কয়েকদিন পরে—
শ্রীমন্দির, দক্ষিণেশ্বর

১৫। **"তাঁহার গায়ে 'moleskin'-এর 'র‍্যাপার'।....' পায়ে চটি জুতা'।"**

পূজনীয় মাস্টার মশাইয়ের এই প্রথম ঠাকুরের ব্যবহারিক জীবনের বর্ণনা।

ঠাকুর অতবড় নামজাদা সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস। না আছে তাঁর জটা, না আছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে গেরুয়া, না আছে খড়ম, না আছে দন্ড, না আছে কমণ্ডলু, না আছে কোন বাহ্য চিহ্ন। এ আবার কিরকম পরমহংস!

ঠাকুর হলেন যুগাবতার।

যে যুগে যা আবশ্যক, যা দরকার—যুগাবতার সেই রকম জীবন যাপন ক'রে সকলকে শিক্ষা দেন।

"আপনি আচরি ধর্ম শিখায় অপরে।"*

---

* শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত

বৌদ্ধযুগ। শ্রীবুদ্ধ বসে আছেন। পরিচ্ছদ শ্রমণের। পীতাভ-হরিদ্রাবর্ণের কাপড়ে সমস্ত দেহ আবৃত।

শ্রমণগণেরও সেই একই রকম বেশ।

জগতের লোক শ্রীবুদ্ধ ও শ্রমণদের দেখল। ভক্তিভরে তাঁদের প্রণাম করল, দূরে দাঁড়িয়ে রইল, তাঁদের পাশে গিয়ে বসল না। তাঁরা যে দেবতা, অপর ব্যক্তি, আপনার জন নন।

শ্রীবুদ্ধ—শ্রমণদের—জগতের নন।

আমার আপনার লোক—সে আমার জীবন যাপন ক'রে। তার ওসব ঝক্‌ঝকে কাপড় আবশ্যক করে না।

শ্রী শঙ্কর। মুণ্ডিত মস্তক—লাল গেরুয়া আপাদমস্তক, তার ওপর প্রতিভা সর্বাঙ্গ দিয়ে ফেটে ফোয়ারার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; বিদ্যা—সূর্যকিরণের মত, জগৎকে আলোয় আলো ক'রে দিয়েছে।

সশিষ্য বসে আছেন শ্রী শঙ্কর—পদ্মপাদ, মণ্ডনমিশ্র, ত্রোটক ইত্যাদি—কে বড়, কে ছোট, এ বিচার চলে না।

মনুষ্যজাতি দেখল এই অপূর্ব দৃশ্য—সশিষ্য শ্রীশঙ্কর। দূর থেকে ভক্তিভরে প্রণাম করল, আর দূরে সরে গেল।

কোথায় পাবে তারা শ্রীশঙ্কর ও তাঁর শিষ্যবর্গের বিদ্যা, প্রতিভা, তপস্যা ইত্যাদি।

মনুষ্যজাতি দূরে সরে গেল—এঁরা আমাদের নয়, আমাদের নয়...।

রামানুজ। শ্রী শঙ্করের নূতন সংস্করণ, উপরন্তু কঠোর আচার।

মনুষ্যজাতির সেই প্রাণভরা ভক্তি—আর দূরে সরে যাওয়া। মানুষ তার সাধারণ জীবনযাত্রার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না সেখানে। সে হতাশ হয়ে ফিরে গেল....।

স্থান—গম্ভীরা—শ্রীক্ষেত্র।

বসে আছেন – 'আমার সোনার গৌরাঙ হে।' সেই বরবপু—কিন্তু কটিদেশে কৌপীন —তাও আবার শ্মশানের ছেঁড়া ন্যাকড়া মাত্র!

যে বিবিদিষা শ্রীশঙ্কর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই বিবিদিষা তাঁর নিজের জীবনে অত মূর্ত হয় নি, যত মূর্ত হয়ে উঠেছিল মহাপ্রভুর জীবনে।

জগৎ দূর হ'তে দেখল, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হতাশ হলো আর চলে গেল; শুধু তার মনে হলো—এ আমার নয়, এ আমার নয়।

ঠাকুরের গায়ে 'র‍্যাপার', পায়ে চটি জুতা। অথচ ঠাকুর পরমহংস!

দৈবী মাস্টার মশাই জগতকে আশ্বস্ত করলেন। শীতে আমিও গায়ে গরম কাপড় দিই, পায়ে চটি পরি। ঠাকুরের জীবন – এ তো আমারই জীবন! তবে ঠাকুর মাকে পেয়েছেন – আমি কি ক'রে পাই!

তাই ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী – "চাঁদা মামা সকলকার মামা।" ঈশ্বর সকলকার। ঠাকুর ভগবানকে পেয়েছেন – আমিও পাব।

১৬। **"কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব?"**

"পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিবে,
তা বিনু সকলি পর।"

ভগবান ভক্ত না হ'লে থাকতে পারেন না। তিনি ভক্ত সৃষ্টি ক'রে নেন।

ঠাকুর কেশববাবুকে কৃপা করেছিলেন – "কেশব কালী মেনেছে।"

১৭। **"হ্যাঁগা, কুক্ সাহেব নাকি একজন এসেছে? সে নাকি লেকচার দিচ্ছে?"**

লেকচার দিয়ে ধর্ম হয় না– "তোমার কথা শুনবে কে?"

"আত্মা যদি কৃপা ক'রে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি" – অর্থাৎ ধর্ম।

১৮। **"প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুর বাড়িতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলে-পিলে। আমি বকলুম, দেখ দেখি ছেলে-পিলে হয়েছে; তাদের কি আবার ও পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগ ছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুর বাড়ি ফেলে রেখেছে! আমরা অনেক বকলুম, আর কর্ম-কাজ খুঁজে নিতে বললুম।"**

"গাছের পাতাটি নড়ে সেও ভগবানের ইচ্ছায়।" প্রতাপের ভাই সংসার করেছেন – রামের ইচ্ছা – দৈব।

প্রতাপের ভাই ঠাকুরের কাছে আসেন – অর্থাৎ ধর্মও চান।

সৎপথে খেটে খেয়ে ধর্ম করতে ঠাকুর বলছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর পূজারীর কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

তারপর ঠাকুরের আমূল পরিবর্তন। কে বা পূজারী, কারই বা পূজা, ঠাকুর নিজেই ঠাকুর। দক্ষিণেশ্বরের কর্তৃপক্ষ তাঁকে পেন্সন দিয়েছিলেন। ঠাকুর নিজে বলতেন, "আমি ত' পেন্সিল (পেন্সন) খাই।"

১৯। **"যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে।"**

মহামায়া মায়াপাশে আবদ্ধ করেছে।

"যে মাগসুখ ত্যাগ করেছে, সে সব সুখ ত্যাগ করেছে।"

'বিয়ে হওয়া' – যোগাযোগের অভাব, দৈবকৃপা অল্প। দৈব যদি বিশেষ কৃপা করতো, তাহলে আদপে বিবাহ হত না।

২০। **"যাঃ, ছেলে হয়ে গেছে।"**

সরষের পুঁটলি ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেলে – আর সব সরষে কুড়ানো যায় না।

পুত্রে দেহের দ্বিতীয় জন্ম। "তুমিই একরূপে ছেলে হয়েছ।" দেহের ভাগে – দেহেতে আত্মিক শক্তি স্ফুরণের অভাব।

উচ্চাঙ্গের ব্যষ্টির সাধন হয় না।

"ষোল আনা দিলে, তবে ষোল আনা।"

"আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি।"

দেহ বিক্রি ক'রে তবে শ্রীদুর্গা নাম কিনতে পারা যায়।

দেহ থেকে আত্মা নিঃসৃত হয়।

ষোল আনা দেহ, তবে ষোল আনা আত্মা– অখন্ড সচ্চিদানন্দ।

তা নইলে এক আনা, দু'আনা, চার আনা ইত্যাদি।

"আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না।"

এই দেহ থেকে এক আনা, দু'আনা, চার আনা রকম আত্মা নিঃসৃত হলে, সাধকের পূর্ণ জ্ঞান হয় না। জীবন-মৃত্যু রহস্য ভেদ হয় না।

২১। **"বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি ?"**

"বিদ্যাশক্তি" – বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরানুরাগ ইত্যাদি।

অবিদ্যাশক্তি – বিষয়বাসনা, দেহসুখ, ধর্মবিরহিত, অন্যায়ে আনন্দ, ঈশ্বরে ভক্তি কম ইত্যাদি।

আত্মা দেহেতে শক্তিরূপে বিরাজ করছেন।

কোনখানে তিনি বিদ্যাশক্তিরূপে আবার কোনখানে অবিদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ পান।

কেন এ রকম ফারাক ?

সংস্কার বশতঃ।

সংস্কার কি ?

প্রহ্লাদের 'ক' দেখে কৃষ্ণ মনে পড়ত।

এই কৃষ্ণ মনে পড়া সংস্কার।

২২। **"আর তুমি জ্ঞানী ?"**

ষোল আনা দেহ থেকে ষোল আনা আত্মা নিঃসৃত হবে, সচ্চিদানন্দগুরু সেই আত্মাকে দেখিয়ে দেবেন, ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটবে, কাল ও স্থান নেই– এই উপলব্ধি

হবে, তখন আত্মার মধ্যেই বোধ হবে – আমি দেহ নই, আমি আত্মা।

এই অবস্থাকে বলে ‘জ্ঞান হওয়া’ আর যাঁর এই জ্ঞান হয়েছে তাঁকে বলে ‘জ্ঞানী’।

ষোল আনা দেহ – চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে – পূর্ণ যৌবন।

“ছেলে যদি সেরকম জোর করে – তা হলে মা বাপ পরামর্শ করে দু-তিন বছর আগে হিস্যে ফেলে দেয়।”

‘ছেলে’ – ভক্ত।

‘মা’ – আদ্যাশক্তি – দেহ।

‘বাপ’ – নির্গুণ ব্রহ্ম।

‘পরামর্শ করে’–দেহেতে প্রকাশ পেয়ে।

হিস্যে – ভাগ – হিসাব। ‘দেখ্ তুইও যা আমিও তা।’

ঠাকুরের হিস্যে মা বাপ ২২/২৩ বছরে দিয়ে দিয়েছিল।

ঠাকুরের আত্মা সংকলিত ও আত্মাসাক্ষাৎকার দু-তিন বছর আগে হয়েছিল। ২২/২৩ ও দু-তিন বছর যোগ করলে ২৪/২৫ বছর হয়।

ষোল আনা আত্মা – এক আনা, দু আনা, চার আনা নয় –অখন্ড সচ্চিদানন্দ।

সচ্চিদানন্দগুরু।

“ব্রহ্মের রূপ কল্পনা কে করে?”

“ব্রহ্ম নিজেই করে।”

নির্গুণ ব্রহ্ম প্রথমে কোন এক অজানা রূপ ধরে ভক্তের কাছে এসে তাঁকে কৃপা করে অর্থাৎ তাঁকে বরণ করে।

“অজানা রূপ’ – যে মূর্তি আগে কখনও দেখেনি।

১২/১৩ বছর বয়সে সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা হওয়া চাই – আত্মার বরণ করা চাই –আত্মার কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হওয়া চাই।

ঠাকুরের ১০/১১ বছরে হয়েছিল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের দারুমূর্তি বার বছর অন্তর পরিবর্তন হয় – নূতন করে করা হয়।

১২/১৩ বছরে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ – ২৪/২৫ বছরে আত্মা সাক্ষাৎকার।

তারপর ১২/১৩ বছর ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ কাটে। এই ফুট্ কেটে কাল ও স্থানের নাশ হয়।

কালের নাশ– ত্রিকাল – অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

প্রথমতঃ কাল কী হবে আজ দেখতে পেল। বারবার এই রকম ঘটতে লাগল-

এক বছর ধরে। দ্রষ্টা ক্রমাগত এই ভবিষ্যৎ দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আপনা হতে তাঁর মনে হয় – কাল ঘটবে! আমি আগের রাত্রে দেখেছি – তাহলে ত' ঘটেছিল, ঘটবে আর কোথায়! হয়েইছিল, হবে আর কোথায়! ভবিষ্যৎ নয়–অতীত। ভবিষ্যৎ আর অতীত এক হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ আর অতীতকে নিয়ে বর্তমান ফুটছে। ত্রিকাল এক হয়ে যাচ্ছে। এই কালের নাশ। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থাৎ স্থিত সমাধিতে কিছুই থাকে না।

স্থানের নাশ – গোটা কলকাতা শহরটা তুমি তোমার মাথার ভিতরে দেখলে, যেন ভেলকির মতন হয়ে গেল। কল্পনার নয় – সত্যিকারের কলকাতা। তারপর সে অনুভূতি ভেঙে গেল। মনে হলো – এত বড় কলকাতা আমার মাথার ভিতর - ধরলো কি করে? এই আমার অন্তরের কলকাতা আর বাইরের কলকাতা কিন্তু এক। কোন সন্দেহ থাকে না। তখন ঠিক বুঝতে পারা যায় – বাইরে যা কলকাতা দেখছি তা ভুল দেখছি। এ এত বড় নয়, – আবার এত বড়ও বটে, আবার ছোটও বটে। মাথার ভিতর ধরলো কি করে? এই সব ফুটের অনুভূতির শেষ হয় – নিঃসন্দেহ হয় – বিশ্বরূপ দর্শনে। আত্মার মধ্যে জগৎ।

ঠাকুরের "ম আর রা।"

আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ। বিজ্ঞানীর প্রথম স্তর। এই স্তরের পূর্ণ জ্ঞান – "আমি আত্মা!"

"তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে" - "আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা" – সে এখন অনেক দূরে।

২৩। **"তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে?"**

"আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ" – "ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ।"

"আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

'সাকার' – কারণ শরীর – ইষ্ট সাক্ষাৎকার।

উঁচু সাকার ঘর – বহুবিধ দেবদেবী দর্শন।

'নিরাকার' – আত্মাসাক্ষাৎকার থেকে নিরাকার আরম্ভ, আর নির্গুণ ব্রহ্ম সেও নিরাকার। তত্ত্বজ্ঞানে তিনি যদি প্রকাশ পান তবে বলা যায় – 'আমি জানি না।'

২৪। **"তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।"**

ভগবান যদি কৃপা করে সমস্ত বুঝিয়ে দেন তবে জানতে পারা যায়, তিনি কি!

স্বয়ম্ভু আত্মা যদি কৃপা করে দেহের মধ্যে প্রকাশ পান, আর প্রত্যেক স্তরের অনুভূতিতে প্রকাশ পান, তবে ঠিক দেখতে পাওয়া যায়, বুঝতে পারা যায়, বলতে পারা যায়। কেউ জানে না, ভগবান কি; তিনি কৃপা করে দেখিয়ে দেবেন, জানিয়ে দেবেন, –

তবে।

২৫। **“মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।”**

‘চিন্ময়ী প্রতিমা’ – ভক্ত দেখে প্রতিমা চিন্ময়ী। জ্বল্ জ্বল্ করছে প্রতিমার চারিধারে জ্যোতি। ভক্তের চোখে জ্যোতির প্রতিমা ফুটে ওঠে। এই জ্যোতি ভক্তের চক্ষু দিয়ে বের হয়ে, প্রতিমায় লিপ্ত হয়ে আবৃত করে। বাইরে থেকে এ জ্যোতি আসে না। অন্তর্যামী আত্মা অন্তরে আছেন – তাই চক্ষু থেকে সেই আত্মিক জ্যোতি বেরিয়ে প্রতিমাকে চিন্ময়ী করেছে। এই প্রথম অবস্থা।

দ্বিতীয় অবস্থা– এই চিন্ময়ী প্রতিমা ভক্ত নিজের মাথার ভিতর দেখছে – বাইরে তার প্রতিচ্ছবি। এখনও ভক্ত বুঝতে পারে না সে ঠিক বাইরে দেখছে, কি ভিতরে দেখছে। ভক্ত জানে – সে বাইরে দেখছে।

ঠাকুর দেখলেন – তাঁর দেহ থেকে কালপুরুষ বেরোল। তিনি মাকে বললেন, “মা ওকে কেটে ফেল”। মা খাঁড়া দিয়ে কালপুরুষকে কেটে ফেললেন। কই, রক্ত পড়ল না তো! সমস্তই ঠাকুর নিজের ভিতরে দেখছেন। বাইরে কিছু নেই। মায়া– মিথ্যা– নেই। যদি কেউ বলেন – বাইরে যদি নেই, তবে ভিতরেও নেই।

নিশ্চয়ই – কিছু নেই।

অজ!

তবে বাইরে আর ভিতরে ফারাক – বাহির স্থূল, আর ভিতর সূক্ষ্ম।

তৃতীয় অবস্থা – এই অবস্থা আত্মাসাক্ষাৎকারের বহু পরে – যখন ব্রহ্মজ্ঞানের বহু ফুট্ কেটে দেহ হালকা হয়ে পড়ে – তখন দেখা যায়, ইষ্ট দেহ থেকে চিন্ময়রূপে বেরোলেন, আবার দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আত্মা দেখিয়ে দিলেন, ‘আমি দেহে; আর চিন্ময়রূপ যা দেখ, তা দেহ থেকে বেরোয়।’ এই কুটিচক অবস্থার সূত্রপাত।

২৬। **“কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া।”**

যাঁরা লেকচার দেন, তাঁরা ভগবানের বিষয় কিছুই জানেন না। অবশ্য চাপরাস বা আদেশ পেয়ে ভগবানের কথা বলা – সে আলাদা। তখন ভগবান ভক্তের ভিতর থেকে কথা বলেন, অপরে শোনে – ভগবানের মহিমা প্রচার – কীর্তন।

তাই ঠাকুর বলেছেন, “মা, আমি বলছি, না তুমি বলছ!”

“বুঝিয়ে দেওয়া” – অন্তর্যামী ভগবান যদি অন্তর থেকে কাউকে বুঝিয়ে দেন, তবে সে বোঝে। “হরি, তুমি জানাও যারে, সেই জানে।”

ঠাকুর বলছেন, “তোমার কথা লিবে কে?”

তোমার কথা কেউ শুনবে না।

তুমি গুরু নও !

"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না।"

সেই সচ্চিদানন্দই গুরু।

সেই সচ্চিদানন্দগুরু যখন কৃপা করে বুঝিয়ে দেন তখন বোঝে।

২৭। **"যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না, তাঁকেই ডাকা হচ্ছে ? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন ?"**

জনার্দন ভাব গ্রহণ করেন, আর তাতেই তাঁর আনন্দ।

'মাটির প্রতিমা' — এই দেহ। এই দেহের পূজা করলে তবে আদ্যাশক্তি প্রসন্না হন। তিনি কৃপা করে আত্মারূপে পরিণত হন।

হিমালয়ের গৃহে যতক্ষণ না পার্বতী জন্মগ্রহণ করছে ততক্ষণ এ দেহ হিমালয় — পাষাণ — মাটি।

২৮। **"নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এসব করেছেন - অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।"**

এক আনা, দু'আনা, চার আনার কথা। — আত্মা দেহীর দেহ থেকে কৃপা করে যতটুকু মুক্ত হয়ে প্রকাশ পান।

কোন দেহে তন্ত্রের সাধন।

কোন দেহে বেদের সাধন।

আবার কোথাও বা বেদান্তের — আত্মার সাধন। আবার কোথাও বা তত্ত্বজ্ঞান।

আবার এরপর অবতারলীলা।

এরপর নিত্যলীলা।

নিত্যলীলা সাকার আবার নিরাকার।

নিত্যলীলা — অখন্ড চৈতন্যে লীন হওয়া — নিরাকার।

সাকারলীলা — সাকার মূর্তিতে।

এই মূর্তি বহু, আবার এক।

যখন এক মূর্তি — তখন স্ফটিক সাকার।

২৯। **"ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়।"**

মহাপ্রভু সর্বক্ষণ 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ', জপ করতেন। অবশ্য তিনি করতেন, "আপনি আচরি ধর্ম, শিখায় অপরে।"

এই সর্বক্ষণ নাম জপ করায়, জিভে এবং তালুতে পরস্পরে যুক্ত হয়। এতে

যোগের সূত্রপাত হয়।

দেহেতে ভগবান যোগনিদ্রায় নিদ্রিত। তাঁর যোগনিদ্রা ভাঙতে হবে, – আত্মাকে দেহ থেকে নিঃসৃত করতে হবে।

কিসে হয় ? যোগের দ্বারা।

এই যোগের আরম্ভ কোথায় ?

দেহের দুটি স্থান।

হাতে হাততালি দিয়ে হরিনাম করা। ঠাকুর তাই হাততালি দিয়ে সকাল সন্ধ্যায় হরিনাম করতে বলতেন।

আর জপ করা – জিভ আর তালুর সংস্পর্শ – যোগ। সর্বক্ষণ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা।

৩০। **"ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু।"**

সাধু কে ?

ভগবানের নামে যাঁর মন প্রাণ তাঁতে লীন হয় – অর্থাৎ সমাধিস্থ হন – তিনি সাধু। অবশ্য ধ্যানেও সমাধি হয় – সে ধ্যানসিদ্ধের সমাধি; তিনিও সাধু।

মুহুর্মুহু সমাধি হওয়া বা 'করামলকবৎ' – এই হলো সহজিয়া। এসব হ'ল খুব উচ্চাঙ্গের লক্ষণ।

ভগবান দর্শন যাঁর হয়েছে – তিনিও সাধু।

ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ অবতার আর নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটির যেরকম প্রভেদ, সেই রকম।

ভক্ত কে ?

নিজের দেহের ভিতর 'মানুষ-রতন'কে যিনি দেখেছেন, আর বয়ে নিয়ে বেড়ান – তিনি ভক্ত। দেহের ভিতর ভগবান ভক্তের রূপ ধারণ করে হরিনাম করেন।

ভগবান, ভক্ত, ভাগবত– তিনই এক।

৩১। **"বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে।"**

'বড় মানুষের বাড়ি' – এ জগৎ – ভগবানের ঐশ্বর্য।

'দাসী' – দেহ।

'নিজের বাড়ি' – ভগবানের কাছে - সালোক্য।

৩২। **"ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে, তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"**

'ভক্তিরূপ তেল' – তত্ত্বজ্ঞান – চৈতন্য – তুমি, তুমি – তুঁহু, তুঁহু। 'সংসারের কাজ' – বেঁচে থাকা – ভগবানের নাম করা আর তাঁর লীলা দেখা –

দেহের মধ্যে — অবশ্য তিনি যদি কৃপা করে দেখান।

ঠাকুরের নিকষার কাহিনী —"আমি প্রাণভয়ে পালাচ্ছি না। বেঁচে ছিলুম বলে তোমার এই লীলা দেখলুম, আরও তোমার কত লীলা দেখতে পাব। যদি আরও বাঁচি তাহলে আরও লীলা দেখব।"

৩৩। **"মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে, সব কাজ ফেলে সূর্যোদয়ের পূর্বে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।"**

'মাখন' — আত্মা।

'নির্জনে দই পাতা' —একলা হওয়া - অর্থাৎ জগৎ থেকে মন কুড়িয়ে দেহেতে নিয়ে আসা। এমন কিছু না দেখা, না স্পর্শ করা, না শোনা — যাতে রক্তচাঞ্চল্য ঘটে। তাহলে দই বসে না।

'সূর্যোদয়ের পূর্বে' — ২৪/২৫ বছরের মধ্যে। ষোল আনা দেহ দান, — ষোল আনা পাওয়া। ষোল আনার কাপড় নিতে গেলে, ষোল আনা দাম দিতে হবে।

'মন্থন দন্ড' - কুন্ডলিনী। তিনি সহস্রারে নৃত্য করে আত্মার জন্য স্থান তৈরী করেন।*

৩৪। **"সেই মাখন সংসার জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না; ভেসে থাকবে।"**

তত্ত্বজ্ঞান — আমি- না — তুমি।

৩৫। **"ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?"**

ঈশ্বর দর্শনের অনেক ক্রম। ইষ্ট সাক্ষাৎকার থেকে আরম্ভ করে নিত্যলীলা যোগ পর্যন্ত। ঠাকুর বলতেন, "তাঁর ইতি করা যায় না।"

ইষ্ট সাক্ষাৎকার হলো — ঈশ্বর দর্শন হলো।

আত্মাসাক্ষাৎকার হলো — ঈশ্বর দর্শন হলো।

আত্মার মধ্যে জগৎ — বিশ্বরূপ দর্শন হলো — ঈশ্বর দর্শন হলো।

সেই বিরাট জগৎ বীজে পরিণত হলো — ঈশ্বর দর্শন হলো।

বীজ স্বপ্নে পরিণত হলো — সেও ঈশ্বর দর্শন।

তারপর কী আছে কিছু জানবার জো নেই, বলবার জো নেই, দেখবার জো নেই, বুদ্ধের 'শূন্যম'। এখন আর দর্শন নয়। এর পরে যখন জ্ঞান এল তখন — 'আমি না, তুমি, — শুধু তুমি।'

"বাবু, আমার আমি খুঁজতে যাই, খুঁজে পাই না।"

এই 'তুমি' চৈতন্যরূপে ফুটে উঠল — "অন্ধকারে লাল চীনে দেশলায়ের

* "কমলে কমলে নাচ মা, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী!"

আলোর মতন।”

আবার দর্শন। এর পর অবতরণ দর্শন – চৈতন্যের অবতরণ।

তারপর মানুষ-রতন দর্শন– এও ঈশ্বর দর্শন।

এরপর নিত্যলীলা যোগ – এতেও দর্শন আছে – এও ঈশ্বর দর্শন, ইতি নেই।

৩৬। “ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হলো। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।”

‘অরুণ উদয়’ – ষষ্ঠভূমিতে জ্যোতিদর্শন।

‘সূর্য দেখা’ – রেশমের পর্দার আড়ালে সূর্যের মত উজ্জ্বল জ্যোতির্পিন্ড।

‘ঈশ্বর দর্শন’ – আত্মাসাক্ষাৎকার।

৩৭। “তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন – বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টান।”

‘তিন টান – স্থূল, সূক্ষ্ম , কারণ।

‘বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান’ – দেহ। দেহীর দেহজ্ঞান।

‘মায়ের সন্তানের উপর টান, – সূক্ষ্ম শরীর। দেহ – মা, আর ছেলে– সূক্ষ্ম শরীর।

‘সতী’ – কারণশরীর।

‘পতি’ – আত্মা – সপ্তমভূমি।

সতী পতিতে পরিণত হয়। আরশোলার কাঁচপোকা হয়ে যাওয়া, গুটি পোকার প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাওয়া, যদি গুটি কেটে বেরোতে পারে।

৩৮। “বিড়ালছানা কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে।”

শুধু ভগবানকে ডাকা।

মহাপ্রভুর – ‘কৃষ্ণ, কৃষ্ণ’।

ঠাকুরের – ‘মা, মা’।

যীশুর – ‘ফাদার, ফাদার’।

মহম্মদের – ‘আল্লা, আল্লা।’

– জপ করা। তার অনুভূতি যা হবার আপনা হতে হয়। বেদের বিদ্বৎ। আপনা হতে স্বয়ম্ভু আত্মার প্রকাশ। যার হয় সে সাক্ষীস্বরূপ।

৫ই মার্চ, রবিবার, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রী মন্দির – দক্ষিণেশ্বর

৩৯। **"হাতী নারায়ণ – মাহুত নারায়ণ।"**
'হাতী নারায়ণ' – মন – মন মদমত্ত করী।
'মাহুত' – আত্মা–বিবেকরূপে দেহেতে প্রকাশ।
মন ভোগের দিকে নিয়ে যেতে চাইবে, তাই বিবেক যা বলে তাই শুনতে হয়।
"বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।"

৪০। **"আপো নারায়ণঃ – জল নারায়ণ.........।"**
প্রত্যেক মানুষেই নারায়ণ আছেন। তিনি কোন মানুষে বিদ্যাশক্তিরূপে, আবার কোন মানুষে অবিদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ। সৎলোকের সঙ্গে মেলামেশা – অসৎসঙ্গ ত্যাগ।

৪১। **"রাখাল, সাপ – আর ব্রহ্মচারী.......।"**
'রাখাল' – রিপুগণ; যাদের প্ররোচনায় মানুষ ভোগে আসক্ত হয়।
'গরু' – দেহ।

"মা আমায় ঘোরাবি কত
চোখ ঢাকা বলদের মত।"

'সাপ' – কুন্ডলিনী শক্তি
'ব্রহ্মচারী' – সচ্চিদানন্দগুরু।
কুন্ডলিনী শক্তির দুটি অবস্থা। অন্তর্মুখী আর বহির্মুখী। প্রাণশক্তিরূপে তিনি বহির্মুখী। ভোগ চলেছে। রাখালেরা দূরে আছে। তাদের কাজ আপনা হতে চলেছে।
'ব্রহ্মচারী এল' – সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করলেন। সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় কুণ্ডলিনী অন্তর্মুখী হলেন।
'তখন রাখালেরা' – ইন্দ্রিয়গণ – আক্রমণ করলো। এই অবস্থায় ফোঁস করে তেড়ে যাওয়া – সাবধান হওয়া।
সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করেছেন। "বাপে ছেলেকে ধরলে, সে ছেলে আর পড়ে না।"*

৪২। **"জীব চার প্রকার – বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।"**
'বদ্ধজীব' – সাধারণ মানুষ –কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ। "উট কাঁটা ঘাস খায়,

---

* 'সে জানে যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হলে ওর দেহত্যাগ হবে না' - সচ্চিদানন্দগুরু যে দেহে উদয় হন সেই দেহের পরমায়ু বেড়ে যায়।

দরদর করে রক্ত পড়ে, মনে করে বেশ আছি।”

‘মুমুক্ষুজীব’ – সাধক। সাধনার আরম্ভ – সূক্ষ্মভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ আর দক্ষিণ দিকের তলপেটে প্রাণশক্তির দর্শন।

চতুর্থভূমিতে কুণ্ডলিনী জ্যোতি রূপে প্রকাশ হলেন– বাইরে আবার ভিতরে, – এই প্রকৃত সাধন আরম্ভ। সাধক এই জ্যোতি দেখেন আর অবাক্ হয়ে বলেন, ‘একি! একি!’।

‘মুক্তজীব’ – দু’রকম। আত্মা কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হয়ে সহস্রারে আত্মারূপে দেখা দেন – এই প্রথম স্তরের অনুভূতি। আবার, আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ছায়ামূর্তিতে সামনে দাঁড়িয়ে নাচতে থাকেন আর বলেন, ‘আমি মুক্ত হয়েছি।’ দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি – ঠাকুরের কথা, “তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বলবে তবে জানবি ঠিক হয়েছে।”

‘নিত্যজীব’ – সচ্চিদানন্দ আত্মা যে রূপ ধারণ করে দেহের মধ্যে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে দেহীকে বরণ করেন, কৃপা করেন, তিনি হলেন নিত্যজীব। এই নিত্যজীব শাশ্বত, আর চিরকাল আত্মা এঁদের রূপ ধরে অপরের দেহের মধ্যে লীলা করেন।

শুক ভাগবত শোনাচ্ছেন পরীক্ষিৎকে।

নারদ সকলকে হরি গুণগান শুনিয়ে বেড়াচ্ছেন।

সাড়ে তিন হাজার বছরের মসেস্‌কে এখনও লোকে দেখে। আড়াই হাজার বছরের বুদ্ধকেও দেখে; দু’হাজার বছরের যীশুকেও দেখা যায়। বারশ’ বছরের শঙ্করকেও দেখে; পাঁচশ’ বছরের মহাপ্রভুকেও দেখে; আর ঠাকুরকে তো দেখছেই।

কী ক’রে দেখে?

আত্মা দেহের মধ্যে। আত্মার মধ্যে জগৎ।

জগৎ – ত্রিকাল– অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।

আত্মা কৃপা ক’রে অতীত থেকে যে মূর্তি ধারণ ক’রে দেহীকে কৃপা করেন, দেহী সেই শাশ্বত নিত্যজীবের মূর্তি দেখতে পান। আত্মা কৃপা ক’রে রুহিদাসের মূর্তিতে মীরাকে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে বরণ করেছিলেন। মীরা তখন বালিকা। মীরা জন্মাবার বহুপূর্বে রুহিদাস দেহরক্ষা করেছিলেন।*

৪৩। “বিশ্বাস হ’য়ে গেলেই হ’ল।”

‘বিশ্বাস’– ভগবানের কৃপা– দেহ থেকে আত্মার মুক্তি ও দর্শন।

---

*এই দর্শন ব্রহ্মলীন অবস্থা থেকে হয়—মানুষ ব্রহ্ম।

দর্শন দু'রকম, আংশিক ও পূর্ণ।

আংশিক—ইষ্টমূর্তি অথবা জ্যোতিদর্শন, কিংবা ইষ্ট ও জ্যোতি দুই দর্শন।

পূর্ণ দর্শন— সচ্চিদানন্দগুরু যখন আত্মাকে দেখিয়ে দেন। এই হ'ল পূর্ণ দর্শন।

ঠাকুর কালী মহারাজকে (স্বামী অভেদানন্দকে)* বলছেন, ''না দেখলে ভালবাসবি কাকে?'' **

দর্শন না হ'লে বিশ্বাস হয় না।

৪৪। **''বিশ্বাসের কত জোর তাতো শুনেছ? পুরানে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁকে লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে প'ড়ল। তার সেতুর দরকার নাই।''**

'লঙ্কা'—সহস্রার।

'সেতু বাঁধা' — সাধন করা।

রামচন্দ্রের ভিতর শ্রীভগবান অবতীর্ণ হবেন — এ হয়েই আছে (Predestined)। তিনকাল নেই --এক কাল হয়ে যায় ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ যখন কাটে; তবুও শ্রীরামচন্দ্রকে সাধন করতে হয়েছিল।

ঠাকুর—''আমায় কিন্তু কঠোর সাধন করতে হয়েছিল।''

শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখেছিলেন।

''অবতারকে দেখাও যা ভগবানকে দেখাও তা।''

হনুমানের পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছিল—ভগবানের কৃপায়। আগে সাক্ষাৎ, পরে বিশ্বাস। তাঁর নাম ও নামী অভেদ জ্ঞান হয়েছিল। এই নাম-নামী অভেদ জ্ঞান হয় তখন — যখন ''একবার ওঁ বল্লে সমাধি হয়।''

একবার নামের সঙ্গেই নামীর প্রকাশ আর তাঁতে লয় হওয়া। তাই হনুমানকে কঠোর সাধন করতে হয়নি।

কৃপার কথা—''আমরা এখন ঘুমিয়ে থাকি, সকালে উঠে দেখব বাবু হয়ে গেছি।''

'বাবু'—ঈশ্বর।

সমাধিতে আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হয়েছে—'আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।'

৪৫। **''বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে ঐ পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছ্‌ল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললে, 'তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস ক'রে জলের উপর দিয়ে চলে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে।' লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর**

---

* পরে ছোট নরেনকেও একথা বলেছিলেন। ** ''অস্তি—ভাতি—প্রিয়।''

দিয়ে চলে যাচ্ছিল; এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হলো যে কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে। খুলে দেখে যে কেবল রাম নাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, 'একি! শুধু রামনাম একটি লেখা র'য়েছে!' যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।"

'বিভীষণ'– ভক্ত। তিনি আর একজনকে কৃপা করলেন।

'অবিশ্বাস করা'–'অহং' জ্ঞান হওয়া। আমি কর্তা।

'লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল'– লোকটির বেশ সাধন হচ্ছিল – ভবসমুদ্র পার হচ্ছিল। 'হেঁটে' – বিবিদিষা–কষ্ট ক'রে।

আত্মার কৃপা হ'লে এক লাফে পার হয়ে যেত–ভবসমুদ্র।

এক লাফে (কপিবৎ) মহাবায়ু সহস্রারে উঠে সমাধিস্থ হতো।

লোকটি দেখেছিল বিভীষণকে, – রামচন্দ্রকে, অবতারকে নয়। তার পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হয়নি। তাই বাসনা জেগে উঠল।

'কাপড়ের খোঁটে'– দেহে।

'শুধু রামনাম লেখা'–দুটি অক্ষর মাত্র। নাম-নামী অভেদ, এ অনুভূতি ত' হয়নি।

'অমনি ডুবে গেল' – আবার তার পূর্ণ জীবত্ব বা অহংকার ফিরে এল।

মানুষ কৃপা করলে হয় না – "মানুষের কি সাধ্য অপরকে মুক্তি দেয়? ঈশ্বর যদি কৃপা ক'রে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।"

এমন কি 'শাক্তী' হলেও টেকে না।

ঠাকুর শাক্তীতে পণ্ডিত শ্যামাপদ বিদ্যাবাগীশের বুকে পা দিয়েছিলেন। পণ্ডিত বলরামবাবুকে বলেছিলেন, "নরেন্দ্রের বুকে হাত দিতে তার যেমন হয়েছিল, আমার তো তেমন কিছু হলো না।"

৪৬। **"যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে– গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে,–তবুও শ্রীভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে। সে যদি বলে, 'আমি আর এমন কাজ করবো না', তার কিছুতেই ভয় হয় না।"**

"ঈশ্বর অপরাধ একবার ক্ষমা করেন, কিন্তু বারবার ক্ষমা করেন না।"

অপরাধ করা – নিজেকে নিজে আঘাত করা। তাতে অন্তর্যামী নারায়ণ –আত্মা, আরও অন্তরে চলে যান। অর্থাৎ আত্মিক স্ফুরণ হয় না। আধার ছোট হয়ে যায়। দেহের উপর অভিশাপ হয়। দেহ শক্ত হয়ে যায়। এসব প্রবর্তক ও সাধক অবস্থার কথা।

৪৭। **"দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি; আবার চাঁদনিতে যখন**

খেলে, তখন আর এক মূর্তি।"

'দুরন্ত ছেলে'—শক্তি বেশি—বড় আধার।

'বাবার কাছে'— ভগবানের কাছে।

'যখন বসে' — ধ্যান করে।

'যেমন জুজুটি' — স্থির, নিশ্চল, 'জড়বৎ'। 'নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ'। ধ্যান করতে বসলে স্বামীজী অখণ্ডে লয় হয়ে যেতেন।

'আবার চাঁদনিতে যখন খেলে' — চিকাগো (Chicago) ধর্ম মহাসভা।

'তখন আর এক মূর্তি'—বিশ্ববিজয়ী।

এসব জ্ঞানীর লক্ষণ; বিজ্ঞানীর নয়।

জ্ঞানী — "লোকশিক্ষায় সিংহবিক্রম।" বিজ্ঞানীর এলানো ভাব।

৪৮। **"বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে। কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিম পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে সে প'ড়ে যাচ্ছে, মাটিতে পড়লে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মা'র দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"**

'বেদ' এখানে নির্গুণ ব্রহ্ম।

'হোমাপাখী'— সচ্চিদানন্দগুরু। আত্মাপক্ষী—ধ্যানে প্রথম অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। মহাকাশের নীচে ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে, — এ সব পূর্ণাঙ্গ (ষোল আনা) সাধন। এও এক প্রকার সমাধি।

সচ্চিদানন্দগুরু নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে রূপ ধারণ ক'রে আসেন। তিনি 'অজানা' লোক—অর্থাৎ ভক্ত আগে কখনও তাঁকে দেখেনি; এটি ষোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু লাভের একটি লক্ষণ।

দেহের মধ্যে শুকের জন্ম হয়—ভক্তের জন্ম থেকে বার বছর চার মাস পরে।

'সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে'— দেহের সঙ্গে মিশিয়ে যাবে—দেহেতে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

'মার দিকে চোঁচা দৌড়'—ষষ্ঠভূমি — মহামায়া সাক্ষাৎকার। 'আরও উঁচুতে উঠে যায়' — আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। প্রথম সগুণ, পরে নির্গুণ। আত্মা আলাদা, সচ্চিদানন্দগুরু আলাদা—তা নয়।

সচ্চিদানন্দগুরু আত্মায় পরিবর্তিত হন।

"....তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত,
সাগর লহরী সমানা।"

৪৯। **"....শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন।"**

ষষ্ঠভূমিতে মন থাকলে ঈশ্বরীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা শুনলে কষ্ট হয়।

৫০। **"এর নাম সমাধি।"**

সমাধির তিনটি অবস্থা।

প্রথম – ভগবান দর্শন।

দ্বিতীয় – ভগবান হয়ে যাওয়া–'সো' হং'–সগুণ ব্রহ্ম।

তৃতীয় – নির্গুণে লয় হয়ে যাওয়া – স্থিত সমাধি।

বৌদ্ধরা ১৩৫ প্রকার সমাধির কথা বলেছে।

"গজ ফিতে দিয়ে ভগবানকে মেপে ফেলেছে।"

'সমাধি'–ঈশ্বর উপলব্ধি। যতবার সমাধি হয়, ততবারই নূতন। এসব জীবকটির হয় না। নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারের হয়–সহজিয়া– মুহুর্মুহু সমাধি।

ধ্যানের সমাধি– নিম্নস্তরে অন্য একরকম–তবে ঊর্ধাঙ্গে স্থিত সমাধিতে সব এক।

"ধ্যান ক'রে তাঁকে এক রকম জানতে পারা যায়, আবার তিনি যখন জানিয়ে দেন তখন অন্য রকম।"

ঠাকুর মোটামুটি চারপ্রকার সমাধির কথা বলেছেন– উন্মনা, চেতন, জড় ও স্থিত।

দত্তাত্রেয় ও জড়ভরতের 'জড় সমাধি'–ব্রহ্মজ্ঞানের পর আর এঁরা নামেন নি। এ হলো আগমের সমাধি।

শুক আর নারদের 'চেতন সমাধি'– এ হলো নিগমের সমাধি। ব্রহ্মজ্ঞানের পর চৈতন্য কন্ঠ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৫১। **"শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন।"**

'শিহরণ'– অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণের একটি লক্ষণ।

প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডলিনী সহস্রারে যান আর পলকের তরে সহস্রার স্পর্শ ক'রে আত্মিক জ্যোতিতে প্রকাশ পেতে চেষ্টা করেন, আবার নেমে আসেন, আবার সহস্রারে যান।

"কালী পদ্মবনে হংস সনে,
হংসী হয়ে করে রমণ।"

একেও এক প্রকার সমাধি বলে–কারণ মহাবায়ু 'কপিবৎ' সহস্রারে গমন

করেন।

৫২। **"দেহ রোমাঞ্চিত....।"**

দেহ-ব্যাপ্ত ভগবানের প্রকাশ– অর্থাৎ দেহেতে আন্তরিক পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনের প্রমাণ এই রোমাঞ্চ। খুব পাকা অবস্থায় দেহেতে এই রোমাঞ্চ বা পুলক প্রকাশ পেয়ে দেহীকে জানিয়ে দেয়– 'সত্য'। দেহী কোন কথা, অবশ্য হরিকথা, বললেন, তাঁর দেহে সঙ্গে সঙ্গে পুলক হলো। অন্তর্যামী আত্মা অন্তর থেকে সাড়া দিয়ে জানিয়ে দিলেন– "সত্য বলেছিস, তাই তোর দেহে সত্য প্রকাশ পাচ্ছে।"

৫৩। **"আনন্দাশ্রু....।"**

একটি সাত্ত্বিক লক্ষণ, – দেহ যোগযুক্ত হয়েছে, তার চিহ্ন।

৫৪। **"মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন।"**

না, একদম হাসিতেছেন না।

মহাবায়ু যখন সহস্রারে ওঠে, তখন বায়ুর চাপে গাল দুটি স্ফীত হয় – ঠোঁট ফাঁক হয়ে যায়। সাধারণ চোখে দেখলে হাসি ব'লে বোধ হয়।

সমাধি অবস্থায় একরকম অট্ট অট্ট হাসি হয়– সে কিন্তু নিম্নাঙ্গের সমাধি।

পরমহংস অবস্থা যখন দেহেতে প্রকাশ পায়, তখন ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হয়, আর মৃদু কম্পন লক্ষ হয়– দেখলে বোধ হবে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসি। প্রকৃতপক্ষে এ হাসি নয়– সমাধির লক্ষণ।

৫৫। **"এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়রূপ দর্শন ?"**

'চিন্ময়রূপ' দু'রকম।

(১) চিন্ময় মূর্তি। (২) জ্যোতি।

চিন্ময় মূর্তির চেয়ে জ্যোতি শ্রেষ্ঠ। চিন্ময় মূর্তি– ষষ্ঠভূমির অনুভূতি।

জ্যোতি– সপ্তমভূমির দ্বারদেশের অনুভূতি।

কখনও কখনও জ্যোতিদর্শন ক'রে সমাধি হয়, কিন্তু অধিকাংশ সময় বায়ুর গতি এত প্রবল– রূপ আর ফুটতে ফুরসত পায় না– বায়ু লীন হয়ে যায়।

৬ই মার্চ, সোমবার, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রী মন্দির – দক্ষিণেশ্বর

৫৬। **"ঐ রে, আবার এসেছে – বলিয়াই হাস্য!"**

ভক্ত ভগবানের কাছে এসেছেন– তাই ভগবানের আনন্দ। তিনি যে ভক্ত বড় ভালবাসেন– তাই আনন্দ। ভক্ত না হ'লে ভগবান থাকতে পারেন না। ভক্ত– সে যে আপন জন– অন্তরঙ্গ– সংস্কারবান্ পুরুষ– দৈবী লোক– ভগবানের নরলীলার সহায়!

তাই আনন্দ হাসিরূপে ফুটে উঠেছে।

'ভক্ত'– দেহ। 'ভগবান' – আত্মা।

নরদেহ ব্যতীত আত্মার পূর্ণ প্রকাশ আর কোথাও হয় না।

৫৭। **"আফিমের মৌতাত ধরেছিল– ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।"**

অভ্যাসযোগ। ধ্যানসিদ্ধ অবস্থায় বুঝতে পারা যায়।

নির্ধারিত ধ্যানের সময় আপনা হ'তে ধ্যান হয়।

'আফিমের মৌতাত' – ব্রহ্মানন্দ, আর এই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন।

এসব খুব পাকা অবস্থায় হয়।

৫৮। **"ইনি ঠিক কথাই বলিতেছেন। বাড়িতে যাই কিন্তু দিবানিশি ইহার দিকে মন পড়িয়া থাকে– কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনলে। মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আসতেই হবে।"**

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করেছে– লোহাকে আসতেই হবে।

যোগমায়া* ভেল্কি লাগিয়েছে– একে বলে আকর্ষণ। সংস্কারবান্ পুরুষ আকৃষ্ট হয়– হাবাতের হয় না।

এ এক প্রকার যোগ।

দু'টি আছে– চিন্তা আর ব্যাকুলতা।

চিন্তার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, আর ব্যাকুলতা দেহশুদ্ধির পরিচয়।

৫৯। **"দ্যাখ্, এর একটু উমের বেশি কিনা, তাই একটু গম্ভীর।"**

বেশি বয়স হলে পূর্ণাঙ্গ সাধন হয় না।

ঠাকুরের ১০/১১ বছর বয়সে জ্যোতিদর্শন – সমাধিস্থ হওয়া।

১২/১৩ বছরে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ– এই হলো ঠাকুরের যুগের বয়স।

'গম্ভীর' – আত্মা ষোল আনা প্রকাশ পাবে না।

৬০। **"এরা এত হাসিখুশী করছে।"**

এদের আনন্দ বেশি। এদের আত্মিক স্ফুরণ বেশি হবে।

৬১। **"হনুমানের কি ভাব!....... যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগলো।"**

'হনুমান' – ভক্ত। 'স্ফটিক স্তম্ভ' – ভাগবতী তনু।

'ব্রহ্মাস্ত্র' – আত্মা। আমি রূপ রাবণবধের ব্রহ্মাস্ত্র – আমি দেহ নই – আমি আত্মা। আত্মা ও দেহ পৃথক হয়ে গেলে – তবে এই জ্ঞান – রাবণ বধ।

'মন্দোদরী' – মায়া।

---

* যোগমায়া – যোগযুক্ত দেহ।

'ফল' – সিদ্ধাই; অষ্টসিদ্ধি, শতসিদ্ধি – এ সমস্ত আত্মাসাক্ষাৎকারের বিঘ্ন! একটিও সিদ্ধাই থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

৬২। **"......কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়।"**

হনুমানকে বাপে ধরেছে। যাকে বাপে ধরে সে পড়ে না – তার ভুল হয় না।

৬৩। **"ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়।"**

ফটোতে ঠাকুরের 'জড়' সমাধির ছবি দেখা যায়।

৬৪। **"প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে।"**

নবানুরাগ।

"পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি।
তাহার নাহিক শেষ।।"

৬৫। **"চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়......"**

ঈশ্বর মানুষের দেহে অবতীর্ণ হয়ে নরলীলা করছেন!

তিনিই একমাত্র মানুষ অর্থাৎ 'মান-হুঁশ'।

মান হুঁশ হওয়া – দেহ ফুঁড়ে পূর্ণাঙ্গ ভাবে যাদের কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়!

'গরু' – জীব।

৬৬। **"ভাল গরু, মন্দ গরু"**

সংস্কারবান্ পুরুষ আর হাবাতের দল।

৬৭। **"যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে।"**

যার কুণ্ডলিনী খুব তেজে জাগ্রত হবে – বড় আধার।

'ল্যাজে হাত দিলে'– গুরুকৃপা।

'সেই গরুকেই পছন্দ করে' – দেহের লক্ষণ ও ব্যবহারিক জীবনের চালচলন জানিয়ে দেয়– ইনি সংস্কারবান্।

৬৮। **"তুমি যেও, সেখানে গান হবে।"**

ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতা।

৬৯। **"আমাকে তোমার কি বোধ হয়?"**

এই হলো ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা!

ভগবান কৃপা করে ভক্তের আত্মিক শক্তির স্ফুরণ করে দিচ্ছেন–যাতে ভক্ত অবতারকে জানতে পারে।

৭০। **"অবতারকে দেখাও যা, ভগবানকে দেখাও তা।"**

এ এক প্রকার শাক্তী – বাক্যের দ্বারা সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করা – তবে সে

একমাত্র ঠাকুরের কথায় হয়।

৭১। **“আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে ?”**

‘আনা’ – অখন্ড সচ্চিদানন্দ এই দেহেতে। দেহ থেকে কৃপা করে তিনি আত্মারূপে যতটুকু ফুটে উঠবেন – তার পরিমাণ।

“কোনখানে এক আনা, কোনখানে দু’আনা কোনখানে বা চার আনা।”

মহাপ্রভুর তিনভাব – দাস্য, সখ্য ও মধুর।

নিত্যানন্দ প্রভুর দুই ভাব – দাস্য ও সখ্য।

অদ্বৈত প্রভুর এক ভাব – দাস্য।

এই তিন, দুই, এক, – দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হওয়ার পরিমাণ।

৭২। **“তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কোথাও দেখি নাই।”**

এ সব সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

অজ্ঞাতসারে মাস্টার মশাই বলছেন – ঈশ্বর যখন মানুষ হয়ে নরলীলা করেন, তখন তাঁর দেহে সত্ত্বগুণের পূর্ণ ঐশ্বর্যের প্রকাশ।

সত্যের সামনে সত্যের প্রকাশ।

ঠাকুর ‘সৎ’ ধারণ করে আছেন – তাঁর সামনে মাস্টার মশাইয়ের মুখ দিয়ে সেই ‘সৎ’-এর গুণ প্রকাশ পাচ্ছে।

৭৩। **“নিঃসঙ্গ.........”**

একা তিনিই আছেন – আর কিছু নেই – তাই নিঃসঙ্গ। এটি হলো ব্রহ্মজ্ঞানের পর তত্ত্বজ্ঞানে – ‘তুমি’। অবতারতত্ত্বেও তাই – একা নরদেহে অবতার আছেন – আর কিছু নেই। ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ বা তন্ত্রের প্রধান অনুভূতিতে এর আভাস পাওয়া যায়। সারা জগৎ নৃমুন্ডস্তূপে পূর্ণ – সেই নৃমুন্ডস্তূপের উপর ঠাকুর একা বসে আছেন – সমাধিস্থ। সারা জগৎ মৃত – তিনি একাই জাগ্রতচৈতন্য।

৭৪। **“আত্মারাম......”**

মহাপ্রভু আত্মারামের একষট্টি রকমের ব্যাখ্যা করেছেন।

পরিপূর্ণ আনন্দের প্রকাশ আত্মায় – বাইরে কোথাও নেই।

একটি অবস্থা বিশেষ।

৭৫। **“অনপেক্ষ.....”**

নিজেই পূর্ণ।

৭৬। **“তুমি আমার নাম করবে।”**

ভগবানের নামে সাত দেউড়ির দ্বার খুলে যায়।

৭৭। **"তা হলেই কেউ আমার কাছে নিয়ে যাবে।"**

সচ্চিদানন্দগুরু নিয়ে যাবে – শ্রীভগবানের কাছে।

২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

নৌকা বিহার

(শ্রীকেশব সেন, শ্রীবিজয় গোস্বামী ইত্যাদি)

৭৮। **"নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশূন্য, সমাধিস্থ।"**

ঈশ্বরের প্রকাশ হলো – ঠাকুরের দেহ-মন্দিরে – ভক্ত সমাগমে।

জৈবীভাব লুপ্ত, ঈশ্বরের প্রকাশ, তাই সমাধি।

'সমাধি' – ঈশ্বরের প্রকাশ।

'বাহ্যশূন্য' – জৈবীভাব লুপ্ত।

এই জৈবীভাব লুপ্ত হয়ে ঈশ্বরীয় ভাবে পরিবর্তিত হয়।

কুন্ডলিনী – প্রাণশক্তি – যতক্ষণ বহির্মুখী ততক্ষণ জীবত্ব, যখন অন্তর্মুখী হন, তখন দেবত্ব। শুধু দেবত্ব নয়, ইনিই কারণশরীর হন – ভাগবতী তনু ও পরে আত্মা।

৭৯। **"............ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন!"**

শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীশঙ্করের ন্যায় ধ্যানী, আবার মহাপ্রভুর মত শ্রীভগবানের প্রেমে উন্মত্ত!

"আমি একাধারে অদ্বৈত, চৈতন্য আর নিত্যানন্দ।"

৮০। **"..............খাট বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতো পরেন।"**

শ্রীবুদ্ধ শ্রমণরূপে ভিক্ষায় চলেছেন – হরিদ্রাবর্ণের কাপড়ে সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত।

শ্রীশঙ্কর বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে বিচার করছেন – সারা দেহ গেরুয়ায় আচ্ছাদিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ – সেই গৌরসুন্দর দেহে একটি কৌপীন পরে আছেন।

ঠাকুর হরিকথা বলবার জন্য কেশববাবুর বাড়ি যাচ্ছেন – পায়ে বার্ণিশ করা চটি, মোজা, পরনে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে জামা।

আড়াই হাজার বছরের ভারতবর্ষের ধর্মজীবন এই চারজনের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

আমি এঁদের কার ভিতর?

হলুদ রঙের কাপড়! – ও বাবা, ও হাঙ্গামা আবার কে করে!

দরকার নেই আমার।

মাথা মোড়ান – গেরুয়া! – আবার সেই হুজ্জুতি!– ও আমার নয়।

কৌপীন! – না, না, ও আবার কি!

আমি জুতো পরি, মোজা পরি, কাপড় করি, গায়ে জামা দি, খাটবিছানায় বসি, তেল মাখি, মাছ খাই, পান খাই, ঠাকুরও তাই করেন। ঠাকুর 'আমার' জীবন যাপন করেছেন, – আমার জীবন – আমার আদর্শ। ঠাকুর ভগবান দর্শন ও ভগবান লাভ করেছেন। আমাকেও ঠাকুর কৃপা করুন। তাঁর এই কৃপার জন্য হলদে কাপড়ের দরকার নেই, গেরুয়া আবশ্যক করে না, কৌপীন খুঁজতে বেরোতে হবে না। আমি যে রকম আছি, ঠাকুরও সেই রকম ছিলেন। ঠাকুর আমার, আমি ঠাকুরের; তাই ঠাকুর যুগের আদর্শ– যুগাবতার! "আপনি আচরি ধর্ম শিখায় অপরে।"

ঠাকুর বলেছেন, "কেয়া জানে কোন্ ভেকসে নারায়ণজী মিল্ যায়!" কে জানে, কী ভেক ধারণ করলে ভগবানকে পাওয়া যায়! অর্থাৎ ভগবানকে পাওয়ার জন্য কোন ভেকের দরকার নেই। দরকার – শুধু তাঁর কৃপা।

৮১। **"সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম।"**

'সাক্ষাৎ' – প্রত্যক্ষ, মূর্তিমান্। ঠাকুরের দেহে সমাধি অবস্থায় ঈশ্বর প্রকাশ পেতেন – সকলে দেখত। তাই অবতারকে দেখাও যা, ভগবানকে দেখাও তা। এক অবতারের মানুষদেহে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ, আর কোথাও নেই। অবতারের যুগে এক অবতারই আছেন– আর কিছু নেই। তাই ভরদ্বাজাদি বার জন ঋষি রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলে স্তব করেছিলেন।

'সনাতন' – এক নিয়ম– মনুষ্যদেহে ভগবানের প্রকাশ। এতে জাতিভেদ নেই, স্থানভেদ নেই, কালভেদ নেই, – শুধু মানুষের দেহ আর ভগবানের কৃপা। মানুষের দেহটি একটি মাত্র পথ; আর তিনি কৃপা করে সেই মানুষদেহে প্রকাশ পান – এই হলো মত। এক মত, এক পথ – মানুষের দেহে ভগবানের প্রকাশ।

"যত মত, তত পথ" এর অর্থ – এক মত, এক পথ – এর ব্যতিক্রম হয় না।

সাড়ে তিন হাজার বছরের মসেস্ (Moses) ভগবানের সঙ্গে কথা কইছেন – আর সাড়ে তিন হাজার বছর পরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঠাকুরও মায়ের সঙ্গে কথা কইছেন; সেই মানুষের দেহ, আর সেই ভগবানের সঙ্গে কথা।

হিন্দু হোন, বৌদ্ধ হোন, খ্রীষ্টান হোন, মুসলমান হোন, পারসী হোন, জগতের যে কোন ধর্মাবলম্বী হোন, তিনি পৃথিবীর যে কোন অংশেই থাকুন – আত্মা যদি কৃপা

করে তাঁকে দর্শন দেন, তবে তিনি আত্মাকে নিজের দেহের মধ্যেই দেখেন।

মানুষের দেহে আত্মার সাক্ষাৎকার – এই হলো সনাতন।

'ধর্ম' – দেহকে যিনি ধারণ করে আছেন। আত্মা ওতপ্রোতভাবে, অলক্ষ্যে, নির্লিপ্ত হয়ে এই দেহকে ধারণ করে রয়েছেন। এই আত্মা দেহ থেকে নিঃসৃত হয়ে সহস্রারে আত্মা রূপে প্রকাশ পান আর সচ্চিদানন্দগুরু সেই আত্মাকে দেখিয়ে দিয়ে তাঁর সাথে এক হয়ে যান। তখন দ্রষ্টা বুঝতে পারেন, দেখতে পান – এই আত্মা আর এই আত্মাই দেহকে ধারণ করে রেখেছেন। এ দেখতে পান কারা?

"ঈশ্বর বস্তু সব আধারে ধারণা হয় না।"

'ঈশ্বর বস্তু' – আত্মা।

'সব আধারে' - ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ অবতারাদির আধারে – অন্য আধারে অর্থাৎ দেহে নয়।

সত্যের প্রকাশ অবতারের আধারে। তাই অবতার নরদেহে শ্রীভগবান - জগতের প্রণম্য। অবতারের অনুভূতি – প্রথম স্তরের অনুভূতি। আর সব অনুভূতির ক্রম আছে। ঠাকুরের কথা – "এক আনা, দু আনা, চার আনা জ্ঞান।"

ঠাকুর মাস্টার মশাইয়ের মুখ দিয়ে এ কথা বলিয়ে নিয়েছেন – "আপনাকে (ঠাকুরকে) ভগবান নিজের হাতে তৈরী করেছেন, আর সকলকে কলে ফেলে তৈরী করেছেন।"

৮২। **"মা, আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?"**

'বেড়া' – দেহ – হাড়ের বেড়া।

"ঈশ্বর যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।"

"মানুষের কি সাধ্য অপরকে মুক্তি দেয়!" এদের দেহ থেকে আত্মা যদি কৃপা করে মুক্ত হন, তবে এদের মুক্তি।

"মা, আমি (ঠাকুর)- না – তুমি।"

আমার (ঠাকুরের) সাধ্য নেই – এদের আত্মাকে দেহ থেকে মুক্ত করি। আত্মা যে তুমি গো মা, – ইচ্ছাময়ী তুমি। তুমি যদি কৃপা কর, তবে মুক্তি। এরা মুমুক্ষু জীব, এরা আমার সঙ্গ করতে এসেছে। মুমুক্ষু জীবের দু' একজন জেলের জাল থেকে পালায়।

এরা সংসারে আবদ্ধ – সেও তোমার ইচ্ছা।

সংসারী জীবের ভক্তি – " তপ্ত খোলায় জলের ছিটে।"

মহাপ্রভু বলছেন –

"শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই।
সংসারী জীবের কভু গতি নাই।।"

ঠাকুর বলছেন যে, আত্মা যদি এদের বরণ করতেন, তবে আমার কাছে আসবার বহু আগেই, এদের দেহ থেকে তিনি মুক্ত হয়ে, আত্মারূপে দর্শন দিয়ে সমস্ত সন্দেহ নাশ করতেন। তিনি করেন নি – আমি কী করবো! তবে মন্দের ভালো, এরা আমার সঙ্গ করবার ভাগ্য পেয়েছে।

৮৩। "খোলটা......"

'খোল' – আত্মা সংকলিত হয়ে সহস্রারে উঠেছেন, সে অবস্থায় দেহ খোল মাত্র – একটা আবরণ। এই হলো খড়ো নারকেল, বা শুকনো সুপারি। আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছেন, সে অবস্থায় কুণ্ডলিনী সহস্রারে যতো উঠতে থাকেন, ততো ঘাড়টি ডাইনে বাঁয়ে ঘট্ ঘট্ করে দুলতে থাকে, সেই সময় ডপর ডপর, খট্ খট্ শব্দ হতে থাকে। কাছে যাঁরা থাকেন, তাঁরা দেখতেও পান আর শুনতেও পান।

এ হলো ব্রহ্মবিদ্যা – যে বিদ্যার দ্বারা, আদ্যাশক্তি দেহের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে ব্রহ্মরূপে, আত্মারূপে দেখা দেন। ব্রহ্মবিদ্যা শরীরে ফুটে ওঠে আর দেখতে পাওয়া যায়। তাই তো মহাপ্রভুর, ঠাকুরের ভাব, সমাধি সর্বক্ষণ দেহেতে ফুটে উঠত আর সকলে দেখতেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যা, ভারী মজার! ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়েছে এমন কোন মহাপুরুষকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়, দেহ আর আত্মা কি পৃথক হয়?" ঐ মহাপুরুষের কোন কথা বলবার আগেই, তাঁর ঘাড় ডাইনে বাঁয়ে ঘট্ ঘট্ করে নড়তে থাকবে আর খট খট্ করে শব্দ হবে। জিজ্ঞাসু শুনতে পাবে আর দেখতেও পাবে।

বিদ্যা সত্য – শুনবা মাত্র ব্রহ্মবিদের দেহেতে প্রকাশ পাবে। ভারী মজার।

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল সই,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

শুধু যে প্রাণকে আকুল করবে, তা নয়, প্রাণের আকুলতা দেহেতে প্রকাশ পাবে – তবে ষোল আনা।

এর অপর নাম – 'যোগৈশ্বর্য।' একে 'প্রলয়'ও বলে।

লক্ষণ – এর পর মূর্ছা – সমাধি।

দেহ যে খোল – এই উপলব্ধির এই হলো বাহ্য প্রমাণ।

এর পরে উপলব্ধি – আমি আত্মা, আমি দেহ নই।

এর পরে লয় হয়ে যায় – পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পরে তত্ত্বজ্ঞানে যদি কেউ নেমে আসে, অর্থাৎ 'আমি না - তুমি', তখনও বোধ অর্থাৎ বুঝতে পারা যাচ্ছে – দেহটা খোল।

দেহেতে 'মানুষ-রতন' হলে পূর্ণ উপলব্ধি হয় – মূর্ত ভগবান দেহেতে বিরাজ করছেন, আর দেহ শ্রীমন্দির। এই অবস্থায় ভক্ত প্রকৃতই ভগবানকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

৮৪। "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।"

দেহের মধ্যে আত্মা।

আত্মার মধ্যে জগৎ – আবার সারা জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে তিনি রয়েছেন।

প্রথমটি হলো বিশ্বরূপ দর্শন।

'ম আর রা'– আগে 'ম' তারপর 'রা'। আগে আত্মার দর্শন তারপর আত্মার মধ্যে জগৎ – এই দর্শন। বিজ্ঞানীর প্রথম অবস্থা – আর জগৎ সম্বন্ধে মায়ার রহস্য ভেদ।

দ্বিতীয়টি চতুর্থভূমির অনুভূতি – সমস্ত চিন্ময়, 'কোষাকুষি, মায় চৌকাঠ পর্যন্ত'। একে বলে বাহ্যচৈতন্য দর্শন। এই বাহ্যচৈতন্য জাগ্রত না হলে, অন্তর-চৈতন্য জাগ্রত হয় না।

'বাবুর ঘর' – বিশ্বজুড়ে, অগণিত।

সেই অগণিত ঘরের মধ্যে বৈঠকখানাও একটি ঘর।

বাবু সেই বৈঠকখানায় বসে আছেন। আর বিশ্বজুড়ে যে সমস্ত অগণিত ঘর আছে সেখানে তিনি অন্তর্যামীরূপে আছেন– প্রকাশ নন। যে হৃদয়ে – সহস্রারে – তিনি প্রকাশ হন, সে হৃদয় হলো – ভক্তের হৃদয়। ভক্ত ষোল আনা জানে বাবুর প্রকাশ তাঁর হৃদয়ে। আবার ভক্তের কতকগুলি অন্তরঙ্গ আছেন – তাঁদের বাবু কৃপা করে জানিয়ে দেন – আমি (বাবু) ঐ ভক্তহৃদয়ে আছি।

"ভরদ্বাজাদি দ্বাদশ জন মাত্র ঋষি রামকে অবতার বলে জানতে পেরেছিল।"

মানুষের মধ্যেই বাবুর প্রকাশ !

রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন - "হাতী এত বড় জন্তু কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না।"

বাবুর রূপ দেহেতে দুবার দেখতে পাওয়া যায়।

সরস বাবু – সগুণ অবস্থা।

শুকনো বাবু – নির্গুণ অবস্থা।

প্রতীকেও নির্গুণ অবস্থা বুঝতে পারা যায়।

যাঁর মধ্যে বাবু প্রকাশ পান – তাঁকে অবতার বলে।

আর সমস্ত বিশ্বজুড়ে তিনি অন্তর্যামী।

'এক আনা, দু আনা, চার আনা' – এতে সংশয় যায় না।

"আত্মার সাক্ষাৎকার হলে তবে সব সংশয় যায়।" নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়ে, দেহ থেকে সংকলিত হয়ে সহস্রারে দর্শন দেন – আত্মারূপে। এই আত্মার সংকলিত হওয়া আর ধারণা করা – এক অবতারের হয়। তাও আবার সব অবতারে নয়।

আত্মা এক। তিনি যেখানে কৃপা করে সংকলিত হয়েছেন – সেইখানেই পূর্ণ বিকাশ – আর কোথাও নেই।

সেইটি হলো বাবুর বৈঠকখানা।

৮৫। **"জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।"**

যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান, আর জ্ঞানীর ব্রহ্ম – তিনই এক।

অনুভূতির তারতম্য আছে – অবস্থা ভেদে।

আত্মা – প্রথম অবস্থার দর্শন – বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবৎ, সচ্চিদানন্দগুরু যা দেখান, আর শেষে ধান্যশীর্ষের মত লম্বা হয়ে যান।

ভগবান – আত্মার মধ্যে এই বিশ্বসংসার !

ব্রহ্ম–শুদ্ধ আত্মা – নির্গুণ ব্রহ্ম–মুখে কিছু বলা যায় না।

৮৬। **"একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন।"**

'আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ',–এক। অবস্থাভেদে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ। কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ।

শিবের দুই অবস্থা–কখনও স্থির হয়ে সমাধিস্থ–আবার কখনও স্বস্বরূপ দর্শনে আনন্দে বিভোর হয়ে–'আমি কি !আমি কি !' ব'লে নৃত্য।

৮৭। **"যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি–এই বিচার করে; ব্রহ্ম–এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, নামরূপ এসব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বলবার যো নেই। জ্ঞানীরা এইরূপ বলে–যেমন বেদান্তবাদীরা।"**

বেদের পঞ্চকোষের সাধন আর বেদান্তের 'আত্মা যদি কৃপা ক'রে সাধন করেন'–সেই অনুভূতি।

পঞ্চকোষ—

(১) অন্নময় কোষ—স্থূল দেহ;

(২) প্রাণময় কোষ—ডানদিকের তলপেটে দর্শন;

(৩) মনোময় কোষ—জ্যোতিদর্শন;

(৪) বিজ্ঞানময় কোষ—ইষ্ট দর্শন ও আত্মা সাক্ষাৎকার;

(৫) আনন্দময় কোষ—সহস্রারে অগণিত অনুভূতি—পাতাল-ফোঁড়া শিবের কখনও নৃত্য, আবার কখনও সমাধি—নির্গুণে লয় হওয়া।

বেদান্তের অনুভূতি—

(১) আত্মা;

(২) আত্মার মধ্যে জগৎ;

(৩) সেই বিরাট বিশ্ব বীজ হয়ে গেল;

(৪) বীজ স্বপ্নবৎ হলো;

(৫) 'কী আছে মুখে বলতে পারা যায় না'।

৮৮। **"ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে। জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীবজন্তু এসব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, 'তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব—জীব-জগৎ হয়েছেন।' ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসে না।"**

ভক্ত কে?

যিনি দেহের মধ্যে মানুষ-রতনকে ধারণ করেছেন, দেখেছেন, আর তাঁর হাততালি দিয়ে হরিনাম করা শুনেছেন—তিনি ভক্ত। কুণ্ডলিনীর জাগরণ থেকে (কুণ্ডলিনীর দেহ ফুঁড়ে জাগরণ, দেহেতে ভক্তির স্থিতি ও প্রকাশের প্রথম যৌগিক লক্ষণ) মানুষ-রতন হওয়া পর্যন্ত—সমস্ত অবস্থাই ভক্ত লন। তন্ত্রের অনুভূতি, বেদের অনুভূতি, বেদান্তের অনুভূতি, তত্ত্বজ্ঞানের অনুভূতি, অবতারতত্ত্ব (পুরাণের অনুভূতি) সমস্তই ভক্ত লন।

"জ্ঞানী বা'র বাড়ি পর্যন্ত যায়, ভক্তি মেয়েছেলে—অন্দর মহলে যায়।"

৮৯। **"ভক্তের ভাব কিরূপ জান? 'হে ভগবান, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান', আবার 'তুমি আমার পিতা বা মাতা', 'তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ।' ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম'।"**

মানুষ-রতনকে দেহের মধ্যে পাবার পর—ভক্ত পঞ্চভাবের একটি ভাব আশ্রয়

করে ভক্তিরস আস্বাদন করেন– সমস্ত দেহে ব্যাপ্তভাবে !

পঞ্চভাব–শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কোনও কোনও ভাগ্যবান এই পঞ্চভাব আস্বাদন করেন।*

৯০। **"যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ।"**

জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিবর্তিত হয়। এটি হোল মহাযোগ–আত্মার সাধনের পরে হয়–আর এই পরমাত্মা দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগী ছিলেন।

৯১। **"যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে।"**

যোগী পরমাত্মা সাক্ষাৎ করছেন–যদিও পরমাত্মার ভিতর থেকেই এই উপলব্ধি হচ্ছে, তবুও বোধ আছে। এই 'বোধ'-এর লয় যোগীর কাম্য কিন্তু তা হয় না। পরমাত্মা দর্শন উপলব্ধির জন্য, – লয় হবার জন্য নয়।

৯২। **"তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে।"**

যোগীর মন দেহেতে আবদ্ধ হয় –জ্ঞানীরও তাই, ভক্তেরও তাই। ভগবান যাঁকেই কৃপা করেন, তাঁরই মন দেহেতে আবদ্ধ হয়। এই একমাত্র পথ –সনাতন।

৯৩। **"বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব জগৎ এসব শক্তির খেলা।"**

'বেদান্তবাদী' –যাঁদের আত্মার সাধন হয়েছে, যাঁরা আত্মাসাক্ষাৎকার করেছেন, আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন করেছেন, আবার সেই জগৎ বীজবৎ হয়ে গেছে, সে বীজও স্বপ্নবৎ হয়েছে–এই সব অনুভূতি করে যাঁদের 'জড় সমাধি' হয় - তাঁরা হলেন বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী।

"সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব জগৎ, এসব শক্তির খেলা -"

'সৃষ্টি' – দেহ থেকে আত্মার সৃষ্টি –সহস্রারে।

'স্থিতি' –আত্মার মধ্যে জীব-জগৎ– বিশ্বরূপ।

'প্রলয়'– স্বপ্নবৎ–কিছু নেই।

এ সমস্ত অনুভূতি–আদ্যাশক্তির নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণত হবার স্তর বা সিঁড়ি।

৯৪। **"বিচার করতে গেলে, এ সব স্বপ্নবৎ।"**

যা কিছু অনুভূতি হয়েছে – সে সমস্ত অনুভূতি পর্যন্ত বোধ হয় – স্বপ্নবৎ –স্বপ্ন !**

---

* আগমে এদের পঞ্চ 'ভাব' বলে কিন্তু নিগমে এরা 'পঞ্চরস'। **অলীক।

৯৫। **“ব্রহ্মই বস্তু.......”**

প্রথম স্তর — আত্মা।

দ্বিতীয় স্তর — জড় সমাধি।

তৃতীয় স্তর —‘অস্তি’ জ্ঞান নিয়ে ফেরা। এই হলো তত্ত্বজ্ঞানে নামা বা ফেরা।

স্থিত সমাধি হয় না—স্থিত সমাধি হলে ফেরে না,

“শুকদেব সেই ব্রহ্মসমুদ্র দর্শন-স্পর্শন করেছিল, আর সেই ব্রহ্মসমুদ্রের হাওয়া দূর থেকে নারদের গায়ে লেগেছিল।”

স্থিত সমাধি—বৌদ্ধদের ‘মহানির্বাণ’, আর তন্ত্রের ‘মহাকারণে লয় হওয়া’।

৯৬। **“............আর সব অবস্তু।”**

আর কিছু নেই।

৯৭। **“শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু।”**

শক্তির অনুভূতির শেষ পর্যায় ‘স্বপ্নবৎ’ — তারপর কিছু নেই।

৯৮। **“কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নাই।”**

যতই অনুভূতি হোক, স্থিত সমাধি না হওয়া পর্যন্ত — মহাকারণে লয় না হলে — মহানির্বাণ না পেলে —শক্তিরই লীলা।

৯৯। **“আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি, এসব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।”**

বোধস্বরূপ অবস্থাতেও বোধ আছে — ‘অহং’ আছে।

১০০। **“তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।”**

“ব্রহ্মই কালী”।

নির্গুণ থেকে সগুণ —অবতার তত্ত্ব— ‘শক্তির সহায়ে অবতার লীলা।

অবতারতত্ত্ব

(১) ব্রহ্মজ্ঞান।

(২) তত্ত্বজ্ঞান —‘আমি না, তুমি’।

(৩) এই ‘তুমি’ বহু প্রাচীন ঋষিরূপে দেখা দেন আর বলেন “চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে আসছেন।”

(৪) চৈতন্য সাক্ষাৎকার — সহস্রারে দপ্ করে লাল আলো জ্বলে ওঠে — ‘অন্ধকারে লাল চীনে দেশলায়ের আলো’।

(৫) সহস্রার থেকে কন্ঠদেশ পর্যন্ত জ্যোতিদর্শন — তখন প্রত্যক্ষ বোধ হয় — অবতরণ।

(৬) সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত – ঐ পূর্বের মতো জ্যোতিদর্শন– আরও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় – অবতরণ।

(৭) এই অবতীর্ণ জ্যোতি মানুষ-রতন হন। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করেন, আর ভক্তের হাতের চেটো কর্ কর্ করতে থাকে।

এসব একসঙ্গে হয় না। একের পর এক হয় – সময় নেয়।

১০১। **"নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাবা যায় না।"**

লীলাতে নিত্যের প্রকাশ; আবার নিত্য আছে বলে লীলা– অবিচ্ছেদ্য, অনাদি আর শাশ্বত।

দেহ পাওয়া গিয়েছিল – তাই ভগবান দর্শন।

'খোলা আর আঁটি ছিল বলে তাই আঁবের শাঁসটি।'

১০২। **"কালীই ব্রহ্ম"।**

'কালীই ব্রহ্ম' – আগম।

আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিণত হয় – ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদের পঞ্চকোষের সাধন – এটি একটি স্তর।

আর বেদান্তের অনুভূতি – দ্বিতীয় স্তর।

আদ্যাশক্তি যখন আত্মারূপে শরীর থেকে বেরিয়ে প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষে পরিণত হন, – তখনও আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম (সগুণ), আবার আত্মা যদি কৃপা করে সাধন করেন, আর নিজের স্বরূপ দেখিয়ে লীন হয়ে যান, – তখনও ব্রহ্ম (নির্গুণ)।

১০৩। **"ব্রহ্মই কালী"।**

'ব্রহ্মই কালী' – নিগম।

ব্রহ্মজ্ঞান থেকে নেমে এসে অবতারতত্ত্বে মানুষ-রতন।

আর একটু আছে–শরীর। এই শরীরও সেই নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ রূপ।

"ছাদও যে জিনিসে তৈরী, সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরী।" "রেতঃ অত কোমল, – তা থেকে এই কঠিন অস্থিমাংসের দেহ কি ক'রে তৈরী হয়।"

ঈশ্বরের লীলায় সব সম্ভব। লাল জবা ফুলের গাছে সাদা জবা ফুল হওয়া।

১০৪। **"এক পুকুর....।"**

সহস্রার – মাথায় আছে। দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম স্তরের অনুভূতি। চামড়া গুড়িয়ে গেল, আর সহস্রার দর্শন হলো।

ঠাকুরের কথা–'থিয়েটারের সিন (ড্রপসিন) উঠে যাওয়া'।

দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি – জ্যোতির পুকুর – প্রতীক।

তৃতীয় স্তরের অনুভূতি—জলের পুকুর—প্রতীক।
জল—ব্রহ্মবারি।

১০৫। **"তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ 'God' কেউ বলছে 'ব্রহ্ম'।"**
নির্গুণ অবস্থা।

১০৬। **"..... কেউ 'কালী'; কেউ বলছে 'রাম', 'হরি', 'যীশু', 'দুর্গা'।"**

ভাগবতী তনু ইষ্টমূর্তি ধারণ ক'রে ভক্তকে দেখা দেন; যিনি যা দেখেন, তিনি তাই বলেন। এ অবস্থায় বোঝা যায় না যে, ভাগবতী তনু ইষ্টমূর্তি ধারণ ক'রে, দেহ থেকে বেরিয়ে,ভক্তের সামনে উপস্থিত। ভক্ত জানেন —তাঁর ইষ্ট আকাশ থেকে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভগবান যদি সমস্ত সাধনের অনুভূতির রহস্য দেখিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন—তবে বুঝতে পারা যায়।

১০৭। **"তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী।"**

'মহাকালী'— নির্গুণ

'নিত্যকালী' — নাদ। নাদ থেকে লীলা —মায়া—নেই, অথচ সত্য ব'লে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

'রক্ষাকালী'—লীলাকে রক্ষা করছেন—স্থূল চক্ষে সৃষ্টির দ্বারা।

'শ্যামাকালী'—স্থিতি—শান্ত।

'শ্মশানকালী'—প্রলয়—ধ্বংস—নাশ।

১০৮। **"যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতাকাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে।"**

বেদান্ত সাধনের তৃতীয় স্তরের অনুভূতি – যখন বিরাট বিশ্ব বীজে পরিণত হয়।

১০৯। **"সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন।"**

আত্মার মধ্যে জগৎ – আবার সারা জগৎ ব্যেপে আত্মা – জগতের প্রত্যেক রূপটিও তিনি।

১১০। **"কালী কি কালো ? দূরে তাই কালো; জানতে পারলে কালো নয়।"**

ধ্যানের প্রথম অবস্থায় অন্ধকার। তারপর ধ্যান স্থিতি হলে, দেহ থেকে কোষ মুক্ত হলে, নানা রকম দর্শন।

সাধক প্রথমে দেখেন দশভুজা, তারপর চতুর্ভুজ, তারপর দ্বিভুজ গোপাল, শেষে জ্যোতিদর্শন।

১১১। **"আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দ্যাখো, কোন রং নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দ্যাখো – রং নাই।"**

নির্গুণ ব্রহ্মের কথা – কি আছে তা বলবার জো নেই।

যাঁরা ফেরেন – তাঁদের শুধু 'অস্তি' জ্ঞান।

১১২। **"বন্ধন আর মুক্তি; দুয়ের কর্তাই তিনি।"**

'ঈশ্বর যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।'

'আমি' – অহং – এই বন্ধন।

এই 'আমি' কি – তিনি যদি দেখিয়ে দেন, তবে মুক্তি।

পেঁয়াজের – আমির– খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে কিছু থাকে না – এই হ'ল মুক্তি। অবশ্য মধ্যস্তরে – আমি দেহ নই, আমি আত্মা – এখানেও মুক্তির আস্বাদন প্রচুর – তবে এ সগুণ অবস্থা। আর মুক্তির স্থূল অবস্থা – দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হয়ে যখন সাক্ষাৎকার হয়।

১১৩। **"লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"**

তিনি যে দেহীর দেহে প্রকাশ পেয়ে লীলা করেন, নিজের স্বরূপ দেখান, আর নিজের রস নিজে আস্বাদন করেন– সেই ভাগ্যবান দেহীকে 'আমি' রূপ বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। দেহী ভগবানের লীলার সাক্ষীস্বরূপ, দেখে আর ভাবে– বাঃ বেশ হচ্ছে!

১১৪। **"তাঁর ইচ্ছা...."**

তাঁর ইচ্ছা দু'রকম – কাউকে সংসারে আবদ্ধ করে রেখেছেন, আবার কাউকে বা মুক্তিদান করছেন – হোক সে 'কোটিতে গুটি'।

১১৫। **"দৃষ্টি পোড়া......."**

ছায়ার মতন, – দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে এক ঘর লোক বসে আছে, ঠাকুর বলছেন, "তোমরা সব বসে আছ, আমি তোমাদের ছায়ার মতন দেখছি।"

১১৬। **"সারে মাতে.........."**

এক আনা, দু আনা, চার আনা – দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হবার পরিমাণ।

১১৭। **"আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি।"**

দেহ থেকে ঠাকুরের ষোল আনা আত্মা মুক্ত হয়েছে – তাই ঠাকুরের 'আমি' জ্বলে গেছে – আমি নেই।

১১৮। **"মনেতেই বদ্ধ। মনেতেই মুক্ত।"**

হৃদয়বাবু ঠাকুরকে লাটসাহেবের বাড়ি দেখাচ্ছেন, ঠাকুর ঐ প্রাসাদ দেখে বললেন, – "মা, এত বড় বাড়ি, এতে আছে কি? পোড়া মাটি থাক্, থাক্ করে সাজানো।" শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাড়িতেও সেই এক কথা – 'পোড়া মাটি সাজানো।'

দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। অর্থাৎ সাধারণ লোক যা দেখে, ঠাকুর তা দেখতেন না। মা মুখ বাঁকিয়ে দিয়েছেন — দৃষ্টি বাইরে ছিল, দেহেতে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। সেখানে ভগবান্ দর্শন ক'রে দৃষ্টি শুদ্ধ হয়েছে — মূলতত্ত্ব গ্রহণ করে। ভক্ত সচক্ষে দেখছেন — তাঁর ছায়ামূর্তি দেহ থেকে বেরিয়ে, দুটি হাত তুলে নাচছে আর বলছে, — "আমি মুক্ত হয়েছি, আমি মুক্ত হয়েছি।" এ হলো জীবন্মুক্ত হয়ে থাকার দ্বিতীয়স্তরের অনুভূতি। "তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বলবেন, তবে জানবি ঠিক হয়েছে।"

এই ভক্ত বুঝেছেন — তিনি মুক্ত।

তাঁর মন ভাবতে পারে না যে — তিনি বদ্ধ।

১১৯। "মন নিয়েই সব।"

শ্রীমতীর মনে শুধুই কৃষ্ণের মূর্তি — তাই তিনি যে দিকে আঁখি ফেরাচ্ছেন, সেই দিকেই কৃষ্ণ দেখছেন।

১২০। "কিন্তু একই মন।"

মন যখন শুদ্ধ হয় — তখন শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়।

"শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ আত্মাও তা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা।"

১২১। "মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, বিষ নাই, জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' - এই কথাটি রোখ করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হ'য়ে যায়।"

ভক্তের প্রার্থনা — ভগবানের কাছে। তিনি প্রার্থনা শোনেন।

হাজরা মশাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন, "তাঁকে বললে তিনি শুনবেন?" ঠাকুর — "একশ' বার।"

এই প্রার্থনায় — বিবিদিষা আছে।

বিবিদিষা — বাঁদর ছানার ভাব।

বিবিদিষায় যদি সত্যিকারের নিষ্ঠা থাকে, তাহলে মৃত্যুকালে সে সাধক ভগবানের কৃপায় মুক্তিলাভ করতে পারে। জীবদ্দশায় জীবন্মুক্ত হওয়া যায় না। বিদ্বৎ ব্যতীত জীবদ্দশায় জীবন্মুক্ত হতে পারা যায় না।

বিদ্বৎ — বিড়ালছানার ভাব, বাপে যে ছোট ছেলেকে কাঁধে নিয়ে যায়।

১২২। "খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি পড়ে শোনাতে বললুম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'। (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল

'পাপী'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।"

মনের রঙ বুদ্ধিতে বর্তায়। বুদ্ধি মলিন হয়। সেই মলিন বুদ্ধি নিম্নগামী করে।

১২৩। **"ভগবান দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য।"**

বিবিদিষায় ভগবান দর্শন হয় না।

তবে তেড়ে ফুঁড়ে খুব রোখ করলে খানিকটা এগিয়ে যেতে পারা যায়।

ভগবানের কৃপা ব্যতীত ভগবান দর্শন হয় না।

কৃপা হলো – বিদ্বৎ – স্বয়ম্ভু – আপনা হতে হয়।

১২৪। **"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই – কি ? আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে ? আমার আবার পাপ কি ? আমার আবার বন্ধন কি ?"**

এ রকম মনের জোরকে ভগবানের কৃপা বলে।

তাঁর কৃপা – "হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো নিয়ে গেলে দপ্ করে সমস্ত আলো হয়ে যায়।"

"তবে কৃপা কৃপা, বললেই কি হয় – সে দু-এক জনার।"

১২৫। **"কৃষ্ণকিশোর বললে, 'তুই বল শিব'। নে, এখন জল তুলে দে।"**

"ভগবানের নাম করলে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।"

নাম নামী অভেদ।

ভগবানের নামে দেহেতে ভগবান প্রকাশ পান। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয় – জাতিভেদ থাকে না – 'এক'ই আছেন।

জাত – অষ্টপাশের একটি পাশ।

১২৬। **"আমি মা'র কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম।"**

মা'র সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ঐশ্বর্যময়ী মা, ঐশ্বর্য দেবার ইচ্ছা ছিল। নিষ্কাম সাধক মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললেন, "মা, আমার ঠাকুরের পায়ে যেন ভক্তি হয়।"

মা প্রসন্না হন।

এ সব চাক্ষুষ ঘটে।

ভক্তিই সার। ভক্তির সংজ্ঞা (Definition) দেওয়া যায় না।

ভক্তির শ্রেষ্ঠ অনুভূতি – দেহের মধ্যে মানুষ-রতন। যতক্ষণ মানুষ-রতন দেহেতে না পাওয়া যায় ততক্ষণ ঠিক পাকা ভক্তি হয় না।

চৈতন্য ঐ মানুষ-রতন বা অবতারের মূর্তি ধারণ করেন।

১২৭। **"কিন্তু ফস্ করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক**

তপস্যা করেছিলেন।"

যদিও জনক রাজার 'বিদ্বৎ', তবুও ভগবান জনক রাজাকে দিয়ে অনেক তপস্যা করিয়ে নিয়েছিলেন। নারদেরও তাই।

শুক হলেন ব্রহ্মজ্ঞানের ঘন মূর্তি – আপনা হতে হয়েছে –'পাতাল- ফোঁড়া শিব'।

১২৮। "সংসারে থেকেও এক একবার নির্জনে বাস করতে হয়।"

সংসারের আবহাওয়া দেহের উপর আঘাত করতে থাকে – দেহ থেকে আত্মা নিঃসৃত হতে দেয় না।

'নাড়াচাড়া করলে দই বসে না' – দেহ যোগযুক্ত হয় না।

১২৯। "ফুটপাতের গাছ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।"

'ফুটপাত' – মানুষ – যাকে সর্বদা ভোগের মধ্যে বাস করতে হয়। 'সংসার ভোগের স্থান।'

'গাছ' – কুণ্ডলিনী শক্তি–প্রথম অবস্থায়। বহু পরে আমগাছ – অমৃত বৃক্ষ – বহু ছোট বড় আম হয়ে আছে। নীচে ছোট, ওপরে বড় আম। নিজের দেহের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

"চারা" – কুণ্ডলিনী প্রথম অবস্থায় জাগ্রত হন সর্পের প্রতীকে – স্বপ্নে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সূক্ষ্মভাবে দেহেতে জাগেন – সাধক তখনও বুঝতে পারেন না। পঞ্চকোষের সমস্ত অনুভূতি হয়ে গেলেও, তখনও কুণ্ডলিনী দেহ ফুঁড়ে জাগ্রত নন। এর বহু পরে – যখন মহাবায়ু পাঁচরকম গতিতে সহস্রারে যান, আর ক্রমাগত সমাধি হতে থাকে, তখন সাধক কুণ্ডলিনীর পরিচয় সম্যক অবগত হন। এর পরীক্ষা অতি চমৎকার। যদি কারোর শরীরে দেহ ফুঁড়ে, ষোল আনা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে থাকেন – তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে ব্যাঙের মতন লাফাতে থাকে, এ কি রকম?" – অমনি দেখতে পাওয়া যাবে, তাঁর তলপেট থেকে কি একটা ওপর দিকে উঠছে, আর তাঁর শরীরটা বসে বসে ঠিক যেন লাফিয়ে উঠছে।

অতি আশ্চর্য! ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণমাত্র দেহেতে প্রকাশ পাচ্ছে। এই অবস্থা হলো – গাছের গুঁড়ি। কুণ্ডলিনীর আর একটি গতি আছে– তীরের মতো। বহু পরে কুণ্ডলিনীর আর একটি আকার দেখতে পাওয়া যায় – "শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী"*, কপালে কিছু উঁচুতে

* বেদ মতে 'শীর্ণা গোক্ষুরমণ্ডলী'

কোন কোন ভাগ্যবান দেখতে পান – অবশ্য সমাধি অবস্থায়।

'বেড়া' – নির্জনে সাধন ভজন।

'ছাগল' – কাম।

'গরু' – ষাঁড়– ক্রোধ।

'প্রথমাবস্থায় বেড়া' – নির্জনে গোপনে সাধন ভজন।

'গুঁড়ি হলে' – ব্রহ্মজ্ঞানের পর।

"গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।"

'হাতী' – মন – মনেতেই জগৎ।

ব্রহ্মজ্ঞানের পর বেঁচে থাকলেও কিছু ক্ষতি হয় না – সাধন বিচ্যুতি ঘটে না।

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হলে, এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানীকে কখনও ত্যাগ করে না।

১৩০। **"রোগটি হচ্ছে বিকার।"**

'আমি' রূপ বিকার। আমার সত্যকারের স্বরূপ– 'অজ'।

মায়ারূপ বিকারগ্রস্ত হয়ে সেই 'অজ'কে কিরকম দেখায়? এই স্থূল অন্নময় কোষ থেকে সাধন আরম্ভ করে – ব্রহ্মজ্ঞান – তারপর তত্ত্বজ্ঞানে ফিরে এলে তবে 'আমি- না', অর্থাৎ 'অজ' বলতে পারা যায়। এই 'আমি' রূপ বিকার রোগে সমস্ত ভুল দেখে; যা নেই তা সত্য বলে বোধ হয়।

১৩১। **"আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল।"**

ঘরে – দেহে।

'বিকারের রোগী' – 'অহং' রূপ বিকার।

'জলের জালা আর আচার তেঁতুল' – কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি।

১৩২। **"যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁইনাড়া করতে হবে।"**

পঞ্চকোষের সাধন, ব্রহ্মজ্ঞান, তারপর তত্ত্বজ্ঞান। আমি এই স্থূল দেহ – এই থেকে আরম্ভ করে 'আমি- না' পর্যন্ত – এই হ'ল 'ঠাঁই নাড়া'।

১৩৩। **"যোষিৎ সঙ্গ........"**

"সন্ন্যাসী নারীর ছবি পর্যন্ত দেখবে না।" "গোরা নারীর ছবি হেরবে না"।

"সন্ন্যাসী" –দেহ থেকে ষোল আনা আত্মা নিঃসৃত হয়ে, সহস্রারে সংকলিত হয়ে, যাঁর আত্মাসাক্ষাৎকার হয় – তিনি সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীর অবস্থা অপরকে জানিয়ে দেয়–ইনি সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীর কাছে কোন নারী এলে – হয় তিনি সমাধিস্থ হন, না হয় তাঁর চোখে জাল পড়ে যায়, অন্ধকার দেখেন। ঠাকুরের এই দুই অবস্থাই হ'ত। পরে

এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। তবে সন্ন্যাসী নারীর সঙ্গ কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না – গা জ্বালা করে, শ্বাসরোধ হয় আর শেষে সমাধি।

"মেয়ে মানুষ ছুঁলে আমার গায়ে শিঙি মাছের কাঁটা ফোটাতে থাকে।"

১৩৪। **"ঈশ্বর সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্য– এইটি বোধ, আর ঈশ্বরে অনুরাগ।"**

'ঈশ্বর সৎ, নিত্য বস্তু' – ব্রহ্মজ্ঞান – ঈশ্বরই আছেন।

'আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্য' – মায়া– মিথ্যা – অর্থাৎ যা নেই। 'এইটি বোধ' – দেহেতে ধারণা করা।

'আর ঈশ্বরে অনুরাগ' – পাকা ভক্তি – ব্রহ্মজ্ঞানের পর তত্ত্বজ্ঞান, তারপর অবতারতত্ত্বে মানুষ-রতন বা অবতারকে নিজের দেহের মধ্যে দেখে যে ভক্তি।

১৩৫। **"গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল.........."**

নিশিদিন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে থাকতেন – দৃষ্টি আবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণে।

১৩৬। **"ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।"**

কুণ্ডলিনী না জাগলে ব্যাকুলতা আসে না – আর এই কুণ্ডলিনী শেষে সচ্চিদানন্দে, ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়।

১৩৭। **".........যেন শিবরামের যুদ্ধ।"**

'শিব' – শিবগুরু। গুরু ইষ্ট এক হয়ে যান – ধ্যানে দেখতে পাওয়া যায়। আবার গুরু যখন ইষ্ট সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন, তখন দেখতে পাওয়া যায় – গুরু ইষ্টে লীন হয়ে গেলেন। আত্মা সাক্ষাৎকারের সময়ও গুরু আত্মাকে দেখিয়ে দিয়ে আত্মায় লীন হয়ে যান।

'রাম' – এক – অদ্বৈত।

এই শিবরামের যুদ্ধ ঠাকুর করেছিলেন – বেদান্ত সাধনার অনুভূতির সময়, সাধনকুটীরে পঞ্চবটী তলায়। অবশ্য বেদান্ত সাধনার অনুভূতি বহু আগেই আপনা-আপনি হয়ে গিয়েছিল – এখন শুধু 'জড়' সমাধি। পুরী মহারাজ ঠাকুরকে সাধনকুটীরে ধ্যানে বসিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে চলে গেলেন। ঠাকুর ধ্যানে মগ্ন হলেন। কিন্তু মন যখনই ষষ্ঠভূমি অতিক্রম করতে চায়, তখনই মায়ের সেই আনন্দময়ী মূর্তি। সাধক সব ভুলে যান নিজের প্রিয় ইষ্টকে দেখে। ঠাকুরের মন কিছুতেই আর ষষ্ঠভূমি অতিক্রম করতে চায় না। এই রকমে খুব খানিকক্ষণ কেটে গেল। পুরী মহারাজ পুনরায় ঘরে প্রবেশ করলেন। ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে বললেন – 'আমার ওসব হবে না'।

পুরী মহারাজ 'কিঁউ নেহি হোগা' – এই বলে এক টুকরো কাঁচ নিয়ে ঠাকুরের ভ্রূমধ্যে একটু ফুটিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইখানে মন নিয়ে এস'। আবার দরজা বন্ধ, শিকল ও ঠাকুরের পুনরায় ধ্যান।

আবার মায়ের সেই আনন্দময়ী মূর্তি! ঠাকুর এবার জ্ঞান খড়্গ বার করে মাকে খন্ড খন্ড করে কেটে ফেললেন। মন হু হু করে উঠে গিয়ে একেবারে 'জড়' সমাধি।

বহুক্ষণ পরে পুরী মহারাজ ঘরে প্রবেশ করে, ঠাকুরের দেহে ও মুখে 'জড়' সমাধির লক্ষণ সমূহ দেখে বলে উঠলেন, আরে ' এ কেয়া দৈবী হ্যায় রে'! শিবরামের যুদ্ধ শেষ হলো অদ্বৈত ভূমিতে। সাধক, শিবগুরু ও ইষ্ট, রামে পরিণত হ'ল – এক হয়ে গেল।

১৩৮। **"কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচিমিচি আর মেটে না।"**

'শিবের ভূতপ্রেতগুলো' – তন্ত্রের সাধক।

'রামের বানরগুলো' – বেদান্তবাদী।

যার যে রকম অনুভূতি, সে মনে করে তাই ঠিক।

"যে বহুরূপীকে লাল দেখেছে, সে বলে লাল, যে হলদে দেখেছে, সে বলে হলদে" ইত্যাদি।

আংশিক অনুভূতি – তাই মীমাংসা হয় না।

১৩৯। **"মায়ে ঝিয়ে...."**

দেহ (আদ্যাশক্তি) ও ভাগবতী তনু।

১৪০। **"জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না।"**

দেহ না থাকলে আত্মাসাক্ষাৎকার হয় না।

১৪১। **"জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না।"**

দেহ না থাকলে ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয় না।

১৪২। **"তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই এইরূপ ভেঙে ভেঙে যায়।"**

"পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিবে
তা বিনু সকলি পর।"

তোমায় সচ্চিদানন্দগুরুরূপে তোমার শিষ্যরা কেউ পায় নি। তোমার সচ্চিদানন্দ লাভ হয় নি। তুমি মানুষ – তুমি গুরু হতে পার না।

"হেগো গুরু তার পেদো শিষ্য।"

১৪৩। **"কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর।"**

তন্ত্রের সাধন – কারণশরীর অর্থাৎ ইষ্টসাক্ষাৎকার - এই পর্যন্ত সাধন।

১৪৪। **“কারুর ভিতর নারিকেলের ছাঁই..........”**
কারো হয়তো সূক্ষ্ম শরীর দর্শন হল – এই পর্যন্ত।

১৪৫। **“কারুর ভিতর কলায়ের পোর.....”**
দেহ অসাড় – ভারী শরীর –কিছুই হয় না।
বেদের সাধন হলে কিছু ‘পোর’ থাকে না।ব্রহ্মজ্ঞান– শূন্যম্।

১৪৬। **“আমি খাই দাই থাকি।”**
আমি খাই, থাকি আর মায়ের নাম করি – এই আমার জীবত্ব।
‘আমি একটু থাকে।’ ‘থাক শালা দাস হয়ে।’
এখানে সন্তানভাব – মা আর ছেলে।

১৪৭। **“........আর সব মা জানে।”**
মা লীলা করছেন, আর আমি দেখছি। দেহের মধ্যে কখন তিনি নিত্যে যাচ্ছেন, আবার কখনও বা লীলাময়ী হয়ে ফুটে উঠছেন। তিনি দেহেতে লীলাময়ীরূপে ফুটে ওঠেন– দেখতে পাওয়া যায়।

১৪৮। **“গুরু, কর্তা ও বাবা।”**
‘গুরু’ – “মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না – গুরু এক সচ্চিদানন্দ।”
যে আত্মা ওতপ্রোতভাবে, অলক্ষ্যে ও নির্লিপ্তভাবে দেহকে ধারণ করে রেখেছেন তিনিই গুরু।
‘কর্তা’ –অহংকার। ভগবানের জগৎ – তিনিই কর্তা।
‘বাবা’ – মহামায়ার ফাঁদে পড়ে সন্তানাদি সৃষ্টি করা।

১৪৯। **“গুরু এক সচ্চিদানন্দ।”**
সচ্চিদানন্দগুরু মূর্তি ধারণ করে এসে আশীর্বাদ করেন আর বলেন, ‘তোর হবে’। দেহে এই সচ্চিদানন্দগুরুর উদয় হওয়া হলো – আত্মার বরণ করা।
“আত্মা যাকে বরণ করে তারই হয়।”
তিনি সমস্ত রাজযোগ শিক্ষা দেন।
তিনি ইষ্টসাক্ষাৎকার করিয়ে ইষ্টে লীন হন।
তিনি আবার আত্মা সাক্ষাৎকার করিয়ে আত্মায় লীন হন।
তিনি কারণশরীরে থাকেন – কখনও নিজ মূর্তিতে ফুটে ওঠেন – আবার কখনও লীন হন।

এই সচ্চিদানন্দগুরুর শরীরে সাধন হয় – সাধক দেখে। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হলে সাধন ভজন হয় না। ঠাকুর বলেছেন, “সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই।” ‘গতি’ –ঊর্ধ্বগতি – কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও সহস্রারে গমন। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হলে কুণ্ডলিনী জাগেন না। কুণ্ডলিনী না জাগলে কিছুই হয় না। সচ্চিদানন্দগুরু লাভের

অনেক স্তর। এই স্তরভেদে দেহেতে সাধন হয়। আত্মিক স্ফুরণ – কোনখানে ষোল আনা, কোনখানে আট আনা, কোনখানে চার আনা, কোনখানে দু'আনা, কোনখানে এক আনা। 'আমার ষোল টাং, তোদের এক টাং'। ঠাকুরের ষোল আনা – আর মহাপুরুষ মহারাজকে বলছেন, তোদের এক আনা। তিনি হলেন মহাপুরুষ মহারাজ – স্বামী শিবানন্দ—অপর কেউ নন! তাঁরই এক টাং!

এই সচ্চিদানন্দগুরু যাঁর লাভ হলো – তিনি সেই সঙ্গেই সিদ্ধ হয়ে যান। তাঁর দেহেতে আত্মার প্রকাশ। আত্মাই সচ্চিদানন্দগুরুর চিৎ-ঘন-কায় মূর্তি ধারণ করে আসেন – দেহীকে বরণ করেন – কৃপা করেন।

সচ্চিদানন্দগুরুর অনেক স্তর –

১ম। কোন এক অজানা লোক আসবে – এসে বলবে – 'চল্'।

তখন তাঁর কাঁধে চেপে অনায়াসে যাওয়া যায়। ইনি হলেন ষোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু – ছেলে বয়সে কৃপা করেন।

'অজানা লোক' - এমন চেহারা যাঁকে আগে কখনও দেখা যায় নি। অবশ্য পরে জানতে পারা যায়– ইনি – তিনি।

'এসে বলবে, চল্' – গতি নির্দেশ করে দেবেন – ঊর্ধ্বগতি।

'কাঁধে চেপে' – বাপের কাঁধে চেপে ছেলের যাওয়া। এতে আবার সখ্যভাবও আছে। 'শ্রীদাম সুদাম কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চাপতেন'।

২য়। একটি ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন সদ্গুরুর জন্য। ভগবান সচ্চিদানন্দগুরুরূপে – তাঁর গুরুর মূর্তি দেখিয়ে দিয়েছেন। এই মূর্তি যদি জীবিত থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে – ঐ মূর্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। আত্মা ঐ মূর্তিধরে বিরাজ করছেন।

৩য়। সচ্চিদানন্দগুরু উদয় হয়ে ইষ্ট দর্শন করিয়ে ইষ্টে লীন হয়ে গেলেন।

৪র্থ। সচ্চিদানন্দগুরু হঠাৎ উদয় হলেন – প্রেমোন্মাদ ও সর্বত্যাগীর ভাব – 'কৃষ্ণকথা কহ জীব, কৃষ্ণ কথা কহ' এই বলে লীন হয়ে গেলেন।

৫ম। সন্ধ্যা হয়েছে। ভীষণ অরণ্য। আকাশ ভরা মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে। কড়্ কড়্ শব্দ। ভীষণ ঝড়। পথিক ব্যাকুল হয়ে আর্তস্বরে বলছে – 'কী করে পার হব?' সচ্চিদানন্দগুরুর কণ্ঠে আকাশবাণী হ'ল – 'ঠাকুর, ঠাকুর বলে পার হয়ে যা।'

৬ষ্ঠ। ভক্ত দেখছেন – সচ্চিদানন্দগুরু পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র থেকে কুণ্ডলিনী জাগরণের বিষয় বলছেন।

৭ম। ভক্ত দেখছেন – সচ্চিদানন্দগুরু কর্ণধাররূপে নৌকা বেয়ে তাঁকে নিয়ে চলেছেন।

৮ম। ভক্ত দেখছেন – সমুদ্রতীরে নৌকা। নৌকায় সচ্চিদানন্দগুরু হাল ধরে

বসে। ভক্তের খুব আনন্দ। 'আপনি এখানে! আপনি এখানে!' – তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। জবাব পেলেন, 'তুমি আসবে, আমি জানতে পেরেছিনু, তাই তোমার জন্য এসেছি।' ভক্ত নৌকায় উঠলেন।

৯ম। সচ্চিদানন্দগুরু পুরাণপুরুষরূপেও আসেন আর ভক্তকে ডাকেন।

১০ম। সচ্চিদানন্দগুরু ঋষিরূপেও আসেন আর জ্ঞানদান করেন।

এই সমস্ত অনুভূতি এক একটি ভক্তের স্বপ্নে হয়েছে। "স্বপন কি কম গা?" জাগ্রত অবস্থার অনুভূতির চেয়ে স্বপ্নের অনুভূতি শুদ্ধতর।

১৫০। **"আমার সন্তানভাব।"**

এ হলো তত্ত্বজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞানে কিছু ছিল না । তত্ত্বজ্ঞানে সাধকের বোধ ফিরে এল। প্রথম বোধ হলো – 'আমি না।' তবে কে? তখন উন্মেষ হলো – 'তুমি, তুমি।' একে নিগমের অস্তিজ্ঞান বলা চলে – এই হলো পাকা 'অস্তি'। এই জ্ঞান একবার হলে – সে তো আর যাবে না। এ তত্ত্বজ্ঞান যাঁদের হয়েছে – তাঁরা গুরুগিরি করতে পারেন না। কথায় কথায় ঠাকুর বলেছেন – 'সচ্চিদানন্দই গুরু'। লীলাময়ী মায়ের জগৎ, মা লীলা করছেন, ঠাকুর অহোরাত্র সেই লীলা দেখছেন – অহোরাত্র দৃষ্টি মায়ে আবদ্ধ। তাই সন্তানভাব। তিনি গুরুগিরি করবেন কি করে? ভক্ত তেজচন্দ্র যখন মন্ত্রের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ঠাকুর বলেছিলেন, "আমি গুরু হতে পারি না, উপগুরু হতে পারি।"

১৫১। **"মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ।"**

"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না।"

১৫২। **"সকলেই গুরু হতে চায়! শিষ্য কে হতে চায়?"**

'গুরু হওয়া' – অহংকার। শিষ্য – নিচু জমি।

"উঁচু জমিতে জল জমে না, নিচু জমিতে জল জমে।"

১৫৩। **"আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে?"**

আদেশ না হলে আকর্ষণ হয় না। তোমার কথা তাদের দেহে স্থান পাবে না – আত্মিক স্ফুরণ হবে না।

১৫৪। **"যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে।"**

'কাঠ' – দেহ– ব্রাহ্মভক্তদের দেহ। 'জ্বাল'– ঠাকুর। 'দুধ' – আত্মা।

'ফোঁস করে ফোলে' – উদ্দীপনা হয়।

ঠাকুরের কাছে ব্রাহ্মভক্তদের উদ্দীপনা হয়েছে – তাই এই উপমা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি উপমা নয় – বস্তুতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব।

১৫৫। **"কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই।"**

ঠাকুরের কাছ থেকে চলে গেলে আর উদ্দীপনা থাকবে না।

১৫৬। "কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে – বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল, ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হলো। এই রকম।"

ব্রাহ্ম ভক্তদের আপনা হতে সাধন হবে না – ঠাকুর এ কথা বুঝেছেন। তাই পুরুষকার সহায়ে একনিষ্ঠ হয়ে থাকতে বলছেন – যদি ভগবানের কিছু কৃপা মেলে।

১৫৭। "সে কথার জোর কত ! পর্বত টলে যায়।"

'পর্বত' – দেহ – হিমালয়।

'টলে যায়' – কুণ্ডলিনী জাগরণ – শিহরণ – কম্পন - কপিবৎ মহাবায়ুর সহস্রারে গমন – সমাধি হওয়া।

১৫৮। "লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই।"

সচ্চিদানন্দগুরু লিখে দেখান কাগজে – ভক্ত দেখেন। এটি হলো প্রথম স্তরের চাপরাস। দ্বিতীয় স্তরের চাপরাস – ঠাকুর একটা কাগজে লিখেছিলেন, "নরেন শিক্ষে দিবে।"

১৫৯। "ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়।"

যাঁর ভগবান লাভ হয়েছে, তাঁর কাছে কেউ এলে তিনি ঐ লোকটিকে নিজের ভিতরে দেখতে পান। আত্মা ঐ রূপ ধারণ করে উদয় হন। যিনি এসেছেন তাঁর সম্বন্ধে সহজে সমস্ত জানতে পারা যায়। এটি ব্রহ্মজ্ঞানের একটি ফুট।

১৬০। "ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না, এ বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত।"

এ হলো তত্ত্বজ্ঞান – 'আমি না, তুমি'। ব্যবহারিক জীবনে এ লক্ষণ যাঁর প্রকাশ পাবে – তিনি জীবন্মুক্ত। ব্যবহারিক জীবনের লক্ষণ – গুরুগিরি করবে না। আর ধর্মের বিনিময়ে অপরের টাকা নেবে না। 'ও যদি সাধু হয়েছে তো অপরের টাকা নেয় কেন?'

১৬১। "তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো।"

"তাঁর কৃপা ব্যতীত তাঁকে পাওয়া যায় না।" তবুও ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের উৎসাহ দিচ্ছেন বিবিদিষার পথে, পুরুষকার আশ্রয় করে ভগবানকে ডাকতে। তিনি কৃপাময় – যতটুকু কৃপা করেন। 'অনেক ফুল চুষতে চুষতে একটু মধু।'

তাঁর জগৎ তিনি যা করবেন, তাই হবে – তুমি কিছুই করতে পার না।

১৬২। "কালীঘাটে দানই করতে লাগলো; কালী দর্শন আর হলো না।"

জগতে এসে, মায়ার খেলাই খেলা হলো। জীবনের উদ্দেশ্য – 'ভগবান দর্শন' –সেই ভগবান দর্শন আর হলো না।

১৬৩। "অন্নগত প্রাণ........"

ক্ষীণজীবী – দুর্বল শরীর। সবল, সুস্থকায়, নিখুঁত দেহ না হলে – আত্মিক স্ফুরণ ও আত্মাসাক্ষাৎকার হয় না।

"কালো পাঁঠা, একটু খুঁত থাকলে – মায়ের ভোগে লাগে না।"

১৬৪। **"জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগী হয়ে যায়।"**

'জ্বর'–ব্যাধি–'আমি'রূপ ব্যাধি।

'কবিরাজী চিকিৎসা'–বেদমতের সাধন।

'রোগী হয়ে যায়'– দেহ টুটে যায়।

'কলিতে বেদমত নয়'–পঞ্চকোষের সাধন দেহেতে হয় না।

১৬৫। **"এখন ডি. গুপ্ত।"**

পুরাণ মত।

ঠাকুরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যতদিন নরলীলা করেছিলেন, ততদিন পুরাণ-মত ছিল। ঠাকুর স্থূল শরীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের যুগ আরম্ভ। ঠাকুরের যুগে দশমূল পাঁচন নয়, ডি. গুপ্ত নয় এখন ইন্‌জেক্‌সন (Injection)। ঠাকুর দেখিয়ে দিয়েছেন।

'ইন্‌জেক্‌সন'–অন্তর (দেহের ভেতর) থেকে সচ্চিদানন্দগুরু ভেতর ফুঁড়ে বেরোবেন – তবে হবে। এই হলো ইন্‌জেক্‌সন,– বাইরে থেকে নয় – ভেতর থেকে।

"মানুষ কখনও গুরু হ'তে পারে না– সচ্চিদানন্দই গুরু। সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই।"

১৬৬। **"ভক্তিযোগই যুগধর্ম"**।

সচ্চিদানন্দ গুরুরূপে দেহের মধ্যে লীলা করেন – ভক্ত দেখে – সাক্ষীমাত্র।

'পাতাল ফোঁড়া শিব'– আপনি বেরোচ্ছে – ভক্ত দেখছে।

"তোমার কাজ গো তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

১৬৭। **"বেদান্তবাদীদের মতো তোমরা জগৎ স্বপ্নবৎ বলো না।"**

কেন বলে না ?– জানে না, এ অনুভূতি হয়নি – তাই বলে না।

'জগৎ স্বপ্নবৎ' – বেদান্তের এ অনুভূতি তোমাদের হবে না।

১৬৮। **"....তোমরা ভক্ত।"**

তোমাদের ইষ্ট সাক্ষাৎকার–'কলিতে বেদমত নয়, তন্ত্র মত।'

তন্ত্রমত–কারণশরীর – ভাগবতী তনু– যিনি ইষ্টরূপে দর্শন দেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

ধর্ম
ও
অনুভূতি

দ্বিতীয় ভাগ

একত্বের এক কণা

একো'হম্ বহু স্যাম্

La Homme Universalle

◆

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে'।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।"

– রবীন্দ্রনাথ (বুদ্ধদেব)।

◆

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক'রে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।

"সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়।

"সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা ক'রে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছে–

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।
সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক ...."। – রবীন্দ্রনাথ ।

(মানুষের ধর্ম, ভূমিকা)

◆

"সমাধির পারে যা। কেন, ঐ যে রে তুই গান গাস, 'যো কুছ হ্যায়, সব তুঁহি হ্যায়'।" – শ্রীরামকৃষ্ণ

'সমাধির পারে যাওয়া' – জগদ্ব্যাপী হওয়া। হাজার হাজার নরনারী তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় ধ্যানে, স্বপ্নে, জাগ্রত অবস্থায় ও নিদ্রার আবেশে (trance) দেখবে আর এই দেখার কথা তারা বলবে -- এই হলো জগদ্ব্যাপিত্বের প্রমাণ।

– শ্রীমানিক।

"ফল হলে ফুল আপনা হতে ঝরে যায়।" – শ্রীরামকৃষ্ণ।

'ফল' – জগদ ব্যাপিত্ব (Universalism)।

'ফুল' – ব্যষ্টি (Individualism)।

"একত্বং ব্রহ্মণো'পি স্যাদেবং মুক্তির্ণসর্ব্বথা।
অনস্য মুক্তির্ভবতি বিনা তজ্জ্ঞানকারণাৎ।।" ২/৫/২৪

"পরব্রহ্মের একত্ব (এক স্বরূপত্ব) জ্ঞানেই মুক্তি হয়। কিন্তু এই জ্ঞান ব্যতিরেকে তাঁহার বহুরূপত্ব দেখিতে গেলে কাহারও মুক্তি হইতে পারে না।"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্
শ্রীমান মুরারি গুপ্ত প্রণীতম্ (মুরারির কড়চা)

" All the various practices and trainings, Bibles and gods, are but the rudiments of religion, the Kindergartens of religion.

....How long will the world have to wait to reach the truth if it follows this slow, gradual process? How long? And where is the surety that it will ever succeed to any appreciable degree? It has not so far. After all, gradual or not gradual, easy or not easy to the weak, is not the dualistic method based on falsehood? Are not all the prevalent religious practices often weakening and therefore wrong? They are based on a wrong idea, a wrong view of man. Would two wrongs make one right? Would the lie become truth? Would darkness become light?"

– Swami Vivekananda
('Is Vedanta the future religion?'
Delivered in San Francisco on April 8, 1900.
Complete Works, Mayavati Memorial Edition,
Vol. VIII-page 140,141)

"কেশবও ঐ কথা (পরজন্ম) জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি লেজামুড়ো বাদ দিয়ে বললুম।" – শ্রীরামকৃষ্ণ।

'লেজা'–অতীত। 'মুড়ো'–ভবিষ্যৎ।

অতীত ও ভবিষ্যৎ গেলে থাকে বর্তমান। শ্রী নন্দ বসুকে তিনি বলছেন, "তুমি আম পেয়েছ, আম খাও না!"

'আম'– এই দেহে অমৃতত্ব – ব্রহ্মত্ব – একত্ব আছে,– তাই খাও।

‘আম খাওয়া’– “Granted that you attain personal liberation by means of the realisation of the Advaita, but what matters it to the world? You must liberate the whole universe before you leave this body. Then only you will be established in the eternal Truth. Has that bliss any match, my boy?” – Swami Vivekananda. (Complete Works Vol. VII-page 161)

‘আম খাওয়ার’ রূপ হলো–“আত্মার লক্ষ্মণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে। শিব ঐক্যবন্ধনে ....” – রবীন্দ্রনাথ - অথর্ব বেদ।

“Being one with Divinity there cannot be any further progress in that sense.” – Swami Vivekananda

আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন শ্রীমানিক প্রশ্ন করলেন, “What is the eternal problem of this human life? এই eternal problem-টা কি বলতে পারিস? ‘এই আমি কে? আর জগতের এই যে বিরাট্ মনুষ্যজাতি– এরা কে?– এদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী’?– এই হলো eternal problem! এই problem কখনও solve হয়নি বাবা। এই প্রশ্নের মীমাংসা হ’লে আর অসুর বলে কিছু থাকে না, আর re-birth বলেও কিছু থাকে না। স্বামীজীও (স্বামী বিবেকানন্দ) একথা বলে গেছেন, ‘অদ্বৈতবাদে পুনর্জন্ম নাই।”

একজন ভক্ত – “মানুষ সেই problem solve করার জন্যেই তার যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু they all had lost their track, মানুষ সেই problem থেকে দূরে সরে গেল, ঘুরে বেড়াতে লাগল কল্পনার রাজ্যে। আসল problem যেমন ছিল তেমনি রইল।”

শ্রীমানিক – “হ্যাঁ, ঠিক তাই। দেখ না, ছ’হাজার পাঁচশ বছর আগে মিশরের ফ্যারাও তৈরি করলে পিরামিড, আর তার ভিতর রেখে দিল সোনাদানা, যাবতীয় ভোগের জিনিস, মায় জীবন্ত মানুষ পর্যন্ত; উদ্দেশ্য – মরবার পরও সেইসব জিনিস ভোগ করবে। কি অদ্ভূত অবাস্তব কল্পনা! আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব বললেন ‘নির্বাণের’ কথা অর্থাৎ মরে গিয়ে মুক্তি। তিনি ধরে রইলেন সেই ভবিষ্যৎ। বর্তমানের এই জীবনটা –এই বিরাট্ সত্য – সেটা বাদ পড়ে রইল। যাজ্ঞবল্ক্য উষস্তকে যা বললেন তার ইংরাজী অনুবাদটা বলি– তোরা ভাল ক’রে বুঝতে পারবি – “Your Soul is the inner-self of all beings”।

কিন্তু এতেই কি সেই problem solve হলো? একটা কথা জেনে রাখ, – কোন জিনিসের abstract idea কখনও তোরা গ্রহণ করিসনি। ওরে আমি বলছি কি -- ধর্মে প্রমাণ আছে, আর সে প্রমাণ দেয় জগতের মানুষ ।

খ্রীষ্টান বললে, “The world is a valley of tears.”

মুসলমান ফকীর গান গাইল –

“উঠো মুসাফির, বাঁধো গাঁঠরিয়া,
কাঁহা সে আয়া, কাঁহা মে জায়েগা
কেয়া তেরা পাত্তা হই।”

শ্রী শঙ্কর লিখলেন, -- “কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ
কুতঃ আয়াতঃ কুতো বা যাতঃ।”

আর সেদিনও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে গান শোনা গেল–

“জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই....”

‘কোথা হতে আসি’ কিরে বাবা? বাপ-মার দেহ হ’তে আমি এসেছি, আবার কোথা থেকে আসবো?

দেখ্, এই ক’রে ক’রে মানুষ আসল problem Solve করা থেকে দূরে – বহু দূরে সরে গেল। এই বর্তমান জীবন যেটা একমাত্র সত্য, তাকে neglect করে শুধু অতীত, শুধু কতকগুলো উদ্ভট অবাস্তব কল্পনাকে আঁকড়ে ধ’রে রইল।

ওরে, এই আমি কে, আর আমার সামনে এই মনুষ্যজাতি – এরা কে, – এদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী – এই eternal problem এতদিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি - এইখানে solve হয়েছে। আমি আর জগতের মানুষ ‘এক’! কোথায় এক? – আত্মিক জগতে! আর সে একত্বের প্রমাণ দিচ্ছে কারা ? -- জগতের মানুষ, আমাকে তাদের ভিতরে দেখে। এই ‘এক’ আমি বলছি না - বলছে জগতের মানুষ। এই একত্ব হচ্ছে কী নিয়ে? আমারই রূপে আত্মিকে সব ‘এক’।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের
অমৃতবাণীর যৌগিক রূপ
২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রীকেশব সেনের সহিত
নৌকাবিহারের পর সুরেন্দ্রের বাড়ি

১৬৯। “ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে?”

“মেয়েরা আমার মায়ের এক একটি মূর্তি।” তবুও, “সন্ন্যাসী নারীর ছবি দেখবে না।” সন্ন্যাসী যে ইচ্ছে ক'রে দেখবেন না, তা নয়। তাঁর শরীরের অবস্থা এখন এই রকম যে মেয়েছেলে চোখে পড়বার আগেই চোখে জাল পড়ে যাবে, অন্ধকার দেখবেন, না হয়ত সমাধি হয়ে যাবে। যদি কোন রকমে গায়ে গা ঠেকে যায় তাহলে দেহেতে শিঁঙি মাছের কাঁটা ফোটাতে থাকবে। ঠাকুর নিজের জীবনে এগুলি প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন–“আমার এ-সব নজিরের জন্য।” এ-সব নজির দেখে সকলে বুঝবে, জানবে।

মেয়েরা মায়ের মূর্তি, সেই মায়েদের জন্য তিনি কি করলেন?

সেই কথা এখানে বলেছেন। ভারী মজা। ১২/১৩টি বন্ধু মিলে নিত্য কথামৃত পড়া হয়। বন্ধুগুলি কেউ বিবাহিত, আবার কেউ অবিবাহিত। দু'টি বিবাহিত বন্ধু – দু'জনেরই খুব উঁচু স্তরের সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়েছে। একজন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন, ‘ভগবান্ আমায় সদ্‌গুরু দাও’ – দীর্ঘকাল। ভগবান্ তাকে ‘সচ্চিদানন্দবিগ্রহ’, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ যে দেহেতে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করছেন, দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই বন্ধুটি ঐ ‘সচ্চিদানন্দবিগ্রহের’ বিষয় কিছুই জানতেন না – ‘প্রায় অজানা লোক’– অপরিচিত ব্যক্তি। দ্বিতীয় বন্ধুটিকে সচ্চিদানন্দগুরু ইষ্ট সাক্ষাৎকার করিয়ে ইষ্টে লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

মহামায়া বিরূপ, দু'টি মায়ের মূর্তি (দুজনের স্ত্রী) দু'টি বন্ধুর উপর খড়্গহস্ত।

ঠাকুরের যুগ। অদ্ভুত কৃপা ঠাকুরের। দশমূল পাঁচন নয়, ডিঃ গুপ্ত নয়, ইন্‌জেক্‌সন। মা দু'টির পরে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ ও স্বপ্নে নানা স্তরের সাধন ও অনুভূতি হয়েছিল।

একটি উদাহরণ দিই। একটি মা স্বপ্নে ঠাকুরের ছবি দেখছেন। সে ছবির মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠল; স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে এসে বললেন – “আমার খিদে পেয়েছে –

আমায় কচুরি ভেজে দে।” স্বপ্নদ্রষ্টা তাড়াতাড়ি কচুরি ভেজে দিলেন আর ঠাকুর খেতে লাগলেন। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। কী অদ্ভূত কৃপা! কী অদ্ভূত লীলা ঠাকুরের!

এখানেই ঠাকুরের লীলার শেষ নয়। ঐ বন্ধু দু'টির বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা পেয়েছে, – এমন কি বাড়ির শিক্ষয়িত্রী, রাঁধুনী পর্যন্ত দেবস্বপ্ন দেখেছেন। ঘরে বসে মেয়েদের সচ্চিদানন্দগুরু লাভের উদাহরণ এই প্রথম।

যদি কোন ভাগ্যবান পুরুষ ঠাকুরের কৃপা পান, তখন সেই স্থানে তাঁর সংস্পর্শে সকলে কৃপা পান। তবে ‘ষোল আনা, আট আনা, চার আনা, দু'আনা, এক আনা’ – মনে রাখতে হবে।

একটি বন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন – সচ্চিদানন্দগুরু তাঁকে একটি পয়সা দিয়েছেন।*

২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ
সিঁথি ব্রাহ্মসমাজ

১৭০। “.... অথবা নানা পুষ্প পরিভ্রমণকারী ষট্ পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে।”

ব্রহ্মানন্দের কাছে অন্য আনন্দ আলুনি লাগে। মিছরির পানার আস্বাদন পেলে, চিটেগুড়ের পানা ভাল লাগে না।

বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ – দুয়ের তুলনা হয় না। গজমতি আর কাঁচখন্ডে যে ফারাক – সেই ফারাক।**

১৭১। “এই যে শিবনাথ। দেখ তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুশি হয়।”

ভক্তকে দেখে ভগবানের আনন্দ।

“ভগবানকে দেখাও যা অবতারকে দেখাও তা।”

ঠাকুর – অবতার – ভগবান্।

এর পরীক্ষা খুব সহজ। অবতারকে ভক্তিভরে কেউ প্রণাম করলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে যাবেন, আর দেহেতে ঈশ্বরীয় লক্ষণ প্রকাশ পাবে। কাঠে আর পাথরের ঘর্ষণে কাঠটা জ্বলে ওঠে।

---

* সেই এক পয়সাতেই তাঁর অবতারতত্ত্ব পর্যন্ত অনুভূতি হয়েছিল। **প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ ব্যষ্টিতে নয়- সমষ্টিতে । সকলের দেহে সেই আনন্দময় পুরুষের রূপ ফুটে উঠবে। তারা সেকথা প্রকাশ করবে - তাতে হবে তার আনন্দ।

১৭২। "....হয়ত তার সঙ্গে কোলাকুলি করে।"

সচ্চিদানন্দগুরু আত্মসাৎ করেন– ভক্তকে নিজের সঙ্গে এক ক'রে নেন– ব্রহ্মজ্ঞান দেন।

বাবু চাকরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে, চাকরের হাত ধরে নিজের আসনে বসিয়ে বলেন – "বস্ বস্, তুইও যা আমিও তা, – এক।"

একটি বন্ধু দেখলেন – চোখ চেয়ে ধ্যানে – তার সচ্চিদানন্দগুরু তাকে গিলে ফেলছেন – আত্মসাৎ করছেন। আর একটি বন্ধু স্বপ্নে দেখলেন – একটি বড় বাঘ চিৎ হয়ে পড়ে থাবার ভিতর বন্ধুকে নিয়ে নিতে চেষ্টা করছে।

বাঘ– সচ্চিদানন্দগুরু।

১৭৩। "যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই...."

ঠাকুর এদের সকলকে নিজের ভিতর দেখতে পেতেন। এদের চেহারা ঠাকুরের ভিতর ফুটে উঠত – তখন তাদের ভিতর পর্যন্ত ঠাকুর দেখতে পেতেন। এটি ব্রহ্মজ্ঞানের একটি ফুট। আত্মার মধ্যে জগৎ– তারই অংশমাত্র।

১৭৪। "হাবাতে লোক...."

হাবাতে লোকের লক্ষণ– ভগবানের কথা হ'লে সেখান থেকে এরা উঠে পালায়। রাম নামে ভূত পালায়। এদের দেহের গঠন এ রকম যে দেহ থেকে আত্মা নিঃসৃত হয় না।

১৭৫। "সংসারী লোকেদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না।"

মুখের কথায় কারোর কিছু হয় না। "আত্মা যদি কৃপা ক'রে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।"

১৭৬। "নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন।"

নিত্যানন্দ প্রভু প্রকৃতি দেখে ভক্ত করেন নি। তাই নৈকষ্য কুলীন সৃষ্টি হয়নি। নৈকষ্য কুলীনের অভাবে যুগাবতারের দান উপে যায়। নৈকষ্য কুলীন– অন্তরঙ্গ – যাঁদের অন্তরে আত্মা 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ' রূপে ফুটে ওঠেন। ঠাকুরের 'বাইরের থাম' আর 'ভিতরের থাম'। থাম – আকার – রূপ – চেহারা। ভিতরের থাম – যাদের চেহারা ভিতরে ফুটে উঠবে – তারা অন্তরঙ্গ। এর উল্টো– 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহের' চেহারা যাদের ভিতরে রূপ ধারণ করবে তারাই অন্তরঙ্গ।

১৭৭। "ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য।"

নাম নামী অভেদ। নামী নামরূপে ফুটে ওঠেন – অন্তরে, আবার কখনও

কোন ভাগ্যবানের দেহেতেও আত্মা নাম রূপে ফুটে ওঠেন – তাই নামের অত মাহাত্ম্য। নাম ঈশ্বরের আর একটি রূপ। ঋষিরা তা দেখেছিলেন – তাই ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা।

১৭৮। "....শীঘ্র ফল না হতে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে।"

ব্রহ্মবিদ্যার নাশ নেই।

১৭৯। "যেমন কেউ বাড়ির কার্ণিশের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেক দিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল।"

এ জন্মে এ বীজ থেকে দেহে সাধনবৃক্ষ নাও হতে পারে, কিন্তু অপর কোন জন্মে* এ বীজ থেকে সাধনবৃক্ষ জন্মাবে। এসব রূপক নয়, দেখতে পাওয়া যায়।

সাধনবৃক্ষের দু'টি রূপ– কেউ দেখেন অশ্বত্থ গাছ, কেউ বা দেখেন আম গাছ। অশ্বত্থের চেয়ে আম গাছ ভাল – আম গাছে 'অমৃত' ফল হয়। "তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না – অমৃত ফল দেন।"

১৮০। "....সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না।"

এইটি সত্ত্বগুণী লোকের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক লক্ষণ। ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বলতেন, "আমি কারুর কিছু লই না।"

১৮১। "ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত।"

'ভক্তির তমঃ'– পূর্বরাগ।

'বিশ্বাস'– কৃপা।

'জ্বলন্ত'– দপ্ ক'রে আগুন জ্বলে ওঠা।

"হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে দপ্ ক'রে আলো জ্বলে উঠলো।"**

১৮২। "ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে।"

ব্যাকুলতা – বিরহ – 'দই মওয়া।'

১৮৩। "ধন কেড়ে লওয়া"।

মানিক কুড়িয়ে পাওয়া – আত্মা সাক্ষাৎকার করা।

১৮৪। "আমি তাঁর ছেলে"

অনুরাগ– রাগানুগা ভক্তি – সন্তানভাব – যেমন, ঠাকুরের । রাগানুগার লক্ষণ দেহেতে প্রকাশ পায়। সমস্ত দেহের প্রতি অনু পরমাণু সিঁদুরের মতন লাল হয়ে ওঠে – রক্ত ঊর্ধ্বমুখী। গোলা লোক দেখলে বলে – 'যেন একটা রক্তের চাঁই।'

---

* পরবর্তী কোন পুরুষে (generation) অর্থাৎ কোন বংশধরে।

** ঠাকুর কালীঘরে মায়ের খড়্গ নিয়ে নিজের গলায় চোপ দিতে গেলেন আর ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি জ্যোতি স্বরূপ মাকে দেখলেন–সব স্থির।

১৮৫। **"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়।"**

"তোমারি গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারি রূপে" – এই ভাব।

শ্রীভগবান্ লাভের কামনা।

তাঁর পাদপদ্ম দর্শনের লোভ।

'কেন তাঁর কৃপা পাব না– জগৎপতি, শালা'!– এই ক্রোধ।

জগৎ ভুলে যাওয়া – দেহেতে মনকে আবদ্ধ করা– এই মোহ।

'আমি তাঁর কৃপা লাভ করেছি – আর আমার কিছু দরকার নেই, – কৃষ্ণ আমার – আর কারো নয়'– এই মদ।

"আমি শ্যামকঙ্কণ হাতে দিয়ে সই, গরব ক'রে চলে যাব, আমি কঙ্কণ দেখায়ে চলে যাব।"– এই মাৎসর্য।

১৮৬। **"তাঁর কাছে জোর কর।"**

দেহ, প্রাণ, মন, চিত্ত, আত্মা – সমস্ত তাঁর পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে শরণাগত হওয়া– নেতি, নেতি, ধারণা ও বিচার, তবে নির্গুণে লয় হওয়া – এই হ'লো জোর করা।

১৮৭। **"তিনি তো পর নন, তিনি আপনার লোক,"**

"ওহি রাম সব্‌সে নিয়ারা।"

ভগবান যে তোমার ভিতরে, – 'শ্বেতকেতু, তুমিই সেই'– 'তু সচ্চিদানন্দ'।

১৮৮। **"....আর যখন শিষ্যরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোনও আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য।"**

'উত্তম আচার্য,–'গুরু এক সচ্চিদানন্দ'।

একটি বন্ধু– তাঁর ধ্যান হত না। তিনি স্বপ্নে দেখছেন- তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু ঘাড় ধ'রে তাঁকে ধ্যান করাতে বসালেন, আর তিনি ধ্যানে ডুবে গেলেন। ভগবান্ সচ্চিদানন্দগুরুরূপে কৃপা করলেন – তবে ধ্যান হলো।

ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁকে ডাকাও যায় না – তিনি মূর্ত হয়ে অন্তর থেকে জানিয়ে দিলেন।

১৮৯। **"ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।"**

"বিকারে রুগী বলে, আমি এক জালা জল খাব রে, আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাব রে"– সেই রকম প্রশ্ন। "আগে শ্যামপুকুরে যাও – তবে ত' জানবে তেলীপাড়া কোথায়। সেদিকে পা বাড়ালে না – অথচ তেলীপাড়ার খবর চাই।"

১৯০। **"তাঁর ইতি করা যায় না।"**

"তুমি আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে – সাকার, আকার, নিরাকারা।"

১৯১। **"ভক্তের জন্য তিনি সাকার।"**

ইষ্টমূর্তি। উঁচু সাকার ঘর হ'লে– বহুবিধ দেবদেবীর মূর্তি দর্শন হয়। আবার নিরাকার সাধক সাকার মূর্তি দেখেন– প্রথমে দশভুজা, তারপর চতুর্ভুজ, তারপর দ্বিভুজ গোপাল– শেষে জ্যোতিদর্শন।

১৯২। **"যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার।"**

ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসে 'নিরাকার' বলবার জন্য তত্ত্বজ্ঞান।

১৯৩। **"ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস।"**

দ্বৈতবাদ – ভক্ত ও ভগবান্।

১৯৪। **"তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' হয়ে দেখা দেন।"**

যদিও ঈশ্বর ব্যক্তি অর্থাৎ ইষ্টমূর্তি হয়ে দেখা দেন, কিন্তু জগৎটি তাঁর ভেতরে। কৃষ্ণ কোলে মা যশোমতী – কৃষ্ণ ঘুমোচ্ছেন,হাই তুললেন, মা যশোমতী ফিরে চাইলেন, দেখলেন,– কৃষ্ণের মুখের ভিতর বিশ্বসংসার। ঠাকুর দেখছেন, 'মা ভয়ঙ্করা কালকামিনী, জগৎ গিলছেন, আবার প্রসব করছেন।' এ সমস্ত 'আত্মার মধ্যে জগৎ'-এর সাকার অনুভূতি।*

১৯৫। **"জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে।"**

বোধস্বরূপ।

১৯৬। **"তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।"**

"সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই।"

১৯৭। **"......অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাব, কখন কখন সাকার রূপ ধ'রে থাকেন।"**

ষষ্ঠভূমি। ইষ্টমূর্তি দর্শন ও বহুবিধ সাকার রূপ দর্শন।

১৯৮। **"জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না।"**

সপ্তমভূমি – আত্মা সাক্ষাৎকার।

১৯৯। **"....তাঁর রূপও দর্শন হয় না।"**

নির্গুণ অবস্থা।

২০০। **"তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।"**

সব লয় হয়ে গেছে – স্থিত সমাধি।

২০১। **"প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।"**

---

* 'মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড – প্রকাণ্ড তা জান কেমন।'

'প্যাঁজ'– দেহ। 'খোসা'– কোষ।

অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ, শেষে মহাকারণে লয়।

২০২। **"যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।"**

'কলসী'– দেহ

'পূর্ণ হয়'– নির্গুণ বা মহাকারণে লয় হয়।

'শব্দ'– সগুণ – সাকার অনুভূতি সমূহ।

২০৩। **"কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না।"**

'কালাপানি'– মহাকারণ।

'জাহাজ'– বোধ।

'গেলে ফেরে না'– বোধাতীত অবস্থা– মহানির্বাণ লাভ।

২০৪। **"ভক্ত আমি...."**

অবতারের আমি। দেহের ভিতরে অবতার – ভক্ত দেখেন – সেই আমি।

২০৫। **"তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও।"**

বেদান্তের অনুভূতি তোমাদের হবে না। তোমাদের জীবনে যোগাযোগের অভাব – মহামায়া তোমাদের সংসারে আবদ্ধ করেছেন।

২০৬। **"ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।"**

সচ্চিদানন্দগুরু যদি কৃপা ক'রে কাঁধে তুলে নেন, তখন তাকিয়া পাওয়া যায়, ঠেসান দিয়ে বসবার। 'সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হ'ল, ঠেসান দিয়ে বসবার তাকিয়া পাওয়া গেল।'

২০৭। **"....সাকার রূপ দেখা যায়।"**

ইষ্ট সাক্ষাৎকার ও উঁচু সাকার ঘরে বহুবিধ দেবদেবীর মূর্তিদর্শন।

২০৮। **"আবার অরূপও দেখা যায়।"**

আত্মা সাক্ষাৎকার, 'খ' দর্শন, আবার পরমাত্মা দর্শন– এ তিনটি দর্শন আলাদা আলাদা হয়।

২০৯। **"যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে...."**

'চুষি'– দেহ। যতক্ষণ দেহকে নিয়ে 'আমি, আমি' করে।

২১০। **"মা রান্নাবান্না, বাড়ির কাজ সব করে।"**

মা– অন্তরে।

২১১। **"ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না ....।"**

দেহের উপর বিরাগ আসে – ভোগতৃষ্ণা যায়।

২১২। “....চীৎকার ক’রে কাঁদে।”

‘কাঁদলে যোগ হয়’– তীব্র ব্যাকুলতা।

২১৩। “ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে....”

দেহ ছেড়ে – শরীর থেকে। *

২১৪। “দুড়্ দুড়্ ক’রে....”

কুণ্ডলিনী জাগরণ। হৃদয়গ্রন্থি যখন ছিন্ন হয় – তখন বুকে গুর্ গুর্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

২১৫। “....ছেলেকে কোলে লয়।”

দর্শন দেন।

২১৬। “তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা হ’লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন।”

পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর– সাধনের গোড়া থেকে আরম্ভ ক’রে, ‘লয়’ হবার পূর্বাবস্থা পর্যন্ত সমস্ত চোখের ওপর ভাসতে থাকে।

২১৭। “....তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে।”

ইনি অবতার – ঈশ্বরলীলা জানেন।**

২১৮। “আমি এ গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি– তোমরা যা যা বলছ সব সত্য– সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়! বহুরূপী।”

কারণশরীর–ভাগবতী তনু– কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা, গোপাল, নারায়ণ ইত্যাদি। যে ভক্তের যা ইষ্ট ভাগবতী তনু সেই মূর্তি ধারণ ক’রে ভক্তকে দেখা দেন। ‘হিমালয়ের গৃহে পার্বতী জন্মালেন আর হিমালয়কে বহুবিধ রূপে দর্শন দিলেন।’***

২১৯। “আবার কখনও দেখি কোন রঙ-ই নাই।”

নির্গুণ।

২২০। “কবীর বলতো, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।”

নিগমে দেহের মধ্যে সচ্চিদানন্দগুরুর প্রথম আবির্ভাব মূর্তি ধারণ ক’রে আবার হাত পা নাড়বেন, কথা কবেন ইত্যাদি।

‘নিরাকার আমার বাপ’ – নির্গুণ!

‘সাকার আমার মা’ – সগুণ – লীলা।

---

* ‘স্বশরীরাৎ সমুত্থায়।’

** ‘গাছতলা’ –সহস্রার। ‘গাছ’– দেহ। ঊর্ধ্বে-মূল, ডালপালা– নিচে। এটি হলো মানুষের দেহ।

*** গাছতলায় –সহস্রারে, অবস্থান করলে তখন ঈশ্বরত্ব লাভ হয়, এসব জানতে পারা যায়।

২২১। **“ভক্তের ‘আমি’ অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।”**

বৈকুণ্ঠে নারায়ণ আর নারদ – সালোক্য, সাযুজ্য নয়। নিকষা রামকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছে – বাঁচতে চায়, আরও লীলা দেখবে।

২২২। **“কালী কি শ্যামরূপ, চৌদ্দপোয়া কেন ? দূরে ব’লে।”**

ষষ্ঠভূমির দর্শন– আত্মা তখনও বহুদূরে। বিশ্বরূপের কথাই নাই– ঠিক যেমন ম্যাট্রিক আর পি.আর.এস* - এ যে তফাৎ।

২২৩। **“দূরে বলে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না।”**

‘সূর্য’ – আত্মা। আত্মার মধ্যে জগৎ – বিশ্বরূপ।

২২৪। **“আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন ? সেও দূরে বলে।”**

রূপ – মূর্তি, আত্মা থেকে বহুদূরে – তাই চিন্ময়। মণির আলো রূপ ধারণ করেছে – নিজের উপাস্যের রূপ – সাকার মূর্তি। আত্মা আর চিন্ময় মূর্তি পৃথক বস্তু নয়। এই শ্যামারূপ বা শ্যামরূপ চিন্ময় মূর্তি, আত্মায় পরিবর্তিত হন।

২২৫। **“..........কাছে দেখ, কোন রং নাই।”**

নির্গুণ।

২২৬। **“এ সহজ পথ।”**

সহজাত – সঙ্গে জন্মেছে – আপনা আপনি হয় – স্বয়ম্ভু।

২২৭। **“এই দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।”**

হরিপাদপদ্ম ষষ্ঠভূমিতে আছে – দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়ে থাকা – ষষ্ঠভূমি আর পঞ্চমভূমিতে বাচ্ খেলিয়ে জীবন কাটানো।

২২৮। **“অনন্তকে জানার দরকারই বা কি।”**

“গঙ্গাস্নান করতে হবে বলে– গঙ্গোত্রী থেকে সাগরতীর্থ পর্যন্ত স্নান করে ভাসতে ভাসতে আসতে হবে তা নয়,– যে কোন এক জায়গায় স্নান করলেই হ’ল।”

২২৯। **“বিষয় বুদ্ধির – কামিনী কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে...।”**

দেহের একটি তন্তুও যদি কোনরকমে মলিন, বিষাদগ্রস্ত বা ছিন্ন হয়, – কিম্বা ক্রিয়াশীল ও সতেজ না হয় – তাহলে আত্মা সঙ্কলিত হবে না – ষোল আনা হবে না। ষোল আনা না দিলে, ষোল আনা হয় না – ষোল আনা দেহ, মন, প্রাণ, চিত্ত। ষোল আনা দেহ – ২৪ থেকে ২৫ বছর বয়স – আর সত্যিকারের বলিষ্ঠ হওয়া চাই। আবার ষোল আনা পূর্ণাঙ্গ সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা চাই – ১২/১৩ বছরের মধ্যে। সচ্চিদানন্দগুরু

*পি.আর.এস - প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার । এম.এ. পাশ করার পর এই পরীক্ষায় বসা যেত।

সম্পূর্ণ রাজযোগ শিক্ষা দেবেন। সেই সমস্ত রাজযোগ দেহের অন্তরে ধারণা হবে, আবার দেহ ভেদ করে ফুটবে – লক্ষণ দেখা যাবে। পঞ্চকোষের বেদের সাধন – আপনা হতে দেহের মধ্যে হবে।

২৩০। "........জ্ঞান হয় না।"

আত্মা সাক্ষাৎকার ও 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা' – এই জ্ঞান– বিজ্ঞানময় কোষ।

২৩১। "এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।"

"কলিতে অন্নগত প্রাণ" – দুর্বল শরীর – ক্ষীণজীবী। এই দুর্বল শরীরে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না।

২৩২। "মনের পঞ্চমভূমি কন্ঠ। মন যার কন্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।"

এটি হল পঞ্চমভূমির ব্যবহারিক লক্ষণ। অনুভূতি হল – অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। তাই সচ্চিদানন্দ প্রথমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করলেন।

২৩৩। "মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়।"

নানাবিধ ঈশ্বরীয় মূর্তি – এসব অনুভূতি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটির। অবতারের অন্যরকম, – প্রথমে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন – জ্ঞানচক্ষুর মধ্যে সপ্তমভূমির অনুভূতির প্রতীক জ্ঞানমূর্তি বুদ্ধ। তারপর রহস্যময়ী, স্নিগ্ধা, ধীরা, নৃত্যপরা, কৃশাঙ্গী, অপূর্ব লাবণ্যময়ী মায়ামূর্তি। তারপর দেবদেবীর মূর্তি। এরপর জ্যোতিদর্শন। এই জ্যোতিদর্শনেও ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধের সঙ্গে অবতারের অনেক প্রভেদ। ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ লন্ঠনের ভিতর আলো – জ্যোতি দেখেন আবার কেউ বালবের ভিতর দেখেন, আবার কেউ লন্ঠন ও বাল্‌ব দুয়ের মধ্যেই জ্যোতি দেখেন। এরপর তাঁরা আবরণহীন জ্যোতি দেখেন – কিন্তু এসব ষষ্ঠভূমি থেকে। অবতার দর্শন করেন – রেশমের পর্দা ঝুলছে – তার ওপাশে সূর্য।

২৩৪। "ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।"

আত্মা সাক্ষাৎকার। এই আত্মা সাক্ষাৎকারের পর নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটির দেহ থাকে না। তাই স্বামীজির জ্ঞানের ঘরে – সপ্তমভূমিতে – ঠাকুর চাবি দিয়েছিলেন। অবতারের আত্মা সাক্ষাৎকারের পরও দেহ থাকে। আত্মা কৃপা ক'রে সাধন করবেন। মায়ার রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ হবে – ভগবান নিজের রস নিজে আস্বাদন করবেন – নরদেহে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করবেন – আর নিকষা সেই লীলা দেখবে।

২৩৫। **"যাই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল।"**
সমাধি। দেহের সমস্ত শক্তি ব্রহ্মে পরিণত হলো - তখন ব্রহ্মানন্দ।

২৩৬। **"ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম থাকে না।"**
মায়ার রহস্য ভেদ হয়েছে – মায়ার খেলা আর খেলে না।

২৩৭। **".....নিতাই আমার মাতা হাতি – নিতাই আমার মাতা হাতি।"**
নিম্নাঙ্গের সাধন – দধি মন্থন হচ্ছে।

২৩৮। **"হাতি, হাতি! তারপর কেবল হাতি।"**
পঞ্চমভূমি ও ষষ্ঠভূমির মধ্যে বাচ্ খেলানো।

২৩৯। **"শেষে "হা"...."**
ষষ্ঠভূমির দ্বারদেশ।

২৪০। **"........চুপ হয়ে যায়।"**
সমাধিস্থ।

২৪১। **"ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রথমে খুব হৈ চৈ।"**
বৈধী ভক্তি।

২৪২। **".......পাতা সম্মুখে করে বসলো।"**
স্থির হলে – কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

২৪৩। **"লুচি আন, লুচি আন...."**
পূর্ণ ব্যাকুলতা।

২৪৪। **"......লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে।"**
নানা রকম অনুভূতি।

২৪৫। **".....বার আনা শব্দ কমে গেছে।"**
দেহ থেকে বার আনা আত্মা নিঃসৃত হয়েছে। "সাধুর মন বার আনা ঈশ্বরে।"

২৪৬। **"দই এল......"**
সহস্রার দর্শন।

২৪৭। **"নিদ্রা..."**
সমাধি।

২৪৮। **"গৃহস্থের বৌ....."**
ভাগবতী তনু।

২৪৯। **"অন্তঃসত্ত্বা..."**
আত্মা সংকলন।

২৫০। **"শাশুড়ী...."**

দেহ।

২৫১। "কর্ম কমিয়ে দেয়।"

মন আত্মস্থ হয় আর বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক চলে যায়। "বিষয় রস আলুনি লাগে।"

২৫২। "দশ মাসে....."

ষষ্ঠভূমির দ্বারদেশ – জ্যোতিদর্শন– রেশমের পর্দার আড়ালে সূর্য।

২৫৩। "ছেলে...."

আত্মা।

২৫৪। "ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে।"

আত্মার সাধন।

২৫৫। "ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা সব করে।"

'আমি খাবো, থাকবো, ঘুমুবো।'

শাশুড়ী - স্থূল। ননদ – সূক্ষ্ম। জা – কারণ।

২৫৬। "কূপ খোঁড়া হয়ে গেল।"

কূপে সচ্চিদানন্দ বারি। বারি বাষ্প হয়। তখন দেহভেদ ও নাদভেদ। দেহভেদ ও নাদভেদের যৌগিক লক্ষণ দেহেতে প্রকাশ পায়।

দেহভেদ–দেহ ও আত্মা আলাদা হওয়া– হ্লাদিনী ভেদ করে মহাবায়ু সন্ধিনী আশ্রয় করে – মাথাটিকে ডাইনে ও বাঁয়ে দোলাতে থাকে, আর খট্ খট্ শব্দ হতে থাকে। সে শব্দ অপরে শুনতে পায় – 'খোড়ো নারকেল', 'শুকনো সুপারি।'

নাদভেদ – দেহভেদের লক্ষণের পরই যদি নাদভেদ হয়ে থাকে – মাথাটি সামনে ও পিছনে নড়্ নড়্ করে নড়তে থাকে ঠিক যেন 'টাপুর, টুপুর' উঠছে, ডুবছে– তারপর ডুবে যায় – সমাধিস্থ। আর সকলকার চেয়ে মজা হলো – যাঁর এসব দেহে ধারণা হয়েছে – তাঁর সামনে এসব কথা বললে, তদ্দণ্ডে দেহেতে প্রকাশ পাবে – দেখতে পাওয়া যাবে। ব্রহ্মবিদ্যা – নিত্য, শাশ্বত।

"তদবধি নিত্যলীলা করেন গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

গোপন করবার উপায় নেই – দেহেতে ভগবান লীলা করছেন।

২৫৭। "পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন? – 'হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ', এই সব?"

বাইরে মন পড়ে রয়েছে – ঈশ্বরে যোগযুক্ত নয়। বক্তা নিজে নিজের অবস্থা

জানিয়ে দিচ্ছেন। ‘মুলো খেলে মুলোর ঢেকুর ওঠে’।

২৫৮। **“তাই বলি, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাঁকেই লোকে চায়, তাঁর বাড়ি কোথায়, ক’খানা বাড়ি, কটা বাগান, কত ধনজন, দাসদাসী – এ খবরে কাজ কি?”**

হঠাৎসিদ্ধের কথা। হঠাৎ কেউ সিদ্ধ হয়েছেন – ভগবানকে নিজের ভিতর পেয়েছেন – ভগবানকে নিয়েই উন্মত্ত – ভগবানের কোন ঐশ্বর্যের কথা তখন মনে থাকে না। গোপালের মার গোপাল। কামারহাটির বামনী (চিরপ্রণম্য মনুষ্যজাতির) গোপালকে নিয়ে উন্মত্ত। ঠাকুর রামলালাকে নিয়ে সর্বক্ষণ পাগল।

২৫৯। **“ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন।”**

ডাঙা দিয়ে ডিঙে চলে – সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায়।

‘ডাঙা’ – দেহ।

‘ডিঙে’ – কুণ্ডলিনী।

কুণ্ডলিনী দেহ ভেদ করে সচ্চিদানন্দ সাগরে – সহস্রারে গিয়ে পড়েছে। এসব দেখতে পাওয়া যায় – তা নইলে বুঝতে পারা যায় না। সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করে দেখিয়ে দেন – শিক্ষা দেন। *

২৬০। **“নিকষা বললে,– রাম, এতদিন বেঁচে আছি বলে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে।”**

‘নিকষা’– ‘নিকষিত হেম’ শরীর – চিন্ময় দেহ। ভক্তের চিন্ময় দেহ।

সেই শরীরে ‘মানুষ-রতন’ লীলা করেন – ভক্ত তাই দেখেন। লীলা অনন্ত – তাই ভক্তের বাঁচবার সাধ – শুধু লীলা দেখবে বলে।

২৬১। **“ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।”**

‘এক সের ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না।’

ভগবানের সব ঐশ্বর্য দেহেতে ফোটে না। তিনি কৃপা করে যতটুকু ফোটান – ততটুকু।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রীমন্দির - দক্ষিণেশ্বর

২৬২। **“..........শেষ জন্ম।”**

মহাকারণে লয় হওয়া। এটি হলো তন্ত্রের সাধন।

“তাঁর যদি দরকার হয় তবে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেন।”

ব্রহ্মজ্ঞান দেহেতে ধারণা হতে গেলে – বেদমতে পঞ্চকোষের সাধন হওয়া

---

* ডিঙে দেখা যায় – দূরে ডাঙায় রয়েছে। চক্ষের পলকে সে ডিঙে ডাঙার উপর দিয়েই কাছে এসে হাজির হয়।

চাই। এখানে দেহটি গিয়েছে – তাহলে আর দরকার ছিল না দেহের।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়ে বেঁচে থাকেন। এখানে জীবন্মুক্ত নয়, শুধু মুক্ত।

২৬৩। "জোট্ পাট্ হয়েছে......"

এই হলো যোগাযোগ। পূর্বজন্মের* সংস্কার আর ভগবানের কৃপায় এই যোগাযোগ হয়! বেদান্ত বিচারে – ত্রিকালের অনুভূতিতে – কাল সম্বন্ধে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ দেখায় তখন বুঝতে পারা যায় – সব হয়েই আছে (Predestined)। যাঁর জীবনে যা যোগাযোগ আছে, হবেই – সে আগে থাকতে হয়ে আছে।

ঠাকুরের ইচ্ছা হলো একটি তুলসি কাননের। কিছু জোগাড় নেই। ভেসে এল গঙ্গার জলে– তাড়া বাঁধা বাখারি, দড়ি , মায় কাটারি পর্যন্ত। ভর্তৃহরি, বাগানের মালী, নাচতে নাচতে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললে, 'সব পাওয়া গেছে'। তৈরি হয়ে গেল তুলসী কানন।

শ্রীমন্দির তৈরি হলো দক্ষিণেশ্বরে – ঠাকুর থাকবেন আর হরিকথা বলবেন।

ঠাকুরের চৌষট্টিখানি তন্ত্রের সাধন হবে– ভৈরবী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এসে হাজির।

পুরী মহারাজের আগমনও– সেই এক কারণ। এইগুলি হলো যোগাযোগ– 'জোট্পাট্'।

২৬৪। "যখন সোনার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে ভেঙে ফেলতেও পারে"।

'সোনার প্রতিমা' – কারণ শরীর। কারণ শরীরের দু'টি রূপ। প্রথম -ভাগবতী তনু, দ্বিতীয়-আত্মা। এই ভাগবতী তনু ইষ্টমূর্তি ধারণ ক'রে, দেহ থেকে বেরিয়ে – অবশ্য সাধক জানেন না যে তাঁরই দেহ থেকে এই ইষ্টমূর্তি বেরিয়েছে – সাধকের সামনে আসেন, কথা কন। সাধক মনে করেন তাঁর ইষ্ট বাইরে থেকে এসেছেন।

আত্মা সাক্ষাৎকার হয় সহস্রারে– সচ্চিদানন্দগুরু কথা কন আর দেখিয়ে দেন। এই আত্মাসাক্ষাৎকারের পর ভগবানের যদি দরকার হয়, তাহলে দেহ রেখে দেন – তা না হ'লে সাধক মহাকারণে লয় হয়ে যান– বড় জোর একুশ দিন দেহটি থাকে।

২৬৫। "তাই কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর, ভগবান লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সেরকম শরীর ত্যাগ, অনেক দূরের কথা"।

'জ্ঞানলাভ'– এখানে আত্মা সাক্ষাৎকার, 'আমি আত্মা' – এই জ্ঞান।

'ভগবান লাভ' – এখানে বিশ্বরূপ দর্শন। আমি আত্মা– আত্মার মধ্যে জগৎ–

---

*পূর্বপুরুষের

আমার মধ্যে জগৎ।

এসব 'কোটিতে গুটি' – অতএব শরীর ত্যাগের কথা ওঠে না। যাঁর জ্ঞানলাভ, ভগবান্ লাভ হয়– সে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় – ঈশ্বরের দরকার তাই হয়– দেহ যাবার বা শরীর ত্যাগের জন্য নয়।

২৬৬। "....চৈতন্য হয় না।"

এদের দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হয় না।

২৬৭। "আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া।"

দেহেতে কখনও ঈশ্বরীয় আনন্দের আস্বাদন পায় না– কেবল হাড়-মাসের বোঝা নিয়ে বেড়ায়।

২৬৮। "যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, মরে যাবে।"

সাধুসঙ্গ এরা সহ্য করতে পারে না – হরিকথা হ'লে সেখান থেকে পালায়।

ঠাকুরের ঘরে– দক্ষিণেশ্বরে– একটি লোক এসে বসেছিল। খানিকক্ষণ পরে, সে লোকটি আপনা-আপনি বলছে–'যাই, ছেলের চাঁদ মুখটি গিয়ে দেখিগে।' ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বেরো শালা, এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদ মুখ না দেখে, ছেলের চাঁদ মুখ! বেরো শালা।"*

২৬৯। "ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে...."

বিবিদিষার এ বৈরাগ্য,– তবুও ঈশ্বরের কৃপা না হলে এ বৈরাগ্য হয় না।

যেখানে 'পাতাল ফোঁড়া শিব'– সেখানে আপনা হতে সব ত্যাগ হয়ে যায়। দেহ ভোগ গ্রহণ করতে চায় না। 'পাতাল-ফোঁড়া শিবের' যত স্ফুরণ হতে থাকে – অন্তরে, দেহের তত পরিবর্তন হতে থাকে – ব্যবহারিক জীবনে তার লক্ষণ পাওয়া যায়। ঠাকুরের হাত বেঁকে যেত টাকা ছুঁলে– মেয়েছেলে সামনে এলে চোখে জাল পড়ে যেত – অন্ধকার দেখতেন কিম্বা সমাধি হতো।

২৭০। "অনাবৃষ্টি হয়েছে..."

কৃপাবৃষ্টি হয়নি। যদি কেউ আত্মিক স্বপ্নে বৃষ্টি হতে দেখেন – জানবেন সে ভগবানের কৃপাবৃষ্টি বরিষণ। 'বৃষ্টি'– ঈশ্বর-কৃপার প্রতীক।

২৭১। "চাষারা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে।"

এঁরা সব বিবিদিষাপন্থী।

২৭২। "যতক্ষণ না খানার সঙ্গে নদী এক হয়.."

---

* 'পোকা'– জীব– লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে মন আবদ্ধ। 'ভাতের হাঁড়ি'– সহস্রার। যদি জীবকটি লোকের মন কখন সহস্রারে যায় একুশ দিনের মধ্যে সে মারা যাবে।

কুণ্ডলিনী যতক্ষণ না সহস্রারে গিয়ে মেশে।

২৭৩। **"মেয়ে ও স্ত্রী...."**
মহামায়ার মূর্তি। 'স্ত্রী' – মোহিনী – অবিদ্যামায়ার প্রতীক।
'মেয়ে' – কোমলতা– বিদ্যামায়ার প্রতীক।

২৭৪। **"চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া কল্লে।"**
মহামায়াকে তাড়িয়ে দিলে।

২৭৫। **"খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে।"**
কুণ্ডলিনী সহস্রারে গিয়ে মিলিত হলো।

২৭৬। **"নেয়ে খেয়ে..."**
নানাবিধ অনুভূতির পর।

২৭৭। **"নিদ্রা........."**
সমাধি।

২৭৮। **"কামিনীকাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে।"**
দৃষ্টি কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ করে রাখে। দৃষ্টি যোগযুক্ত হবার যন্ত্র। যে দৃষ্টি ভগবানে যুক্ত হয়ে থাকা উচিত, সে দৃষ্টি কামিনীতে আবদ্ধ–ঈশ্বরেতে যোগ নেই। নারীর দেহের এ-রকম গঠন, দৃষ্টিমাত্রেই যোগবিচ্যুতি ঘটায়। তাই "সন্ন্যাসী নারীর ছবি হেরবে না।" আবার "মেয়েছেলে সামনে রেখে ধ্যান হয় না।" নারীর আকর্ষণে চিত্ত স্থির হয় না – অজ্ঞাতসারে চাঞ্চল্য আনে। মনকে যোগযুক্ত হতে দেয় না– "দুধ নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না"। কাঞ্চন – শুধু সাধারণভাবে পেটচলা পর্যন্ত – তা নইলে বিপর্যয়। সৎপথে থেকে নিজের পেটচলা পর্যন্ত উপার্জন। 'বাপে ধরেছে' যাঁকে, তাঁকে এসব চেষ্টা করে করতে হয় না। আপনা হতেই হয়। 'বাপে ধরেছে' – তার কিন্তু ব্যবহারিক লক্ষণ আছে দুটি, – নারীসঙ্গ কিছুতেই তিনি সহ্য করবেন না– মেয়েছেলের কাছ থেকে সর্বদাই দূরে। আর অপরের কিছু দান গ্রহণ করবেন না। "কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার।" "মেয়ে সব দিল খেয়ে।" মহামায়া অভাবের সৃজন করেন – অভাব কাঞ্চন অন্বেষণ করায়।

২৭৯। **"ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান করতে করতে সমাধি হলো। কখন জোয়ার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে হুঁস নাই। আবার ভাঁটা পড়েছে, তবু হুঁস নাই।"**
হঠযোগের সমাধি। এ সমাধিতে সচ্চিদানন্দ হওয়া যায় না, বা জড় সমাধিও হয় না। "বেদে রাজযোগ, হঠযোগ নয়।"

২৮০। **"মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না।"**

নারী সত্তা হরণ করে নেয়। নর ও নারীর দেহের গঠন এ-রকম – উভয়ের কথার স্বর কিম্বা দৃষ্টি শরীরের ওপর ক্রিয়া করে, তদ্দণ্ডেই যোগবিচ্যুতি ঘটায়। "সাধু সাবধান! কামিনী কাঞ্চন।"

কাশীপুরের বাগান। ঠাকুরের কাছে একটি ছোকরাকে এনেছিল – তার বাড়ির লোকেরা। ছোকরাটি ভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা। ঠাকুর বললেন, "এর হঠাৎ মধুরভাব হয়েছে – এখানে রেখে যাও। মেয়েছেলে ছুঁলে এর এ ভাব থাকবে না।" তারা কিন্তু ছেলেটিকে বাড়িতে নিয়ে গেল। ঠাকুর লোকচক্ষুর অন্তরালে যাবার পর, একজন মহারাজ (পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ) সে ছেলেটির খোঁজ করতে গিয়েছিলেন। ছেলেটির সে ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। নারীর গায়ের হাওয়ায় সমস্ত উবে যায়।

২৮১। **"তাহলে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না।"**

দেহেতে ভগবান প্রকাশ পেয়েছেন। দেহের ভিতরকার অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। সেই সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। "আমি মেয়েকে বাঘের মতন দেখি।"

২৮২। **"ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর।"**

এই হলো বিদ্বৎ। "বাপে ধরলে সে ছেলের পড়বার ভয় থাকে না।"

২৮৩। **"তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা বলে তাই সকলকে পূজা করেন।"**

এ সবই ঠিক – তবে ঐ দূর থেকে পূজা। "যখন দেখি মেয়েরা ঘরে বসে আছে, নড়তে চাইছে না, তখন নিজেই বাইরে চলে যাই।"

২৮৪। **"তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে।"**

ভগবান ভক্তকে চান – ঈশ্বরীয় কথা হবে। ভক্ত না হলে, ঈশ্বরীয় কথা স্ফুরণ হয় না। মানুষের দেহ না হলে, আত্মা প্রকাশ পান না।

২৮৫। **"ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।"**

"মা দেখিয়ে দিলেন, আমার অনেক ভক্ত আছে।"

এ রকম দর্শনের পরও শুদ্ধসত্ত্বগুণী ভক্ত চুপচাপ থাকে। ঈশ্বরের জগৎ– এখানে গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে নড়ে না। এই অবস্থায় ভগবান অপর ভক্তের অন্তরে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে উদয় হয়ে ভক্তকে আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেন। এই হলো 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' আদেশ। ঠাকুর কৃপা করে এই নতুন অবস্থাটি জানিয়েছেন, দেখিয়েছেন, বুঝিয়েছেন।

২৮৬। **"শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিশ টাঙিয়ে দিলে...."**

সচ্চিদানন্দ – গুরুজনের মূর্তি ধারণ করেন আর 'দলিলে' লিখে দেন ও

দেখান। আত্মা বাক্যরূপে মাথায় ফুটে ওঠেন – এত গভীর ও গাঢ় যে দ্রষ্টা মনে প্রাণে বুঝতে পারেন – এ তাঁকে দিয়ে করাবেই।*

২৮৭। **“ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্যের এমন কঠিন কাজ করতে পারে না!”**

‘মানুষ রতন’ হয়ে ভগবান দেহেতে অবতীর্ণ না হলে, আচার্য হওয়া যায় না। তখন দেখতে পাওয়া যায় ভগবান্ ভিতরে থেকে সব করছেন। “মা, আমি বলছি, না, তুমি বলছ।”

২৮৮। **“মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে।”**

“ঈশ্বর যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন, – তবে মুক্তি।”

২৮৯। **“যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন।”**

‘ভুবনমোহিনী মায়া’ – দেহই ‘আমি’। এই ‘আমি’ – ভাগবতী তনু – ইষ্ট – আত্মা, বিশ্বরূপ, বীজ, স্বপ্ন, বোধহীন শূন্য, ‘আমি-না’, ‘তুমি’ – তবে মুক্ত – জীবন্মুক্ত – তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ। ভগবান্ দেহের মধ্যে লীলা করে তাঁর স্বরূপ দেখান – ‘আমি’র স্বরূপ।

২৯০। **“সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই।”**

সচ্চিদানন্দগুরু নির্গুণ থেকে নিগমে নেমে আসেন – আর সেই গুরুর দেহে সূক্ষ্মভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ, – তা নইলে কুণ্ডলিনী জাগেন না – আর ঊর্ধ্বগতি লাভ হয় না। কুণ্ডলিনীর দেহ ফুঁড়ে (কপিবৎ) জাগরণ – সে অনেক দূরের কথা।

২৯১। **“যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই.....”**

যারা আত্মা সাক্ষাৎকার ও সচ্চিদানন্দ লাভ করে নি।

২৯২। **“.....তাঁর আদেশ পায় নাই।”**

বাক্যরূপে আত্মিক স্ফুরণ হবে ও অপরকে দেখিয়ে দেবে আচার্যের সচ্চিদানন্দগুরুরূপ। এই গুরুরূপ ‘অজানা’– তিনি এই রূপ আগে কখনও দেখেন নি।

“যদি কখনও আমায় স্বপ্নে উপদেশ দিতে দেখ, জানবে সে সচ্চিদানন্দ।” এ হলো ‘আসতে যেতে উদ্দীপন’ – অনেক নিম্নস্তরের সচ্চিদানন্দগুরু লাভ।

২৯৩। **“ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই।”**

‘মানুষ রতন’ লাভ হয় নি।

২৯৪। **“যদি সদ্গুরু হয়.........”**

---

* আচার্যের কাজ।

সচ্চিদানন্দগুরুই সদ্‌গুরু। সৎ – অস্তি – আছেন। এই 'সৎ' গুরু রূপ ধারণ করে দেহীর দেহে উদয় হন। একেই বলে – সচ্চিদানন্দগুরু লাভ।

২৯৫। **"জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে।"**

তিনটি অনুভূতি - ইষ্ট সাক্ষাৎকার, ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্‌ আর মহাকারণে লয় হওয়া। এটি হলো তন্ত্রের।

বেদমতে 'তিন ডাক' – জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা।

জ্ঞান – সচ্চিদানন্দগুরু। জ্ঞেয়– আত্মা। জ্ঞাতা – বোধ।

আত্মা সাক্ষাৎকার।

২৯৬। **"কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।"**

"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না।" মানুষগুরু করলে সে মুক্ত হয় না। 'শিল খেকো আব'– ঠাকুরকে দেওয়া যায় না – আর নিজের খেতেও সন্দেহ হয়।

২৯৭। **"জীবের অহংকারই মায়া।"**

'জীব' – দেহ।

'অহংকার' – আমি বোধ। অবিদ্যার ঐশ্বর্যকে নিজের স্বরূপজ্ঞান।

'মায়া'– আছে, আছে-নাই, নাই, নাই-আছে।

মায়ার চারটি অবস্থা।

'আছে' – যা কিছু দেখছি সমস্তই সত্য।

'আছে-নাই' – সগুণ অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তন। পঞ্চকোষের সাধন দেহেতে হচ্ছে – সাধক দেখছেন – তাঁর স্থূল দেহ থেকে তিনি প্রাণময় কোষে পরিবর্তিত হয়েছেন; আবার প্রাণময় কোষ মনোময় কোষে পরিবর্তিত; মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ হয়েছে, – নিজেকে দেখলেন অর্ধনারী ও অর্ধপুরুষ; সেও উপে গেল, – রহস্যময়ী অদ্ভুত নারীমূর্তি, নৃত্যপরা, অপূর্ব সে মূর্তি – বিস্ময় ও হর্ষে অভিভূত হয়ে তিনি দেখছেন – উপে গেল। রেশমের পাতলা পরদা ঝোলানো রয়েছে – তার পিছনে সূর্য। জ্যোৎস্না – অতি স্নিগ্ধ, দাঁড়িয়ে সচ্চিদানন্দগুরু, কথা কয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন – 'এই ভগবান! এই ভগবান দর্শন!' মিলিয়ে গেল গুরুমূর্তি – রইল আত্মা। সে আত্মাও ধানের শীষের গোছার মতন লম্বা হয়ে গেল – শেষে মিলিয়ে গেল। দ্রষ্টা আত্মার ভিতর থেকেই সমস্ত দেখছেন। ফিরে এল তাঁর জৈবী সংবিৎ। তিনি এসব তাঁর মাথার ভিতর দেখেছেন – ষোল আনা আছে মনে। এরপর বার বছর চার মাস ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্‌ কাটে। এই ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্‌ কাটবার সময় – কাল ও স্থান নেই – এই অনুভূতি হয়। আবার ভগবান দেহেতে – এ অনুভূতি দৃঢ়তর হয়। তিনি মূর্তি ধারণ করে দেহ থেকে

বাইরে আসেন আবার ভিতরে ঢোকেন। ভক্ত চোখ চেয়ে দেখেন। 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা (সগুণ)' – এ বোধ হয়। তারপর বিশ্বরূপ দর্শন– আত্মার মধ্যে এই বিরাট বিশ্ব। আবার সেই বিরাট বিশ্ব বীজে পরিণত হলো। বীজ – স্বপ্নে পরিণত। স্বপ্নও নেই। কী আছে? সংবিৎ ছিল না– কে বলবে, আর কি বলবে? সংবিৎ ছিল না, অতএব কিছুই জানি না। 'আমি' ছিল না – 'আমি—না',– তত্ত্বজ্ঞানে ফিরে 'আমি-না' – এটি হলো জীবন্মুক্ত অবস্থা। এ সমস্ত হলো, তবু দেহটি ঠিক আছে– তাই মায়া – 'আছে-নাই'।

'নাই'– নির্গুণ – কিছু জানি না, তাই কিছু বলবার জো নেই। 'আমি' ছিল না – কে বলবে?

'নাই-আছে' – 'আমি-না' – আমি অকর্তা – 'তুমি কর্তা'।

এই 'তুমি' – হলো অস্তিজ্ঞান মাত্র। এটিকে তত্ত্বজ্ঞানের অস্তি বলে – অর্থাৎ 'তুমি' 'তুমি' – তত্ত্বজ্ঞান। এর পরে অবতারতত্ত্ব। তবে বেদান্তবাদীদের মতে – অর্থাৎ আগমে মায়া মানে – নেই– কিছু নেই – সমস্ত সগুণ অবস্থাই মায়া – কারণ তিনি 'অজ'। যিনি জন্মান নি – তাঁর জীবন-মৃত্যুর কথাই ওঠে না। বেদান্তবাদীরা 'নাই- আছে' জানে না। 'যার যা পেটে সয়'।

২৯৮। "এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে।"

স্বস্বরূপকে প্রকাশ পেতে দেয় না। "ভাঁড়ারে একজন কর্তা থাকলে, আসল কর্তা আর আসে না।"

২৯৯। "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

নির্গুণে স্থিত সমাধি।

৩০০। "সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না।"

সপ্তমভূমির প্রবেশদ্বার – পাতলা রেশমের চাদর ঝুলছে – চাদরের পিছনে সূর্য।

৩০১। "মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়।"

পাতলা চাদর সরে গেছে – আত্মা সাক্ষাৎকার হল।

৩০২। "যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।"

'আমি আত্মা' – এই জ্ঞান হওয়া আর আত্মার মধ্যে জগৎকে দেখা – 'আমার মধ্যে জগৎ'। ঈশ্বর – ভগবান – এই জগৎরূপে প্রকাশ হয়েছেন দেহের ভিতরে আত্মায়– আমি এখন ভিতরে। আমি যখন বাইরে, তখনও সামনে জগৎ – ঈশ্বর – ভগবান। ভগবান ও জগৎ এক (identical)।

৩০৩। "ভগবান সকলের চেয়ে কাছে।"

দেহের মধ্যে ভগবান – "ওহি রাম সব্‌সে নিয়ারা।"

৩০৪। **"এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়।"**

অবিদ্যার ঐশ্বর্যও অনন্ত – অবিদ্যাও ভগবানের আর একটি রূপ।*

৩০৫। **"তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল, আর বললে, 'তোর এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙিয়ে যাস'!"**

অর্থ অজ্ঞান করে রাখে।**

৩০৬। **"লন্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না, ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না।"**

ষষ্ঠভূমি থেকে এই দর্শন হয় – এঁদের আত্মা সাক্ষাৎকার হয় না। তবে এ কোষ বদ্ধ থাকলেও এঁরা উঁচু অবস্থা প্রাপ্ত হন। পূর্ণাঙ্গ সাধন – ষোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হলে আত্মা সাক্ষাৎকার হয় না। ছেলে বয়সে ১২/১৩ বছরে যদি সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করেন, তবে পূর্ণাঙ্গ সাধন। "সূর্য ওঠবার আগে মাখন তুলতে হয়, তা নইলে সব মাখন ওঠে না।"

৩০৭। **"জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই 'আমি' মাঝখানে আছে বলে।"**

জীব, আত্মা, আমি – তিনটি যেন আলাদা বস্তু। না, তা নয়। শুধু বোঝাবার জন্য ভাগ দেখানো হয়েছে। জীব, অহং নাশের পর আত্মায় পরিণত হন। 'আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।'

৩০৮। **"দুই একটি লোকের সমাধি হয়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না।"**

'দুই' কথাটি এখানে মাত্রা মাত্র। একটি যুগে একটি মাত্র লোকের হয় – তিনি হলেন ঠাকুর।***

৩০৯। **"একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। 'হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস', এইভাবে থাকো। 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত' এরূপ আমিতে দোষ নাই; মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।"**

এ আমি অবতারতত্ত্বের 'আমি' নয়, তত্ত্বজ্ঞানের 'আমি' নয় পাকা ভক্তির

---

* কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, 'বিদ্যা ও অবিদ্যা'। স্বামীজী বললেন, সবই বিদ্যা'। ঠাকুর তখন বললেন, "ওটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়।"

** অর্থ অহংকার বাড়ায়। 'ব্যাঙ' – অহংকার। 'হাতী' – মন। মন যখন অহংকারকে অতিক্রম করে শুদ্ধমন হতে চায় তখন অহংকার বাধা দেয়। "শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ আত্মাও তা"।

*** ঠাকুরের এই অবস্থা হল দেহাভ্যন্তরীণ অহং নাশের অবস্থা, Esoteric Condition। জগতের অসংখ্য নরনারী যখন একটি লোককে অন্তরে দর্শন করে সেই কথা প্রকাশ করে তখন বুঝতে হবে সেই লোকটির 'অহং' নাশ হয়েছে ।এই জগদ্‌-ব্যাপী না হলে প্রকৃত অহংনাশ হয় না।

'আমি' নয়– এ হলো ষষ্ঠভূমির 'আমি'- হরিপাদপদ্মে লগ্ন হয়ে থাকা।

৩১০। **"ভক্তিপথ সহজ পথ।"**

'সহজ'– সহজাত – সঙ্গে নিয়ে এসেছে – আপনা-আপনি হয় – স্বয়ম্ভু; আবার স্বয়ংবেদ্য – হচ্ছে জানতে পারা যায়।

৩১১। **"ভগবানকে লাভ করবে......."**

যতটুকু হবার ততটুকু হবে – এক আনা, দু আনা, চার আনা ইত্যাদি। প্রকৃত ভগবান লাভ হলো – জগৎ-ব্যাপী হওয়া।

৩১২। **"বালকের আমি....."**

এখানে পরমহংস অবস্থার 'আমি'। এ পাকা ভক্তির অবস্থা – জীবন্মুক্ত অবস্থার পর তত্ত্বজ্ঞানের 'আমি'।

৩১৩। **"হাঁ, 'দাস আমি' অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত, এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়।"**

সাধন অবস্থার 'আমি', দেহেতে ভক্তি সঞ্চার হচ্ছে সেই সময়ের 'আমি' – সত্ত্বের ' আমি'। 'ত্রিগুণাতীত আমি' বা 'তত্ত্বজ্ঞানের আমি' নয়।

৩১৪। **"যদি ঈশ্বর লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট করতে পারে না।"**

"ত্রিগুণাতীত আমি", "তত্ত্বজ্ঞানের আমি" – এ আমিতে জৈবীভাব কিছু থাকে না।

৩১৫। **"পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হয়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারো হিংসা করে না।"**

নির্গুণ ব্রহ্মে লয় হওয়া, তারপর তত্ত্বজ্ঞান ও অবতারতত্ত্বে ফিরে এসে দেহ চিন্ময় হয়। 'চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম', – 'সাধুর দেহ চিন্ময়', – সে দেহে জীবত্বের লক্ষণ থাকে না – শিবত্বের প্রকাশ। সচ্চিদানন্দ ফুটে ওঠে, দেহের যৌগিক ঐশ্বর্যে – যেমন ঠাকুরের সমাধি অবস্থার ছবিতে দেখা যায়।

৩১৬। **"বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই।"**

বালকের ত্রিগুণাতীত 'আমি'। ঠাকুরকে বলতে হতো, "মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে।"

ঠাকুরের যুগ। ধারা নতুন। কারো যদি বালকের অবস্থা হয়, সেটি অপরকে দেখিয়ে দেবে। যাঁর বালকের অবস্থা হয়েছে, তাঁকে মুখে বলতে হবে না। যাঁর বালকের অবস্থা হয়েছে, তাঁর বৌমা দেখছেন,– ৫২ বছরের বৃদ্ধ শিশুটি হয়ে গেছে – ন্যাংটা,

দুহাত তুলে নৃত্য করছে। ঐ যে ঠাকুরের কথা, "তুই মনে ভাবলে নয় – তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বলবেন – তবে জানবি।" তুমি সাক্ষাৎকার করলে, ভগবান বললেন, কিন্তু সেকথা তোমাকেই বলতে হবে। তোমার নিজের কথা তুমি বলবে, সেকথা অপরে নেবে না– 'তোমার কথা নেবে কে?' অপরে তোমার অবস্থা দর্শন করবে, তবে বলবে – সে কথার ঢের বেশি জোর। ঠাকুরের যুগে এই নতুন ধারা।

৩১৭। **"তাই জাতি বিচার নাই...."**

'বালকের ঘৃণা নাই, শুচি অশুচি বোধ নাই' – অষ্টপাশ খুলে যায়। অষ্টপাশ গিয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায়। সচ্চিদানন্দগুরু আসেন, ভক্তের হাতে তীক্ষ্ণ খাঁড়া দেন, সেই খাঁড়ায় কটিদেশের দড়ির (nerves) বাঁধন কাটেন। সেই সময় কটিদেশে ও সহস্রারে কী যেন একটা পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে পারা যায়।

৩১৮। **"কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভক্তের আমি' 'দাস আমি' নিয়ে থাকে।"**

এটি হলো তত্ত্বজ্ঞানের 'আমি'।

৩১৯। **"ঈশ্বরলাভের পরও থাকে, সব 'আমি' যায় না।"**

এই হ'ল অবতারতত্ত্বের 'আমি' – ভিতরে 'মানুষ রতন'কে দেখছেন – 'মানুষ রতন' হরিনাম করছেন।

৩২০। **"আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়।"**

সাধকের 'আমি'।*

৩২১। **"ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।"**

'ভক্তির পথ' – সহজ – সহজাত – আপনা আপনি হয় – স্বয়ম্ভু – 'পাতাল-ফোঁড়া শিব'। আপনা হতে যদি দেহেতে সাধন হয়, তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। একেই বলে পরাবিদ্যা।

৩২২। **"ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না।"**

নিকষা দেহের মধ্যে ভগবানের লীলা দেখবে বলে লয় হতে চায় না। 'শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে, চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে।'

৩২৩। **"হাঁ, বিচার পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন।"**

'বিচার' – মনে চিন্তা।

'হ্যাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়'– মনের এই চিন্তা, দেহের ভিতরে

---

* এতে প্রকৃত ঈশ্বরলাভ হয় না।

ধারণা হবে, আবার দেহভেদ করে শরীরে রূপ ধারণ করবে, তবে তাঁকে পেয়েছে বুঝতে পারা যাবে।শুধু চিন্তা – ঈশ্বরের ধারণা নয় – সে চিন্তা মাত্র। সে ঈশ্বরলাভ নয়। তাহলে,'বড় কঠিন' – হয় না!

কাশীতে মহাপ্রভু ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিচার করছেন – দেহেতে বিচারের রূপ নেই – ফুটছে না। মহাপ্রভু লক্ষ্য করছেন – বিচার শুধু চিন্তা ও কথা মাত্র – ধারণা নেই, – দেহেতে বিচারের রূপ, যোগৈশ্বর্য নেই – এ কিছু নয়।

৩২৪। **"প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না।"**

নিত্যসিদ্ধ – স্বতঃসিদ্ধ*

৩২৫। **"যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচাভক্তি।"**

ঈশ্বরকে না দেখলে ভালবাসা জন্মায় না। তিনটি অবস্থার দরকার, তা না হ'লে ভালবাসা জন্মাবে না – প্রথম, তিনি কৃপা ক'রে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে ভক্তকে ধারণ করবেন; তবে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হবে – এটি দ্বিতীয়;আর কুণ্ডলিনী জাগ্রত না হ'লে – আত্মা সংকলিত ও সাক্ষাৎকার (তৃতীয় অবস্থা) হয় না।

'কাঁচাভক্তি' – প্রবর্তকের ভক্তি।**

৩২৬। **"তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।"**

ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পর এই ভালবাসা আসে। এর দুটি লক্ষণ। ব্যবহারিক লক্ষণ – ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকা; আর আন্তরিক লক্ষণ – যাঁর এই অবস্থা হয়, তিনিই দেখতে পান – দেহের মধ্যে ভগবানের লীলা।

'পাকাভক্তি' – তত্ত্বজ্ঞান ও অবতারতত্ত্বের ভক্তি।

৩২৭। **"যার কাঁচাভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ ধারণা করতে পারে না।"**

বৈধী ভক্তি, প্রবর্তক, সাধক।

৩২৮। **"পাকাভক্তি হ'লে ধারণা করতে পারে।"**

সংস্কার, স্বতঃসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ। এই ধারণার একটি সুন্দর উদাহরণ – দুই বন্ধু। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে প্রায় বলতেন, 'ব্রহ্মবিদ্যা দান করা যায়।' কিন্তু কি করে দান করা যায়, সে কথা কিছু বলতেন না। দ্বিতীয় বন্ধুটি ঠাকুরের পরম ভক্ত। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন আর তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু তার উপর শুয়ে আছেন, মুখের উপর মুখটি দিয়ে, গালের ভিতর জিভে জিভটি দিয়ে। এই স্বপ্ন যখন প্রথম বন্ধুটির

---

* আপনা হতে সাধন না হ'লে প্রেমাভক্তি হয় না, ঈশ্বর লাভও হয় না।

** বিধিবাদীয়।

কাছে দ্বিতীয় বন্ধুটি বললেন, তখন প্রথম বন্ধুটি বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "এ কি! এ যে ব্রহ্মবিদ্যা দান! কথামৃতে ঠাকুর এর সামান্যমাত্র লক্ষণ রেখে গেছেন– ঠাকুর নিজের জিভ থেকে থুতু নিয়ে অপরের জিভে লাগিয়ে দিতেন।"

ব্রহ্মবিদ্যা দানের কথা শুনে– সংস্কারবশতঃ আর সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় স্বপ্নে ব্রহ্মবিদ্যার স্ফুরণ হয়ে গেল – দেহের মধ্যে। এই হলো ধারণা।

৩২৯। **"ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি মাখানো থাকে...."**

'ফটোগ্রাফ'– দেহ।

'কাঁচ'– মন।

'কালি মাখানো'–পূর্ব সংস্কারবশতঃ রাগানুগা ভক্তি। যাঁদের পূর্ব সংস্কার আছে, তাঁদের ঈশ্বরীয় কথা ধারণা হয়।

৩৩০। **"....যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা।"**

সন্তানভাব।

৩৩১। **"মার ছেলের উপর ভালবাসা।"**

বাৎসল্য।

৩৩২। **"স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।"**

মধুর।

৩৩৩। **"সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কিন্তু কলকাতা কর্মভূমি, কলকাতায় বাসা করে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য।"**

বার তেরটি বন্ধুর মধ্যে, যাঁদের পল্লীগ্রামে বাড়ি আছে, তাঁরা সকলেই স্বপ্নে দেখেছেন– দেশ থেকে কলকাতায় আসছেন, আবার কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছেন ও গেছেন। ঈশ্বরের কাছে 'দেশ'–সালোক্য, আর সংসার 'বিদেশ'–কষ্টের জায়গা।

৩৩৪। **"....সংসারাসক্তি"।**

ভোগের বাসনা– এর মানে এই নয় যে তিনি খাবেন না।

৩৩৫। **"....বিষয়বুদ্ধি"।**

দেহজ্ঞান।

৩৩৬। **"বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না।"**

দেহব্যাপ্ত আত্মা– ষোল আনা যদি দেহ থেকে নিঃসৃত হয়ে সংকলিত হন– তবে আত্মাসাক্ষাৎকার। দেহের একটি মাত্র তন্তুতেও (fibre) যদি আত্মা নিঃসৃত হতে বাধা পায়, অর্থাৎ তন্তুটি যদি দোষগ্রস্ত হয়, – তাহলেও আত্মা সংকলিত হয় না ও দর্শন করা যায় না। "কালো পাঁঠা– যদি একটুও খুঁত থাকে,তাহ'লে মায়ের বলিতে লাগে

না।" যাঁদের আত্মার সাক্ষাৎকার হয় তাঁরা দৈবী মানুষ –'ভগবান নিজের হাতে তৈরী করেন।'

৩৩৭। **"দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না।"**

'দেশলায়ের কাঠি'–দেহ। দেশলায়ের কাঠির মাথায় বারুদের টোপ্ – দেহের উপর মাথা। মাথার মধ্যে সহস্রার। সহস্রারে চৈতন্য দপ্ করে জ্বলে ওঠে– ঠিক বারুদ যেমন জ্বলে ওঠে।

'ভিজে থাকা'– বিষয়াসক্তি থাকা। বিষয়াসক্তির লেশমাত্র থাকলে আত্মা সংকলিত হন না– চৈতন্য সাক্ষাৎকারও হয় না। "মেঠোপুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা হতে শুকিয়ে যায়।"

৩৩৮। **"অনুরাগ অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে।"**

বিষ্ণুধ্যান–নাসিকাগ্রে মন স্থির। যোগের অর্ধবাহ্য– আধখানা মন বাইরে, আধখানা ভিতরে। ভিতরের আধখানা মন ভাগবতী তনু কৃষ্ণমূর্তিতে যুক্ত অর্থাৎ সর্বক্ষণ কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করছে, আর আধখানা মন ভিতরের কৃষ্ণমূর্তির প্রতিচ্ছবি চক্ষুতে গ্রহণ করে– যেদিকে চাইছে, সেইদিকেই কৃষ্ণ দর্শন করছে– ভিতরের কৃষ্ণমূর্তির প্রতিচ্ছবি মাত্র–'যথা যথা আঁখি যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরায়।'

'অনুরাগ অঞ্জন'– যোগের খুব উঁচু অবস্থা। এসব রাজযোগের,হঠযোগের নয়।

৩৩৯। **"....তাহ'লে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।"**

'সাকার'–সচ্চিদানন্দগুরু, ভাগবতীতনু, ইষ্টমূর্তি, বহু দেবদেবীর মূর্তি, গুরু-ইষ্ট এক হয়ে যাওয়া, আবার সচ্চিদানন্দগুরু।

'নিরাকার'– আকাশ দর্শন, জ্যোতি দর্শন, আত্মা সাক্ষাৎকার, মহাযোগীর পরমাত্মা সাক্ষাৎকার।

যদি কারো ষোল আনা সাধন দেহেতে বর্তায় আর ধারণা হয়, তাহলে তিনি দেখতে পান ও বুঝতে পারেন,– এক হরি, আত্মা, ব্রহ্ম দেহ হতে যোগনিদ্রা থেকে উঠে শরীরের মধ্যে এই লীলা করছেন, তাঁর স্বরূপ কী দেখাচ্ছেন– অর্থাৎ 'আমি'র স্বরূপ!

৩৪০। **"চিত্তশুদ্ধি না হ'লে হয় না।"**

বহির্মুখী মন–অন্তর্মুখী হ'লে–তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। দেখতে পাওয়া যায়– সামনে মুখ আছে – পিছন দিকে মুখ হয়ে গেছে, পিঠ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; এই সময় আদ্যাশক্তি বালিকামূর্তিতে এসে বলতে থাকেন, 'মুখ বাঁকিয়ে দে মা'। এ হলো ষোল

আনা।*

আবার আংশিক চিত্তশুদ্ধিও হয়। একটি বন্ধু শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতেন। তাঁর আর একটি বন্ধু বললেন, "ঠাকুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেতে নিষেধ করেছেন।" বন্ধুটি আবার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেয়েছেন। এই শ্রাদ্ধের খাওয়ার পরদিন বন্ধুটি স্বপ্ন দেখছেন – আগের দিন যেখানে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন – ঠিক সেইখানে সেই চেয়ার টেবিলে একলা বসে – সেই সব খাবার খাচ্ছেন। ভারি একটা মজা হচ্ছে কিন্তু – যে খাবারই মুখে দিচ্ছেন – সে খাবার তৎক্ষণাৎ মাছ হয়ে যাচ্ছে – মাছের আস্বাদন। বন্ধুটি মাছ খান না– মুখে মাছের আস্বাদনে তাঁর সমস্ত শরীরটা বিষিয়ে উঠছে আর তিনি থু থু ক'রে মুখের খাবার ফেলে দিচ্ছেন। এ স্বপ্নের অনেক অর্থ আছে – কিন্তু তার মধ্যে একটি অর্থ চিত্তশুদ্ধি। বন্ধুটি সেই থেকে আর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতে পারেন না – এমন কি কোনও anniversary-র খাওয়াও খেতে পারেন না।

৩৪১। **".... তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন"।**

মন ময়লায় চাপা পড়েছিল। চাপা সরে গেল। মন ঊর্ধ্বে উঠে গেল। মন– কুণ্ডলিনী- মহাবায়ু। তিনি যেমন ঊর্ধ্বে উঠছেন – তেমনি তাঁর স্বরূপ পরিবর্তন হচ্ছে – শেষে তিনি আত্মারূপে পরিবর্তিত হন।**

৩৪২। **"........ তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।"**

সমাধি–উন্মনা সমাধি। ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্বিন্দু; উন্মনা - ছড়ানো মন কুড়িয়ে বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তারপর মন সহস্রারে প্রবেশ ক'রে আত্মার রূপ ধারণ করে আর আত্মার মধ্যে থেকেই আত্মা সাক্ষাৎকার করে।

৩৪৩। **"কিন্তু হাজার চেষ্টা কর। তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না!"**

বিবিদিষায় নয় – বিদ্বতে বস্তুলাভ।

আত্মা যাঁকে বরণ করে– তাঁরই হয়,– তাঁরই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিণত হন। ভক্ত এই বরণ করাকে 'কৃপা' বলে।

৩৪৪। **"অহংকার একেবারে ত্যাগ করতে হবে।"**

এটি হলো বিবিদিষার কথা।

৩৪৫। **"আমি কর্ত– এ বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না!"**

'কর্তা' বোধ আপনা আপনি উবে যায়, – যখন যায় তখন টের পাওয়া যায় না। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর এ সব বুঝতে পারা যায় – তা নইলে, কী একটা হচ্ছে – বেশ

---

* লেখকের অনুভূতি

* * শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ আত্মাও তা।

হচ্ছে — এ অতি চমৎকার— বিস্ময়কর— অতি অদ্ভুত — এই পর্যন্ত।

৩৪৬। **"যে নিজে কর্তা হয়ে বসেছে তার হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।"**

সহস্রারে দুয়ের স্থান নেই, দুই নেই,— এক ঈশ্বরই আছেন। এখানে বহুর কথা আর ওঠে না।

৩৪৭। **"তিনি জ্ঞানসূর্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে; তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি।"**

ভগবান জ্ঞানসূর্যরূপে ভিতরে। 'আমি' তাঁর একটি কিরণ। সেই কিরণ সূর্য থেকেই আসছে। 'আমি' র সঙ্গে সূর্যের সোজা সম্বন্ধ। সূর্য বিশ্বরূপে প্রতীয়মান— তাই পরস্পরকে জানতে পারা যায়। এ উপমা নয় — দেখতে পাওয়া যায়; প্রথমটি রেশমের পরদার পিছনে সূর্য—সপ্তমভূমিতে প্রবেশের শেষ আবরণ; আর দ্বিতীয়টি—বিশ্বরূপের প্রতিবিম্ব — 'আমি' রূপ আয়নাতে— তাই জগৎ দেখছি।

৩৪৮। **"সার্জেন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায়; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না।"**

অন্তর্যামী ভগবান — তোমার অন্তরে বাস ক'রে তোমার কাজ সমস্তই দেখছেন, অথচ তুমি কিছু টের পাচ্ছো না।

৩৪৯। **"কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।"**

মন বহির্মুখী। তাই জগৎ দেখছে — সকলকে দেখছে। অন্তরের অবস্থা—"আঁধার বসন পরি সমাধি মন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি।"

৩৫০। **"সাহেব! কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।"**

অন্তর্মুখী মন — ষোল আনা সাধন। আত্মা সাক্ষাৎকার, পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, অবতারলীলা। সাহেব— ভগবান—যদি কৃপা ক'রে এই সব দেখান তবে দেখতে পাওয়া যায়।

৩৫১। **"হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বাল্‌তে হয়।"**

"জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, সচ্চিদানন্দলাভ,"— চৈতন্যকে দেহেতে ধারণ করা। জ্ঞানদীপ দেহেতে জ্বলে— দেখতে পাওয়া যায়।*

---

* এখানে বন্ধুদের মধ্যে বহুলোক এই জ্ঞান-দীপ দর্শন করেছেন তাঁদের দেহের ভিতরে।

২৯শে মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রীমন্দির - দক্ষিণেশ্বর

৩৫২। **"রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।"**

শরণাগতি – প্রভু, আমি শরণাগত।

সবই তুমি – অসুখও তোমার একটি রূপ। তুমি এই দেহ। সেই দেহেতে তুমি অসুখরূপে ফুটে উঠেছ। তুমি তোমার শান্ত মূর্তি ধারণ কর। আমার 'আমি' আছে, যায় নি – আমি শরণাগত। আমায় কৃপা কর। এই দেখ–আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী – তোমার প্রসাদ খাচ্ছি।

ভাবগ্রাহী জনার্দন। এত বিচার – এত চিন্তা করতে হয় না। প্রসাদ গ্রহণ করলে – অন্তর্যামী তিনি – সমস্ত বোঝেন – আর তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি কৃপা করেন – তিনি ইচ্ছাময়। এই রকম মানসিক চিন্তা দ্বারা 'Faith cure' হয়। যীশু বলছেন – "Your faith has cured you"

৩৫৩। **"......আবার গেরুয়া কেন?"**

ভগবানকে পাবার জন্য গেরুয়া পরবার দরকার নেই। তিনি দেহের ভিতরে আছেন। তিনি দেহীকে বরণ ক'রে কৃপা ক'রে ফুটে ওঠেন। তাঁর কৃপায় কোন ভাগ্যবান লোক এ সমস্ত দেখতে পান – নিজের দেহের মধ্যে। বাইরের কোন বস্তুর বা চিহ্নের আবশ্যক করে না। গেরুয়া বাইরের বস্তু, বিবিদিষার চিহ্ন।

"কেয়া জানে কোন্ ভেক্‌সে নারায়ণজী মিল্ যায়!" – ঠাকুর বলতেন। নারায়ণকে পাবার জন্য কোন ভেকের আবশ্যক নেই। ঠাকুর কি গেরুয়া পরতেন? না! দরকার নেই – তাই পরেন নি। ঠাকুর আমার আদর্শ।

ঠাকুরের পায়ে বার্নিশ করা চটি, পরনে লালপেড়ে ধুতি, শ্রীঅঙ্গে জামা, রাসমণির দেবালয়ের একটি ঘরে থাকেন, খাট বিছানায় শোন, তেল মাখেন, মাছ-পান খান, – কিন্তু কেবল নিশিদিন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা – শ্রীমুখে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কিছু নেই।

এই ত' আমার আদর্শ। আমার জীবনে, তাঁর জীবনে – সমস্তই ত' মেলে – তিনি ত' আমারই জীবন যাপন করে গেছেন। এখন তাঁর কাছে শুধু প্রার্থনা – যাতে নিশিদিন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকতে পারি, আর মুখ থেকে ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কথা না কইতে হয়।

শ্রীবুদ্ধ এলেন.........

সৃষ্টি হলো একদল পীতরঙের কাপড় পরা শ্রমণের। জগৎ ভাবল – পীতরঙের কাপড় যারা পরে – ভগবান তাদেরই একচেটে – এরা পীতরঙের কাপড় পরে ভগবানকে ইজারা দিয়ে নিয়েছে। ভারি হাঙ্গামা ওসব – দরকার নেই আমার।

শ্রী শঙ্কর এলেন..............।

নেড়া মাথা, গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর দল বেরোল। সেই বৌদ্ধযুগের ছবি– জগৎ দূরে দাঁড়িয়ে দেখল, তাঁকে গ্রহণ করল না।

স্থান – পুরী, গম্ভীরা।

বসে আছেন, শ্রীগৌরসুন্দর – 'সোনার গৌরাঙ আমার'। সেই বরবপু, কিন্তু পরনে কটিদেশে কৌপীন মাত্র। জগৎ স্তম্ভিত হয়ে দেখছে।

প্রভু শ্রীমুখে বলছেন, "তোমরা সংসারে থেকে হরিনাম কর।" প্রভুর বাণীতে আর প্রভুর নিজের জীবনে সামঞ্জস্য নেই – ভয়ানক ফারাক। শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীশঙ্কর বিবিদিষার প্রবর্তক; কিন্তু তাঁদের জীবনে বিবিদিষা অত মূর্ত হয়নি, যে রকম মূর্ত হয়েছিল মহাপ্রভুর জীবনে। তিনি বলছেন, "সংসারে থেকে হরিনাম কর।" সে কথা নেবে কে?

স্থান – দক্ষিণেশ্বর – রাসমণির ঠাকুরবাড়ি।

দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ঠাকুর। পায়ে বার্নিশ করা চটি, পরনে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে পিরান। আমারই মতন একজন লোক।

জিজ্ঞাসা কর, "মশাই, ভগবানকে কি দেখা যায়?" অমনি বলবেন, "মাইরি বলছি, তোকে যেমন দেখছি সেই রকম দেখেছি – ভগবানকে।"

হয়ত আবার কাউকে বলবেন, "বাবা, সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছু হল না।"

কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, "মশাই, আমাদের কি হবে?"

অমনি জবাব আসবে, "সে কি গো, চাঁদা মামা সকলের মামা।"

প্রশ্ন – 'পাই কি করে'?

উত্তর – 'তাঁর কৃপা।'

প্রশ্ন – 'কৃপা হয় না কেন?'

উত্তর – 'তাঁকে ডাক।'

এই ত' আমার ঠাকুর – পীতরঙের কাপড় নেই, 'বিহার' নেই, গেরুয়া নেই, মঠ নেই, গম্ভীরা নেই, কৌপীন নেই – একজন আমার মতন অতি সাধারণ লোক – ভগবানকে পেয়েছেন– সচ্চিদানন্দ লাভ হয়েছে। শুধু ভগবানের কৃপা – চাঁদা মামার কৃপা!

ঠাকুরকে দেখে জগৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। জগৎ বলছে– আমার ঠাকুর – আমার জীবন।

৩৫৪। **"একটা কি পরলেই হলো।"**

ভগবানকে দেখবার জন্য, তাঁকে লাভ করবার জন্য, শুধু তাঁর কৃপা – আর কিছুর দরকার নেই।

৩৫৫। **"আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য এক্‌লা এক্‌লা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।"**

নিত্যসিদ্ধের রূপ।

৩৫৬। **"মিথ্যা কিছু ভাল নয়।"**

দেহেতে সত্যের স্ফুরণ হয়ে– সত্যস্বরূপ–স্বস্বরূপ দর্শন, এই হলো জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা। শিবের দুটি রূপ – কখনও 'জড়' সমাধিতে স্থির হয়ে আছেন, আবার কখনও দেহের মধ্যে স্বস্বরূপের লীলা দেখে নাচছেন আর বলছেন, "আমি কী! আমি কী!" এই সত্যাশ্রয়ী কখনও মিথ্যা অভিনয় করতে পারেন না। জীবনে যাঁর সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তিনি মিথ্যার খেলা খেলতে পারেন না।

সত্য কী? আমি সত্য। 'অহমস্মি', 'আনা-উল্-হক্', 'সবার উপরে মানুষ সত্য।'

প্রমাণ কী? আত্মিক জগতে সকলে তাঁকে অন্তরে দর্শন করবে–প্রমাণ হবে 'স একঃ'! ধর্ম– জীবিত অবস্থায়,– মৃত্যুর পর নয়।

৩৫৭। **"একজন কেশবকে বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি'। কেশব আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তাহ'লে ইনি কি হ'লেন'?"**

কেশববাবু বুঝেছিলেন– ঠাকুরের ভিতর চৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছেন – অবশ্য ঠাকুরের কৃপায়। 'অবতারের কৃপা না হ'লে, অবতারকে চেনা যায় না।'

দেহের ভিতরে অবতারের মূর্তি দেখা যায়। সচ্চিদানন্দ যে দেহেতে অবতীর্ণ হন – সেই মূর্তি ধারণ ক'রে দেখান আর বলেন, 'আমি কে জানিস? আমি ভগবান'। একটি বন্ধু এইরকম স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই হলো কৃপা। এরকম কৃপাও সকলে গ্রহণ করতে পারেন না, কিন্তু কেশববাবু করেছিলেন – তাই ঠাকুরের ওপর অত ভক্তি, ভালবাসা।

৩৫৮। **"....যেন পাতাল-ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়।"**

দেহেতে আপনা-আপনি আত্মিক স্ফুরণ হয়েছে – হচ্ছে। অবশ্য এর ক্রম আছে–এক আনা, দু'আনা, চার আনা ইত্যাদি।

'বসানো শিব'—বিবিদিষা—বড়জোর রূপ দর্শন — তাও ক্বচিৎ।

৩৫৯। **"সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়।"**

'পাখীর ঠোঁট'—মানুষের গলার কাঁটি।

কাঁটি গলায় আছে — প্রত্যেক মানুষের। এই কাঁটি বাইরে না বেরিয়ে যদি ভিতরে থাকে তাহলেই ভাল — যোগের ব্যাঘাত হয় না। কাঁটি যদি বাইরে বেরিয়ে থাকে, তাহলে পূর্ণভাবে আত্মা সংকলিত হয় না। "কাঁটি বেরুলে পাখী আর পড়ে না"— ঠাকুর বলতেন।

৩৬০। **"কেবল ফুলের ওপর বসে মধুপান করে।"**

'ফুল'— সহস্রার।

'মধু'— ব্রহ্মানন্দ।

সহস্রারে ব্রহ্মানন্দ। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে পদ্ম-ভূমি-চক্র প্রস্ফুটিত হয়—আর সেই পদ্মে অবস্থান। কেউ বা চতুর্থে জ্যোতিদর্শন করছে, কেউ বা পঞ্চমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, কেউ বা ষষ্ঠে রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন করছে— মধুপান করছে।

৩৬১। **"যেমন ধান হ'লে মাঠ পার হতে গেলে, আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।"**

সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা না হ'লে কুণ্ডলিনী জাগেন না। বৈধীভক্তিতে ঈশ্বর লাভ সুদূর পরাহত।

'মাঠের পারে' আর 'গাঁয়ে'— সহস্রার।

৩৬২। **"তখন ধানকাটা মাঠ যেন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা একদিক দিয়ে গেলেই হলো।"**

কুণ্ডলিনী জাগরণ— হ্লাদিনী ভেদ করে সন্ধিনীর ভিতর দিয়ে সহস্রারে গিয়ে নৃত্য। "কমলে কমলে নাচ মা, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।"

৩৬৩। **"বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল। সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো।"**

"ড্যাঙ্‌ ড্যাঙ্‌ ড্যাঙ্‌ ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন?" ডাঙায় ডিঙে চলেছে— দেখতে পাওয়া যায়। চোখের পলকে ডিঙে পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে নিকটে এসে গেল। এটি হলো মহাবায়ুর জাগরণ— দেহেতে মহাযোগের স্থিতিলাভ। মহাবায়ু জাগরণের খুব সোজা পরীক্ষা— যাঁর মহাবায়ু জাগরণ হয়েছে তাঁর সামনে গিয়ে বললে, "আপনার মহাবায়ু জাগরণ হয়েছে?" — তখনি তাঁর তলপেট লাফাতে থাকবে, দেহ লাফাতে থাকবে, আর মাথাটাও লাফাতে থাকবে — এরপর সমাধি হয়ে যাবে।

ব্রহ্মবিদ্যা, শোনামাত্র দেহে প্রকাশ পাবে।

৩৬৪। "এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বরলাভ হয় না।"

সচ্চিদানন্দ লাভ। দেহেতে মহাবায়ুর জাগরণ—মহাযোগে স্থিতিলাভ করা—সচ্চিদানন্দ লাভের লক্ষণ। সচ্চিদানন্দ অবস্থা দেহেতে দেখতে পাওয়া যায়। দু'টি গাল ফুলে ওঠে। একটি গাল ফুলে ওঠাকে বলে –'ভাব', আর দু'টি গাল ফুলে উঠলে—'সচ্চিদানন্দ অবস্থা'।*

৩৬৫। "কুমুরে পোকা চিন্তা ক'রে আরসুলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়।"

(১) 'আরসুলা' – আদ্যাশক্তি। 'কুমুরে পোকা'— আত্মা (সগুণ)।

(২) 'আরসুলা'— জীবাত্মা। 'কুমুরে পোকা'— নির্গুণ ব্রহ্ম।

(৩) 'আরসুলা'— আদ্যাশক্তি, পরে আত্মা— পরে নির্গুণ ব্রহ্ম – কুমুরে পোকা।

আরসুলা কুমুরে পোকায় পরিবর্তিত হয়। জীব শিব হয়। চিৎপথে – যোগে—আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হন।

যোগ মানে যুক্ত হওয়া নয়—পরিবর্তিত হওয়া।**

৩৬৬। ".... যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।"

'হাঁড়ি'— দেহ। 'মাছ' – বোধ। 'গঙ্গা'— সচ্চিদানন্দ। সমাধিতে 'বোধ' মাত্র আছে। সেই 'বোধ' সচ্চিদানন্দ সাগরে বিলাস করছে।

'স্থূল-বোধ' দেহ থেকে মুক্ত হয়ে, 'সূক্ষ্ম-বোধে' পরিবর্তিত হয়েছে আর সচ্চিদানন্দে— সহস্রারে— গিয়ে পড়েছে,— সেই মুক্তির আনন্দ। এই আনন্দ মুখে কিল্‌বিল্ ক'রে প্রকাশ পায়— জলে যেমন মাছ কিল্‌বিল করে।***

৩৬৭। "সোনার একটু কণা, সোনার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়।"

---

*এটি ব্যষ্টির (individualism)। সমষ্টিগত সচ্চিদানন্দ লাভ হলে জগতের অসংখ্য নরনারী তাঁকে অন্তরে দর্শন করেন (L'homme Universel)।

**ব্যষ্টিতে এর কোন প্রমাণ নেই। মহাপ্রভু দিবারাত্র শ্রীমতীর ভাবে থাকলেও শ্রীমতীতে পরিবর্তিত হন নি। এ হলো ভাব মাত্র। রাখালকে (পরে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) কোলে করলেও ঠাকুর মা যশোমতী হয়ে যান নি। এও ভাব মাত্র। সমষ্টিতেই এই পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। সকলে তাঁকে অন্তরে দর্শন করেন ও তাঁর ব্রহ্মে পরিবর্তিত হওয়ার প্রমাণ পান ও দেন।

*** এ হলো ব্যষ্টি। বিশ্বব্যাপিত্বে এর অর্থ—

'হাঁড়ি'— দেহ

'মাছ'—আত্মা—পরমাত্মা ('in the shape of a person') —সচ্চিদানন্দ। মনুষ্যজাতির অন্তরে ইনি লীলা করেন। তাঁরা দেখেন আর বলেন।

স্থূল , সূক্ষ্মে পরিবর্তিত হয়েছে – মোটা ‘অহং’ ‘বোধ’ মাত্র হয়েছে– জড় সমাধি। মানুষটির এই ‘বোধ’ mathematical point মাত্র। ‘অব্যাপ্যদেশম্’।

৩৬৮। “.... আর যেমন বড় আগুন, আর তার একটি ফিন্‌কি,”

আত্মার জড় সমাধি। ‘বিশ্বরূপ’ ‘বীজে’ পরিণত হয়। ঠাকুর মহামায়ার মায়া কি দেখেছিলেন– একটি জ্যোতির্বিন্দু গোটা জগৎকে ঢেকে ফেলছে।

৩৬৯। “....বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু ‘অহং’ রেখে দেন–বিলাসের জন্য।”

দ্বৈত-জ্ঞান– তবে শুধু ‘বোধ’ মাত্র। লয় হলো না– মহানির্বাণ বা স্থিত সমাধি লাভ হলো না।

৩৭০। “তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে।”

কেউ নেই– ‘শূন্যম্’ – তাও বলবার জো নেই– একেবারে ‘চুপ’।

২২শে জুলাই, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রীমন্দির - দক্ষিণেশ্বর

৩৭১। “এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই, শম দম তিতিক্ষা চাই। এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে।”

বিবিদিষায় বস্তুলাভ ক'রে মুক্ত হওয়া,– বুদ্ধ ও শঙ্কর প্রবর্তিত পথ। পুরুষকারের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম ক'রে– মহাকারণে লয় হওয়া – এ জীবকটির কথা,– হয় না। চেষ্টার দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম কিংবা মুক্তিলাভ করা যায় না।

আত্মা যাকে বরণ করে, তারই হয়।

“আত্মা যদি কৃপা ক'রে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।”

“বন্ধন আর মুক্তি, সবই তাঁর হাত।”

“তুমি হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না।”

ঠাকুর বুদ্ধ ও শঙ্কর প্রবর্তিত পথ উলটে দিলেন। চেষ্টায় ভগবান লাভ নয়, মুক্তি নয়,– ভগবানের কৃপায় ভগবান লাভ, মুক্তি। যাঁর হয়, তাঁরই হয়– আপনা-আপনি হয়– তিনি শুধু সাক্ষী মাত্র।

৩৭২। “এরা বেদান্তবাদী; কেবল বিচার করে ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।’ বড় কঠিন পথ।”

বিচারের দ্বারা ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’– এ অনুভূতি হয় না। ভগবান দেহেতে আপনা-আপনি প্রকাশ পান – ইষ্টমূর্তি সাক্ষাৎকার, আত্মার দর্শন, আত্মার মধ্যে জগৎ

– বিশ্বরূপ, সেই বিশ্বের বীজে পরিণত হওয়া, আবার সেই বীজের স্বপ্নে পরিণত হওয়া – এই লীলা করেন। ভক্ত দেখেন। ভগবানের এই লীলায় ভক্তের দেহেতে এসব ধারণা হয় – তবে 'জগৎ স্বপ্নবৎ'। এই হলো "আত্মা যদি কৃপা করে সাধন করেন" – আত্মা যদি তাঁর স্বরূপ দেখান – তবে স্বপ্নবৎ। "ভগবানের যদি দরকার হয় তবে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেন।"

শিব নিজের স্বস্বরূপ দেখেন আর আনন্দে নৃত্য করেন আর বলেন, "আমি কি! আমি কি!" এ রকম অনুভূতি – ভগবানের প্রকাশ – ঠাকুরের হয়েছিল – তোতাপুরী মহারাজের হয়নি। সব অবতারের আধারেও এত কোষ উন্মুক্ত হয় না।

৩৭৩। "জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা; যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ।"

এ অবস্থা হলে 'সব চুপ' – আমি মিথ্যা – আমি নেই। স্থিত সমাধি হয় – দেহ চলে যায়। শুধু অবতারের দেহ থাকে। তত্ত্বজ্ঞানে – দ্বৈতবাদে – 'পাকা' ভক্তি ও শ্রীভগবান – এই মাত্র! তাই 'তুমি, তুমি', – 'ঈশ্বর, ঈশ্বর'! ঠাকুরের 'মা মা'। "মা, আমি করি না তুমি কর,– তুমি!"

৩৭৪। ".......বড় দূরের কথা।"

সাধন ক'রে 'জগৎ মিথ্যা', – এ অনুভূতি হয় না – শুধু কল্পনা মাত্র।

৩৭৫। ".......যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না।"

'কর্পূর' – আত্মা।

যদি কারো শুধু জ্ঞানমার্গের সাধন ও অনুভূতি হয় – তাহলে স্থিত সমাধি হয়ে দেহ চলে যায়; 'জগৎ স্বপ্নবৎ' বলবার জন্য তিনি ফিরে আসেন না। একেই বলে 'লয়যোগ'।

৩৭৬। "কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে।"

'কাঠ' – দেহ।

'কাঠ পোড়ালে' – দেহেতে পঞ্চকোষের সাধন ও আত্মার সাধন হলে।

'ছাই' – তত্ত্বজ্ঞানের 'তুমি, তুমি', 'মা, মা' – 'পাকা' ভক্তি। পঞ্চকোষের সাধন হবে, আত্মার সাধন হবে, তত্ত্বজ্ঞান হবে, তারপর অবতারতত্ত্বে স্থিতি লাভ ক'রে বলে জগৎ স্বপ্নবৎ – এ একটি অবস্থা– সময়ে সময়ে হয়, এও ভগবানের একটি রূপ।

৩৭৭। "পদ্মলোচন ভারি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি 'মা-মা' করতুম তবু আমায় খুব মানতো।"

পণ্ডিত মশায়ের আত্মা সাক্ষাৎকার হয় নি– 'সে দু-এক জনা' – অতএব তিনি

ভক্ত। তিনি পণ্ডিত, বিচারের দ্বারা মস্তিষ্কে ধারণা করতে চেষ্টা করতেন — সাধক।

৩৭৮। **“তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না।”**

এই ‘কান্না’ হলো পণ্ডিত মশায়ের ভক্তির চিহ্ন। তবে তিনি ভাগ্যবান লোক, ঠাকুরের মুখ থেকে ‘মা, মা’ শুনেছেন। ঠাকুরের ‘মা, মা’ — এই ব্রহ্মময়ীর নাম পণ্ডিত মশায়ের ভিতরে ভক্তির বন্যা এনেছিল — তাই কান্না, অবশ্য সাময়িক।

৩৭৯। **“সে বল্‌লে, আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।”**

‘শিব দেখা’ কিংবা ‘ব্রহ্মা দেখা’ — কারণশরীর দেখা।

পণ্ডিত মশাই কারণশরীর সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। কারণশরীর — ভাগবতী তনু — ইষ্টমূর্তি ধারণ ক’রে ভক্তকে দেখা দেন, কথা কন ইত্যাদি। আবার উঁচু সাকার ঘর হলে — নানাবিধ রূপ ধারণ করেন, ভক্ত দেখেন। বহু পরে ভক্ত বুঝতে পারেন — ‘শিব ও ব্রহ্মা’ এক — ‘উঁচু সাকার।’

“যে সমন্বয় করতে পেরেছে, সেই ধন্য।”

এর একটি অর্থ, যিনি কারণশরীরের রহস্য বুঝেছেন তিনি ধন্য। তিনি বুঝেছেন — সমস্ত সাকার মূর্তি — রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা — সব এক।*

৩৮০। **“আমি কি বলবো, বললাম - কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি ওসব ভালো লাগে না।”**

ঠাকুরের দেহ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করেছে — গ্রহণ করতে পারে না। কেন এ রকম ত্যাগ হয় — সমস্ত কথা খুলে বললেও পণ্ডিতমশাই ধারণা করতে পারবেন না। নিজের দেহে ধারণা না হলে বুঝতে পারা যায় না। তাই ঠাকুর ‘কামিনীকাঞ্চন’ ত্যাগের কথা চাপা দিয়ে গেলেন। “কারেই বা বলছি, কেই বা বুঝবে।”

৩৮১। **“একটু হুঁস হবার পর কা-কা-কা (অর্থাৎ কালী) এই শব্দ কেবল করতে লাগলো।”**

কালী — আদ্যাশক্তি — ‘কালী প্রধানা’ — তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়।

এই ভদ্রলোকটির আধার ক্ষুদ্র ছিল — তাই কালী দর্শনে উন্মাদ হয়ে গেলেন — কা-কা করতে লাগলেন।

দক্ষিণেশ্বর — পঞ্চবটীতলা।

লাটু মহারাজ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

---

*এ হলো ব্যষ্টির সাধনে নানা ঈশ্বরীয় রূপের সমন্বয়। বিশ্বব্যাপিত্বে— সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষের মধ্যে সমন্বয়। একটি জীবিত মানুষের আত্মিক রূপ অন্তরে দর্শন করেন হাজার হাজার নরনারী। যদিও বাইরে তারা বহুবিধ রূপে বিভিন্ন, আত্মিক জগতে তারা এক।

ঠাকুর পা দিয়ে লাটু মহারাজের বুক ডলছেন আর বলছেন, –
‘চুপ কর শালা, পেঁচী মাতাল; শালা মাকে দেখেছে, তাই এমন করছে।’

৩৮২। **“বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই।”**

বহির্জগতে দৃষ্টি – সেই দৃষ্টি গুটিয়ে অন্তরে আবদ্ধ হলে তবে যোগ হয়। যোগীর দৃষ্টি দেহেতে – অন্তরে – আবদ্ধ।

৩৮৩। **“অন্তরে সোনা চাপা আছে; যদি সেই সোনার সন্ধান পেত, এত বাহিরের কাজ যা কচ্ছে, সে সব কম পড়ে যেত।”**

‘অন্তরে’ – সহস্রারে।

‘সোনা’ – আত্মা – ভগবান।

ভগবান যদি দেহেতে প্রকাশ পান – তা হলে বাইরের কাজ থাকে না – কোনও রকমে বেঁচে থাকা। ঠাকুর বলছেন, “আমি খাবো, থাকবো, ঘুমুবো; আমি খাবো, থাকবো, হাগবো।” – এই পর্যন্ত কাজ। আর যদি অন্য কাজ কিছু করেন, বুঝতে হবে, ভগবানের আদেশ – চাপরাসের ঠেলায় ভগবান তাঁকে দিয়ে করাচ্ছেন।

৩৮৪। **“.......শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেতো।”**

নির্গুণ – নিষ্ক্রিয়।

৩৮৫। **“দয়া – সর্বভূতে সমান ভালবাসা।”**

যখন সমস্ত ঈশ্বরময়* – চৈতন্যময় – আবার আমি এক – আমি বহু – খাদ কিছু নেই – সবই সেই চৈতন্য – সবই আমি – এ বহুও আমি – সবই আমার ভিতরে – একা আমিই আছি – বিজ্ঞানীর অবস্থা – পূর্ণ অবতারতত্ত্ব। তখনকার ভালবাসা শান্ত, তাতে ক্রিয়া নেই, আর চ্যুতি-বিচ্যুতিও নেই – তবে আছেই – অচ্যুত।

৩৮৬। **“কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার।”**

সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণ – দেহে ব্যবহারিক লক্ষণ। ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত – নির্গুণ অবস্থা।

৩৮৭। **“প্রকৃতির পার।”**

দেহবোধ বিবর্জিত অবস্থা – মহাকারণে লয় – স্থিত সমাধি। এই স্থিত সমাধির পর জগদাত্মক হয়ে যায় (Universal self in the shape of a living person)। এই হলো প্রকৃতির পার।

৩৮৮। **“তিন গুণই চোর।”**

---

* বিশ্বব্যাপিত্বে – এ হলো পূর্ণ সদবিদ্যা বা সদাখ্যাতত্ত্ব-Kashmir shaivism. All is one and one is all- Pantheism.

চোর থাকলেই গৃহস্বামী আছে। গৃহস্বামী – ঈশ্বর। গৃহস্বামীর সমস্ত অধিকার। চোরের অধিকার কিছু নেই। চোর অলীক (False personnel) – মায়া – যা নেই – তার রঙ মাত্র, – এই রঙের দ্বারা মায়া তাঁর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছেন।

৩৮৯। **"......যার হয় সে খবর দিতে পারে না।"**

যাঁর দেহস্থ আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হয় – তিনি আর কথা কন না– একেবারে চুপ – লয়। আমি নেই – কথা বলবে কে?

৩৯০। **"তাতে অবাক হয়ে 'হা, হা, হা, হা', বলে ভিতরে পড়ে গেল।"**

'অবাক' – বাক্যহীন – চুপ – সমাধি।

'হা, হা, হা, হা' – নাদভেদ। এর পরীক্ষা – যদি কারোর নাদভেদ হয়ে থাকে, তার সামনে নাদভেদের কথা বললে, তাঁর মাথাটা সামনে ও পিছনে নড়তে থাকবে। শ্রবণমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা দেহেতে প্রকাশ পাবে।

'ভিতরে পড়ে গেল' – মহাকারণে লয় হ'য়ে গেল।

৩৯১। **"জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, এরা ব্রহ্ম দর্শন করে আর খবর দিতে পারে নাই।"**

এঁদের মনের লয় হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল – অহং-তত্ত্বের লয় হয় নি। অহং তত্ত্বের লয় না হওয়াতে – দেহেতে ভাগবতের প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাই এঁরা শুকদেবের মত ভাগবত প্রচার করেন নি – খবর দিতে পারেন নি।

"মনের লয় হওয়া চাই, আবার 'রামপ্রসাদের' অর্থাৎ অহং-তত্ত্বের লয় হওয়া চাই।" এই দুয়ের লয় হলে তবে ষোল আনা। অহং-তত্ত্ব – পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন।

৩৯২। **"শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্র দর্শন স্পর্শন মাত্র করেছিলেন।"**

সচ্চিদানন্দ সাগরের আস্বাদন করেছিলেন।

"শিব হাঁটু পর্যন্ত নেমে সচ্চিদানন্দ সাগরের তিন গণ্ডুষ জল পান করেছিলেন; শুকের দর্শন স্পর্শন, আর নারদের দূর থেকে সচ্চিদানন্দ সাগরের বাতাস গায়ে লেগেছিল।"

৩৯৩। **".....নেমে ডুব দেন নাই।"**

স্থিত সমাধিতে যান নি।

৩৯৪। **"পরীক্ষিৎ......"**

যাঁদের দেহের ভিতর সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয় – তাঁরাই পরীক্ষিৎ।

৩৯৫। **"ভাগবত........"**

আত্মিক স্ফুরণের পর দেহে শ্রীভগবানের লীলা – আগম ও নিগম দুই।

আগমের লীলা– ইষ্ট সাক্ষাৎকার, আত্মা সাক্ষাৎকার, আত্মার বিবিধ রূপ, নির্গুণ ব্রহ্ম। নিগমের লীলা–তত্ত্বজ্ঞান, অবতারতত্ত্ব ও নিত্য- লীলা আর লীলা-নিত্য যোগ।

৩৯৬। "...**'বিদ্যার আমি' এক রেখে দিয়েছিলেন।**"

এ অবস্থা দেখিয়ে দেন। সাধক সমাধিস্থ – সমাধিতে দেখছেন – স্নিগ্ধা, অপরূপা নারী এক – পিছন দিক থেকে, দুই বাহু প্রসারিত ক'রে, অতি সন্তর্পণে আর ধীরে, সাধকের বাহুর ঊর্ধ্বভাগে, নিজের বাহুর ঊর্ধ্বভাগ রক্ষা করল। এই নারীস্পর্শে সাধকের সমস্ত দেহ শীতল হলো, নারীমূর্তি সাধকের দেহেতে মিশে গেল। সেই সময় সাধকের মনে স্ফুরণ হলো – 'বিদ্যামায়া'।

৩৯৭। "**আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা।**"

এ হলো পাকাভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থা– 'আমি'র রেখা মাত্র।

৩৯৮। "**আমি বললাম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা করলে কি হয়?**"

'পরীক্ষিৎ' না হ'লে 'শুকে'র কাছ থেকে ভাগবত কথা শুনতে পারে না– ধারণা হয় না। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হলে 'পরীক্ষিৎ' হওয়া যায় না। কিংবা ভগবান যদি কৃপা ক'রে দেখিয়ে দেন– 'এরা সব তোর কাছে আসবে' – তারাও 'পরীক্ষিৎ'। মা ঠাকুরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন– 'এরা সব তোর ভক্ত'। ঠাকুর যেমন ভক্তদের দেখছেন, আবার ভক্তরা যদি সেই রকম ঠাকুরকে দেখেন, তাহলে আরও উঁচু অবস্থা হয়। ভগবান ঠাকুরকে দেখিয়ে দেবেন, আবার ভক্তও ঠাকুরকে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে লাভ করবে– "তবে দাঁতে দাঁত বসবে।"

৩৯৯। "**কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল।**"

কেশববাবু মায়ের চিন্ময়ী মূর্তি দর্শন করেছিলেন–অবশ্য ঠাকুরের কৃপায়।

৪০০। "**ভাগবত – ভক্ত – ভগবান**"।

ভগবান দেহেতে প্রকাশ হলেন। যাঁর দেহেতে তিনি প্রকাশ পান– তিনি ভগবানকে দেহেতে ধারণা করলেন– তিনি ভক্ত। আর দেহেতে ভগবানের প্রকাশ কাহিনী হলো ভাগবত।

৪০১। "**গুরু – কৃষ্ণ – বৈষ্ণব।**"

নির্গুণ থেকে নিগমে নেমে এসে সচ্চিদানন্দগুরু যে দেহেতে কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব। এরূপ ভক্তের চিন্ময় দেহ– শ্রীভগবান তাঁর দেহে অবস্থান করেন।

৪০২। "**মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ।**"

তিনি সেইখানেই প্রকাশ যেখানে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। যাঁর সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়, অবতারতত্ত্ব পর্যন্ত তাঁর অনুভূতি, — অবশ্য এর মধ্যে স্ফুরণের ক্রম, কমবেশি আছে।*

৪০৩। **"ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন।"**

নির্গুণে লয় হওয়া।**

৪০৪। **"ঈশ্বরলাভ না করলে হয় না।"**

ঈশ্বরবস্তু— আত্মা— দেহেতে ধারণা করা।

৪০৫। **"মা, ওকে এক কলা দিলি কেন? মা, বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে।"**

ঠাকুরের ভিতর সচ্চিদানন্দ ঠাকুরের কোন ভক্তের রূপ — মূর্তি ধারণ ক'রে প্রকাশ পেয়েছেন, সেই অবস্থায় ঠাকুর দেখছেন — ভক্তের সহস্রার থেকে এক কলা পরিমাণ 'পানা'— আবরণ— সরে গিয়ে সচ্চিদানন্দ প্রকাশ হলেন। তাই মাকে বলছেন। একে বলে গুরুর শরীরে ভক্তের সাধন! এর উল্টো দিক — ভক্তের কারণশরীরে গুরুর অবস্থান আর সেই শরীরে সাধন।

ঠাকুরের ঘরে তখন পরমপূজনীয় ব্রহ্মানন্দ স্বামী (রাখাল মহারাজ) আর পরমপূজনীয় মাস্টার মহাশয় (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণেতা)। এই দু'জনের মধ্যে একজনের কথা ঠাকুর মার সঙ্গে বলছিলেন।***

৪০৬। **"তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে!"**

উদ্দীপনা বাড়বে। "পাথরের কাছে থাকলে পাথর হয়ে যায় (fossil), তেমনি সাধুর কাছে থাকলে সাধু হয়ে যায়।"

৪০৭। **"হাজরাকে দেখলাম শুষ্ক কাঠ!"**

'শুষ্ক কাঠ' — আত্মিক স্ফুরণহীন দেহ।

আত্মিক স্ফুরণ জীবদ্দশায় হবে না। হাজরা মহাশয় মৃত্যুকালে ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন।****

---

* মনুষ্যদেহই শ্রীভগবানের প্রকাশের একমাত্র আধার। মানুষের প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী রাজযোগের মাধ্যমে সহস্রারে অবস্থান ক'রে শ্রীভগবান হন। বাইরে থেকে কিছু আসে না। মানুষের সহস্রার ছাড়া শ্রীভগবানকে আর কোথাও দেখা যায় না।

** 'বিশ্বব্যাপিত্বে—'ত্রিগুণাতীত হওয়া'— ব্রহ্মত্ব লাভ করা। এর প্রমাণ — যিনি ত্রিগুণাতীত হয়েছেন তাঁর রূপ হাজার হাজার নরনারী দর্শন করেন ও সে কথা জগতে প্রকাশ করেন। ব্যষ্টিতে কোন প্রমাণ নেই। তিনি হলেন 'তিন পুরুষে আমির'। ঠাকুরদা দেখেন তাঁকে, বাপ দেখেন, নাতিও দেখে তাঁকে।

*** সম্ভবতঃ ইনি 'শ্রীম'!

**** এ মুক্তির কোন মূল্য নেই। জীবদ্দশায় মুক্তিলাভ করলে তবে প্রকৃত মুক্তি।

৪০৮। **“জটিলে কুটিলে থাকলে লীলা পোষ্টাই হয়।”**
ঈশ্বরের মহিমা বেশি প্রকাশ পায়।
‘জটিলে কুটিলে’–বিজাতীয় লোক –বিপরীত ভাবাপন্ন।

৪০৯। **“....যিনি জগৎকে ধারণ ক’রে আছেন।”**
‘আত্মা’– আত্মার মধ্যে জগৎ।

৪১০। **“মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।”**
এই মন যখন শুদ্ধ মনে (‘শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা– তিনই এক’) পরিবর্তিত হয়, তখন বিশ্বরূপ দর্শন হয় – প্রথম অনুভূতি বিজ্ঞানীর।

৪১১। **“সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ ক’রে রয়েছে।”**
পুরুষকার–বিবিদিষা–অথচ এতে ভক্তির তম যথেষ্ট আছে–“হয় দেখা দে, নয় গলায় ছুরি দেবো।” *

৪১২। **“....সে দূর ব’লে।”**
ধ্যানের প্রথম অবস্থা–অন্ধকার।

৪১৩। **“কাছে গেলে কোন রঙই নাই।”**
নির্গুণ।

৪১৪। **“পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার ‘আমার শ্যামা মা’! যেন ঘাস ফুলের রং।”**
ষষ্ঠভূমির রহস্যময়ী মায়ামূর্তি।

৪১৫। **“শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি ?”**
আত্মার লিঙ্গভেদ নেই। আত্মার সগুণ অবস্থায় আকার আছে, আর সে দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চমভূমির ‘অর্ধনারীশ্বর মূর্তিই’ প্রকাশ করে যে আত্মার লিঙ্গভেদ নেই। এটি বিজ্ঞানময় কোষের প্রথম অনুভূতি।

৪১৬। **“আমি এখনও চিন্‌তে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি”।**
পুরুষ আর প্রকৃতি–এক – একই আছে–আত্মা, আরও উঁচুতে ‘অস্তি’– ‘অস্তি-বোধ’ মাত্র।

৪১৭। **“ব্রহ্ম শক্তি– শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ।”**
‘ব্রহ্ম শক্তি’ – নিগম। ‘শক্তি ব্রহ্ম’– আগম।
‘অভেদ’ – এক – নির্গুণ।

---

* ‘সিংহ’ – বিক্রম। ‘হাতী’–মন। বিবিদিষায় বিক্রমের দ্বারা মনকে বশ করা –এ হয় না। অন্তর নিগ্রহই শ্রেষ্ঠ আর তা আপনা আপনি হয়– রাজযোগের মাধ্যমে।

৪১৮। **“সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।”**

আত্মা আর দেহ।

৪১৯। **“অদ্বৈত, চৈতন্য আর নিত্যানন্দ।”**

এই নিত্যানন্দ অবস্থারও পার— নিত্য থেকে লীলা— আর লীলা থেকে নিত্য।

৪২০। **“পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন।”**

‘পুরুষ’ — আত্মা। ‘প্রকৃতি’— দেহ ও গুণত্রয়।

দেহেতে আত্মার লীলা— আগমে এই রকম বোধ হয়।

৪২১। **“ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারি — ইঁট চুন সুরকি — সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি।”**

নির্গুণ আত্মা থেকে দেহ, আবার দেহ থেকে আত্মা। “রেতঃ এত কোমল পদার্থ কিন্তু তা থেকে এই মানুষের দেহ হয়।”

৪২২। **“শুধু বিচার! থু থু! কাজ নাই।”**

শুকনো জ্ঞান— সে কিছু না।

৪২৩। **“তুমিই আমি, আমিই তুমি।”**

সগুণ অবস্থায় ‘সো’হং’ — আর নির্গুণে কিছু বলবার নেই।

৪২৪। **“তুমিই তুমি....”**

তত্ত্বজ্ঞান।

৪২৫। **“শক্তিরই অবতার।”**

শক্তি সহস্রার থেকে অবতরণ করেন, জ্যোতি রূপে,— দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম কণ্ঠদেশ পর্যন্ত — নিগমের ‘চেতন সমাধি’—‘শুক আর নারদের চেতন সমাধি’;— তারপর সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত — এই হলো ঈশ্বরকটির ষোল আনা স্ফুরণ ও স্থিতি।

৪২৬। **“এক মতে রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দ সাগরের দুটি ঢেউ।”**

সচ্চিদানন্দ সাগর থেকে — রাম অবতারে ও কৃষ্ণ অবতারে — দু’বার দু’টি ঢেউ— জ্যোতির ঢেউ — তাঁদের দেহেতে অবতরণ করেছিল। তাই তারা অবতার।

৪২৭। **“অদ্বৈত....”**

সগুণে ‘সো’হং’,— নির্গুণে কিছু নেই। তাও বলবার জো নেই। আমি একাই আছি (“অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তো’সি”)।

৪২৮। **“চৈতন্য....”**

সাক্ষাৎকার হয়।

৪২৯। **"নিত্যানন্দ...."**

নিত্যানন্দের তিন অবস্থা।

১ম। মনে করলেই দেহেতে নিত্যানন্দের অনুভূতি। এটি হলো ব্রহ্মবিদ্যা।

২য়। দেহেতে স্থায়ী একটি আনন্দোচ্ছ্বাস সর্বক্ষণ থাকে।

৩য়। দেহের মধ্যে 'মানুষ-রতন' যখন আনন্দে হরিনাম করেন আর নাচেন।

৪৩০। **"যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, – 'আয় মার কাছে নিয়ে যাই'– তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে ক'রে নিয়ে যায়, তারই সঙ্গে যাবে।"**

ইনি হলেন পূর্ণাঙ্গ –ষোল আনা–সচ্চিদানন্দগুরু। ইনি অচেনা লোক – আগে কখনও তাঁকে দেখা যায় নি। সময়– বাল্যকাল-১২/১৩ বছরের মধ্যে। ঘাড়ে বসিয়ে নেন সচ্চিদানন্দগুরু।

১৯শে আগস্ট, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রীমন্দির – দক্ষিণেশ্বর

৪৩১। **"আত্মজ্ঞানের কথা আছে।"**

'আত্মজ্ঞান'– তত্ত্বজ্ঞান– সগুণ ও নির্গুণ।

সগুণ – আত্মা সাক্ষাৎকারের পর – যখন বোধ হয়, 'আমি দেহ নই– আমি আত্মা'।

নির্গুণ– পেঁয়াজের সব খোসা ছাড়িয়ে গেলে যা থাকে তাই, কি থাকে তা বলবার জো নেই। কর্পূর পুড়ে গেলে কিছুই থাকে না। এই নির্গুণ অবস্থায় লয় না হয়ে যদি তত্ত্বজ্ঞানে নেমে আসে, তখন দেহে মহাবায়ু ও মহাযোগ – 'ধানকাটা মাঠ', 'বন্যায় ডাঙাতে এক বাঁশ জল'– স্থিতিলাভ করে। সেই সময় পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হয়। পরমাত্মা সাক্ষাৎকার চৈতন্য সাক্ষাৎকারের বহু আগে হয়। শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগী ছিলেন– শ্রীকৃষ্ণের মতন যদি কারো দেহে সাধন স্থিতিলাভ করে, তাঁর পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্– ভগবান্ 'ষোল আনা' তাঁর দেহেতে প্রকাশ পেয়েছিলেন – সাধন ও অনুভূতির দিক দিয়ে, ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে নয়।

৪৩২। **"আমিই সেই পরমাত্মা।"**

এখানে পরমাত্মা – শুদ্ধ আত্মা! এটি কল্পনার অভ্যাস মাত্র – এই অভ্যাস করতে করতে যদি এই অবস্থা লাভ হয়; অবশ্য তা হয় না।

৪৩৩। **“বেদান্তবাদী....”**

যাঁদের ‘আত্মার’ সাধন হয়েছে।

৪৩৪। **“সন্ন্যাসীর....”**

আত্মা সাক্ষাৎকারের পর, দেহ আর আত্মা যাঁদের পৃথক হয়েছে, তাঁরাই সন্ন্যাসী। যাঁর দেহ থেকে আত্মা পৃথক হয়েছে – ‘দেহ ও আত্মা পৃথক’, এই কথা শুনলেই – তাঁর ঘাড় ডান দিকে আর বাঁ দিকে নড়তে থাকবে – আর ভিতর থেকে শুকনো সুপারি বা খোড়ো নারকেলের মত খট্ খট্ শব্দ হতে থাকবে। এঁদের সত্যিকারের বিষয়রস শুকিয়ে গিয়েছে – এই হলো সন্ন্যাসী হওয়ার যৌগিক লক্ষণ। আরও শ্রেষ্ঠ অবস্থা – ‘খাপ ও তরোয়াল’।

৪৩৫। **“আমি ‘খ’ – অর্থাৎ আকাশবৎ....”**

শূন্য, কিন্তু একথা মুখে বলবার ‘আমি’ থাকে না।*

৪৩৬। **“.... তা সে পরম ভক্ত, তার মুখে ওকথা বরং সাজে।”**

হয়ত কৃষ্ণকিশোরের লয়-যোগে সমাধি হয়েছিল তাই ওকথা সে বলতে পারে।

৪৩৭। **“....কিন্তু সকলের মুখে নয়।”**

সাধারণ লোক যা বলে, তা নিছক কল্পনা।

৪৩৮। **“আমি মুক্ত একথা ব’লতে ব’লতে সে মুক্ত হয়ে যায়।”**

অভ্যাসযোগ। এই অভ্যাস করতে করতে মৃত্যুকালে শ্রীভগবানের কৃপায় মুক্তিলাভ করতে পারে।

নিত্যানন্দ, বেঁচে থেকে – তবেই।

মৃত্যুকালে মুক্তি – ও মন্দের ভালো – এই পর্যন্ত।

৪৩৯। **“এ কি মায়া না দয়া ?”**

ব্যবহারিক জীবন। এ দয়াও নয় আর মায়াও নয় – যেটা চোখের সামনে পড়ে সেটা করে।

৪৪০। **“.... কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার ব’লতে যাব; কে বলে বেড়ায় ?”**

‘মাঙনেসে ছোটা হো যাতা’ – ঠাকুর এ কথাটি বলতেন।

৪৪১। **“সেখানেও সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জ্বল্ জ্বল্ ক’রছে। আবির্ভাব মানতে হয়।”**

ঠাকুরের ভিতর মায়ের আবির্ভাব – সেই প্রেমাঞ্জন চোখে লেগে আছে। তাই ঠাকুর দেখছেন – সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জ্বল্ জ্বল্ ক’রছে।

---

* লয়-যোগের সমাধি থেকে একথার সৃষ্টি, কিন্তু বাস্তবে নয়।

৪৪২। **“....মৃন্ময়ী”**

শ্রীদুর্গা প্রতিমা – লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ নেই।

৪৪৩। **“আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথাঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি ? আমি ত’ জানতুম না যে মেয়েরা মৃন্ময়ী দর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়।”**

শ্রীমতী যত শ্রীকৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণগন্ধ পাচ্ছেন। দেহেতে আত্মিক স্ফুরণের সময় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য অনুভূতি হয়।

৪৪৪। **“আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হ’ল। তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ী দর্শন হলো – কোমর পর্যন্ত”।**

ঠাকুরের দেহটি বেদান্তের অনুভূতিসমূহের প্রমাণের মাপকাঠি। ঠাকুরের ভিতর আত্মা – আত্মার মধ্যে জগৎ – বিশ্বরূপ। তিনি বহির্জগতে মৃন্ময়ীদেবীর কাছে এসেছেন। বহির্জগৎ ও আত্মার মধ্যে জগৎ এক – এই দেখাবার জন্য আত্মিক স্ফুরণে দেবী মৃন্ময়ীর প্রকাশ। বর্হিজগৎ, আত্মার মধ্যে যে জগৎ সেই জগতের, ‘আমি’ রূপ আয়নায় প্রতিবিম্ব মাত্র। আবার বহির্জগৎও সত্য – ঈশ্বরের রূপ। কই, তিনি ত’ জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন না, বলছেন জগৎও সত্য। এটি হ’ল বর্তমান ‘কালের’ (Present) অনুভূতি।

নবদ্বীপে অতীতের (Past) অনুভূতিও ঠাকুরের এইরকম হয়েছিল। গঙ্গার তীরে, নৌকার উপরে, যখন আকাশ থেকে জ্যোতির ধুচুনি মাথায় দিয়ে, গৌরাঙ্গ মূর্তি ও নিত্যানন্দ মূর্তি নেমে এসে ঠাকুরের দেহেতে মিশে গিয়েছিল। ঐ মূর্তি দুটি আকাশ থেকে আসেনি – ঠাকুরের দেহেতে স্ফুরিত হয়েছিল – বিষ্ণুধ্যানে – অর্ধবাহ্যে ঐ অনুভূতি,--ভিতরে আধখানা মন, বাইরে আধখানা, – ভিতরে স্ফুরণ হচ্ছে, সেই স্ফুরণের ছবি বাইরের আধখানা মন ধরে নিচ্ছে – তাই বাইরে বলে বোধ হচ্ছে। বাইরে যদি হতো – সকলেই দেখতে পেত। “যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।” তাই আত্মিক স্ফুরণে ঠাকুরের দেহের মধ্যে – মৃন্ময়ী র প্রকাশ ও দর্শন।*

৪৪৫। **“কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র।”**

কালুবীরের দেহে ভগবতীর বেশি প্রকাশ অন্য সকলের অপেক্ষা সেই যুগে, – তাই বরপুত্র।

৪৪৬। **“শ্রীমন্ত বড় ভক্ত।”**

মায়ের কৃপায় শ্রীমন্তের ‘কমলে কামিনী’ দর্শন হয়েছিল। সিংহলের রাজাকে তিনি ‘কমলে কামিনী’ দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু পারেন নি – তাই মশানে

---

* ছান্দোগ্য বলেছেন–‘তোমার চক্ষে এই পুরুষের মূর্তি। তাকে বাইরে বিক্ষেপ ক’রে ভাবছ–এই পুরুষ বাইরে!’

কাটতে নিয়ে গিয়েছিল। একজনের অনুভূতি হয়েছে – সে ইচ্ছা করলে অপরের যে সেই অনুভূতি হবে – তা হয় না। 'ভগবানের কৃপায় – ভগবান দর্শন।'

৪৪৭। **"কিন্তু কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে।"**

ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে দেহের সুখ-দুঃখ, খেটে খাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিকারের নিষ্কাম মনে বুঝতে পারা যায় – ঈশ্বরলাভ ঈশ্বরলাভের জন্য।

৪৪৮। **"ঐশ্বর্য কখনও যাবার নয়।"**

ব্রহ্মবিদ্যার নাশ নেই – যে দেহে প্রকাশ পায়, সেখানে অবস্থান করে। 'বাপ ছেলেকে কাঁধে নিয়েছে' – আত্মা বরণ করেছে।

৪৪৯। **"পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য)। পূর্ণ কুম্ভ।"**

'কুম্ভ' – শরীর। শরীর থেকে যখন ষোল আনা আত্মা মুক্ত হয়ে সহস্রারে সংকলিত হয়ে দেখা দেয় – তখন কুম্ভ পূর্ণ হয়েছে – সমাধি – তাই চুপ।

৪৫০। **"....এঁরা সমাধির পর নেমে এসেছিলেন।"**

এঁদের নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় নয় – শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এই অবতরণ।

৪৫১। **"আনন্দ অমৃতরূপে'—এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।"**

শ্রবণমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা দেহেতে প্রকাশ – এই হলো ব্রহ্মবিদ্যার পরীক্ষা। শুনবে, বলবে, আর যাঁর দেহেতে ব্রহ্মবিদ্যা স্থিতিলাভ করেছে – অমনি প্রকাশ পাবে সেই দেহেতে। আবার এই রকম দেহ থেকে বেদ তৈরী হয়। এঁদের দেহ ভগবানের নিজের হাতে তৈরী – "ভগবান আপনাকে নিজের হাতে তৈরী করেছেন।"

৪৫২। **"চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদের আনন্দ হবে।"**

'চিৎ' – যোগ। সৎ, চিৎ আশ্রয় করে, সহস্রারে আনন্দ রূপে ফুটে ওঠেন (সমাধি)। তখন ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়।

৪৫৩। **"চিদানন্দ আছেই – কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ।"**

'চিদানন্দ' – ভগবান।

'আবরণ' – ঢাকা।

'বিক্ষেপ' – ঢাকাকে খুলে দেওয়া।

পুকুরের জল পানা-ঢাকা আছে। বাতাসে পানা সরে গেল, জল দেখা গেল। কুণ্ডলিনী দেহ ভেদ করে সহস্রারে গিয়ে ঢাকা সরিয়ে দিলে – সচ্চিদানন্দ দর্শন হলো।

৪৫৪। **"বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে।"**

দেহ থেকে আত্মা যতই মুক্ত হতে থাকেন, ততই সহস্রারে সংকলিত হবার

জন্য গতি বাড়বে – ব্যাকুলতা।

৪৫৫। **"শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন।"**

'শ্রীমতী' – দেহ – আদ্যাশক্তি।

'এগুচ্ছেন' – কোষমুক্ত হচ্ছে! বেদমতে – পঞ্চকোষ। তন্ত্রমতে – চারকোষ।

'দেহগন্ধ' – নানা রকম অনুভূতি।

আদ্যাশক্তি আত্মায় পরিবর্তিত হচ্ছেন – আর সেই পরিবর্তনের মধ্যে নানাবিধ অনুভূতি হচ্ছে – চারিদিকে জ্যোতি দর্শন, অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, জ্ঞানচক্ষু, মহামায়া, আত্মা ইত্যাদি।

৪৫৬। **"সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়।"**

দেহেতে অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ পায় – যেমন ঠাকুরের ভাব, ভাবসমাধি, কখন মুহুর্মুহু সমাধি, কখনও বা জড় সমাধি।

৪৫৭। **"জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বইতে থাকে।"**

'জ্ঞানী' – মুক্তিকামী সাধক – এঁরা লয় হতে চান। এঁদের ভিতর কোষ মুক্ত হয় না। এঁরা দেহের মধ্যে যে ভগবান আছেন, ভগবানের লীলা, মায়ার রহস্য – এ সব কিছুই জানেন না। দৃষ্টান্ত – পুরীমহারাজ। পুরীমহারাজ জানতেন না আদ্যাশক্তি কি।

আদ্যাশক্তি – প্রথম অবস্থায় দেহ – শেষে আত্মা – দেহের শক্তির সার, যেমন গোলাপ ফুল ও গোলাপের আতর। কোষমুক্ত হয়ে এ সব দর্শন না হলে – এসব অজ্ঞাত থেকে যায়। এই সাধন সর্বাঙ্গীন বা পূর্ণাঙ্গ নয় – তাই একটানা।

৪৫৮। **"তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ।"**

এই শ্রেণীর সাধকেরা ধরে নিয়েছেন স্বপ্নবৎ – কল্পনা করে স্বপ্নবৎ দেখবার জন্য – প্রকৃত অনুভূতি হয় নি।

৪৫৯। **"সর্বদা স্বস্বরূপে থাকে।"**

নির্গুণ অবস্থা। কল্পনা করে – নির্গুণ হবার, প্রকৃত অবস্থা নয়।*

৪৬০। **"জোয়ার ভাঁটা হয়।"**

'ভক্ত প্রথমে দেখে দশভুজা, তারপর চতুর্ভুজ, তারপর দ্বিভূজ গোপাল, শেষে জ্যোতিদর্শন।'

৪৬১। **".......হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।"**

উর্জিতা ভক্তিতে দেহের লক্ষণ।**

---

* জগদ্ব্যাপী না হলে স্বস্বরূপে থাকা যায় না। জগদ্ব্যাপী হলে তাঁর রূপ হাজার হাজার নরনারী দর্শন করেন আর সেই কথা প্রকাশ করেন। ** এ কিন্তু বাহ্যিক লক্ষন। লোকে মিথ্যা অনুকরন করতে পারে।

৪৬২। **"কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে।"**

সমাধির নানারকম অনুভূতি।

৪৬৩। **"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়।"**

এঁরা বিবিদিষাপন্থী সাধক। আত্মা সাক্ষাৎকার না হলে জ্ঞানী হয় না। এরা আত্মা সাক্ষাৎকারের আগেই জ্ঞানী হয়ে আছেন।

৪৬৪। **"ভক্তের ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান।"**

আগমের অনুভূতি – আত্মার মধ্যে জগৎ – বিশ্বরূপ – এই হলো ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান।

৪৬৫। **"কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।"**

নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়েছেন – অবতারতত্ত্বে বুঝতে পারা যায়। 'লীলা থেকে নিত্য'।

৪৬৬। **"যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী।"**

অবতারতত্ত্বের শেষ অনুভূতি – নির্গুণ ব্রহ্ম ও দেহ অভেদ – এক থেকে আর একের উৎপত্তি। 'রেতঃ এত কোমল – তা থেকে হাড়, মাস ও দেহ – শক্ত পদার্থ'।

৪৬৭। **"কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক।"**

শুদ্ধজ্ঞানের অনুভূতিও যা, শুদ্ধাভক্তির অনুভূতিও তাই – দেহের মধ্যে আত্মার নানাবিধ স্ফুরণ। দুয়েতেই লয় হয় – লয়-যোগে সমাধি – সবিকল্প সমাধি। এখানে জ্ঞান মানে 'আমি' জ্ঞান লয় হওয়া। ভক্তিতে এই রকম লয়-যোগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মহাপ্রভুর সার্বভৌমের নিকট দশা প্রাপ্তি। এই লয়-যোগে মনের লয় হয়, এমনকি অহং-তত্ত্বেরও লয় হয় কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি – চিৎ- স্বরূপ- ভাবঃ অর্থাৎ জগদ্ব্যাপী হয় না।

৪৬৮। **"ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।"**

'সহজ' – সহজাত – সংস্কার – নিত্যসিদ্ধ – আপনা-আপনি হওয়া। নিত্যসিদ্ধের সাধন আপনা আপনি হয়। ভক্তি অন্তঃপুরের জিনিস – ভেতর থেকে আত্মার স্ফুরণ হচ্ছে।

৪৬৯। **"পণ্ডিতমুর্খ হয়ে দাঁড়ায়।"**

সম্পুর্ণ বুঝতে চায় অথচ পারে না, তখন নিজের অহংকারে আঘাত পড়ে – তবে এতে সত্যিকারের অহংকার যায় না। দেহেতে আত্মিক স্ফুরণ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দগুরুর উদয় না হলে ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হয় না।

জ্ঞান হওয়া কি? আমি কি – এই জানা!

জগতের মনুষ্যজাতি আমাকে তাদের দেহের ভিতর দেখে আমাকে বলবে – 'আমি আর তারা আত্মিক জগতে এক' – এই হলো জ্ঞান! 'আমি'র স্বরূপ জানা।

৪৭০। **"নিত্যসিদ্ধ।"**

সংস্কারবান – যেমন প্রহ্লাদ – 'ক' দেখে কৃষ্ণ স্ফুরণ হচ্ছে। কিন্তু এ নিত্যসিদ্ধের অতি সামান্য চিহ্ন মাত্র।

'নিত্যসিদ্ধ' কথাটি 'ভাগবত' থেকে নেওয়া। বেদে আছে জন্মসিদ্ধের কথা, যেমন মহামুনি কপিল।

ঠাকুর বলেছেন, "আমায় কঠোর সাধন করতে হয়েছে। নিত্যসিদ্ধের সাধন করতে হয় না।"

৪৭১। **"ঈশ্বরকটি..."**

"কোন বাঁশের ফুটো বেশি – কোন বাঁশের ফুটো কম।"

'ফুটো' – ফাঁক – কুণ্ডলিনীর সহস্রারে যাবার পথ। ঈশ্বরকটির কুণ্ডলিনী জাগরণের পরিমাণ বেশি – 'বেশি ফুটোওয়ালা বাঁশ'। এঁরা জন্মেছেন দেহের এই রকম গঠন নিয়ে। জীবকটির তা নয়। বেশি পরিমাণ কুণ্ডলিনী জাগরণ – এইটি হলো ঈশ্বরকটির প্রথম অবস্থা।

চৈতন্য যখন কটিদেশ পর্যন্ত অবতরণ করেন – তখন এর পূর্ণ স্ফুরণ ও স্থিতি।

২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ
সিঁদুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজ

৪৭২। **"সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।"**

সত্যস্বরূপা মা ঠাকুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা। সেই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। ব্যবহারিক জীবনে সেই সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কামিনীকাঞ্চন ঠাকুরের পূর্ণ ত্যাগ হয়েছিল। তাই মেয়েছেলে সামনে এলে চোখে জাল পড়ে যেত, আর টাকা হাতে ঠেকলে হাত বেঁকে যেত। এ হলো বড় ব্যাপার। ছোট জিনিসেও তাই। "খাবনা বলে ফেলেছি – তা আর খাওয়া হবে না।"

৪৭৩। **"নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করা কঠিন।"**

হয় না।

ব্রহ্মজ্ঞানের পর সংসার করা – বেঁচে থাকা। ঠাকুরের, 'আমি খাবো, থাকবো,

আর ঘুমুবো' – 'আমি খাবো, থাকবো, আর হাগবো' – এইটুকু জীবত্ব; – তাও শ্রীভগবান তাঁর শরীর দিয়ে লীলা করবেন – তাই।

৪৭৪। **".....ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়।"**

সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন আর আত্মাসাক্ষাৎকার হয়।

৪৭৫। **"তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই।"**

এঁদের দ্বারা মায়ার সংসার করা হয় না। এঁদের বেঁচে থাকাকে বলে 'সংসার করা' – যেমন দত্তাত্রেয় আর জড়ভরত, আর যেমন ঠাকুর।

৪৭৬। **"জ্ঞান ভক্তি লাভ করে..."**

পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর স্থিত সমাধিতে লয় না হয়ে – অবতারতত্ত্বে দেহের মধ্যে যখন 'মানুষ-রতন' হরিনাম করেন তখন পাকা জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হয়।

ভক্ত জানবেন কি করে, তাঁর ভক্তিলাভ হয়েছে?

'তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বলবেন তবে জানবি ঠিক হয়েছে।' তাই ভগবান 'মানুষ-রতন' হয়ে জানিয়ে দেন – 'আমি তোর দেহের মধ্যে ভক্তির অবতার হয়ে আছি।'

৪৭৭। **"হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আঠা লাগে না।"**

'তেল ও মধু' – চৈতন্যের প্রতীক। তেল ও মধু দেখা – দ্বিতীয় স্তরের চৈতন্যের অনুভূতি। ভক্ত দেখেন – ঈশ্বরকৃপায়।

'কাঁঠাল' – দেহ – কোষ – পঞ্চকোষ – বেদমতে সাধন।

'আঠা' – মায়া।

চৈতন্য সাক্ষাৎকার ও লাভ করে বেঁচে থাকলে ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয় না।

৪৭৮। **"চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই।"**

'চোর চোর' – ত্রিগুণ – সত্ত্ব, রজঃ তম – এরা তিনজনেই চোর।

ত্রিগুণাতীত হয়ে সচ্চিদানন্দ লাভ করলে – আর মায়ায় মুগ্ধ হয় না।

৪৭৯। **"একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও; সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোঁতা থাকে, মাটি থেকে তোলবার সময় সেই সোনাই থাকবে।"**

'সোনা' – আত্মা।

দেহ থেকে 'ষোল আনা' আত্মা একবার কৃপা করে মুক্ত হলে, তিনি আর পুনরায় দেহেতে মেশেন না।

ব্রহ্মবিদ্যা একবার লাভ হলে তার বিনাশ নেই – ভগবানের কৃপায় হয় – ভগবান কৃপা করেছেন।

৪৮০। "তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়।"

'দুধ' – শরীরের শোণিত।

'নির্জনে' – একলা।

'দই পেতে' – দেহের রক্ত যখন সমতাগুণযুক্ত হয় – রক্ত স্থির, বায়ু স্থির।

'মন্থনদণ্ড' – জাগ্রত কুণ্ডলিনী – তিনি স্বয়ং ক্রিয়াশীলা।

'মাখন' – সহস্রারে আত্মা সংকলন ও দর্শন

কুণ্ডলিনী দেহ মন্থন করে সহস্রারে আত্মার রূপ ধারণ করেন – "তখন মরার খুলিতে সাপের বিষটা পড়ে গেল।"

পঁচিশ বছরের মধ্যে যদি মাখন উঠলো, তবেই মাখন পাওয়া যায় – তা নইলে আর নয়। "ষোল আনা দিলে তবে ষোল আনা পাওয়া যায়।" ষোল আনা দেহ দান করলে তবে মাখন–আত্মা সৃষ্ট হয়।

দেহের ষোল আনা – পূর্ণ যৌবন – ২৫ বছর বয়স। ঠাকুর এই হিসাব রেখে গেছেন। "মা বাপের কাছে জোর করলে, - মা বাপে পরামর্শ করে দু-তিন বছর আগে হিস্যে ফেলে দেন।" ঠাকুরের দু-তিন বছর আগে হয়েছিল – অর্থাৎ ২২/২৩ বছরে। ২২/২৩-এ দুই তিন যোগ করলে হবে ২৪/২৫।

আরও ঠিক হিসাব ২৪ বছর ৮ মাস। ১২ বছর ৪ মাসে সচ্চিদানন্দগুরুলাভ, আর ২৪ বছর ৮ মাসে আত্মা সাক্ষাৎকার।

দেহেতে এক একটি স্তরের সাধন হতে ১২ বছর ৪ মাস সময় লাগে।

১২ বছর অন্তর জগন্নাথের কলেবর বদলায়।

৪৮১। "....হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন।"

কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বগতি হয়ে ঘাড়ের কাছে হ্লাদিনীর শেষ গ্রন্থি ভেদ করলে গ্রন্থি শ্লথ হয়ে যায় – তার লক্ষণ হেঁটমুণ্ড।

৪৮২। "আমি আগে বাসা পাকড়ে...."

ভগবানের কৃপা লাভ ক'রে। ভগবানের কৃপা হলো সচ্চিদানন্দগুরুলাভ – আত্মা বরণ ক'রেছেন। এটি হলো প্রথমাংশ। এই কৃপা যখন পূর্ণ হবে, তখন দেহ থেকে স্বস্বরূপ বেরিয়ে এসে বলবেন, " তোর ওপর ভগবানের কৃপা আছে।"

৪৮৩। "তল্পীতল্পা রেখে...."

এই দেহই বোঝা। আত্মা ষোল আনা নিঃসৃত হ'লে – এই দেহ-বোঝা নেমে যায়। আত্মা ও দেহ পৃথক হয়েছে – ১) পাকা সুপারী বা খোড়ো নারকেল, ২) খাপ ও তরোয়াল।

৪৮৪। **"ঘরে চাবি দিয়ে...."**

সহস্রারে 'অর্ঘ্যপুট' বা 'কাকীমুখ' সৃষ্টি হয়। এই 'কাকীমুখে' প্রবেশ ক'রে বাইরে আসা।

৪৮৫। **"নিশ্চিন্ত হ'য়ে....."**

জীবন্মুক্ত হয়ে। আত্মা সাক্ষাৎকারের পর যখন 'আমি আত্মা' এই জ্ঞান হয় – তখন সগুণে জীবন্মুক্ত অবস্থা – এটি প্রথম স্তর। পূর্ণ জীবন্মুক্ত অবস্থা তত্ত্বজ্ঞানে, যখন – "আমি-না।" জীবন্মুক্তির দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতি – ছায়ামূর্তি দেহ থেকে বেরিয়ে এসে সামনে নাচে আর বলে, –" আমি মুক্ত হয়েছি"।*

৪৮৬। **"এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি।"**

ভগবানের লীলা দেখে বেড়ান – 'নিকষা'।

৪৮৭। **"এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল।"**

হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ভেদ করে কুণ্ডলিনী সহস্রারে নৃত্য করছে। এ খুব বড় অবস্থা নয় – এ ষোল আনা নয়। বয়স হয়ে গেলে ষোল আনা নয় – আংশিক। তাই ঠাকুর ছোট ছেলেদের অত 'মেলানি' দিতেন। 'ফোয়ারা' দেখতে পাওয়া যায়।

৪৮৮। **"....কিন্তু নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন।"**

নিষ্কাম কর্ম হয় না।

৪৮৯। **"ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম অনায়াসে করা যায়।"**

ঠাকুর যা করতেন – ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকা আর ঈশ্বরীয় কথা বলা। তবে ঠাকুরের আর একটি কথা আছে, –" কেরাণী জেলে গেল। বেড়ি পড়ল, মুক্ত হ'ল তারপর কি সে ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াবে? না, আর একটা কেরাণীগিরির কাজ যোগাড় ক'রে অপর পাঁচজনে যেমন থাকে, সেই রকম থাকবে।"

'কেরাণী' – যিনি লেখেন। অন্তর্যামী ঈশ্বর মানুষের অন্তরে থেকে তার কর্ম দেখছেন অর্থাৎ গুপ্ত চিত্র গ্রহণ করছেন –চিত্রগুপ্ত।

'জেলে গেল' – দেহেতে আবদ্ধ হওয়া। "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

'বেড়ি পরল' – 'আমি' রূপ বেড়ি।

'মুক্ত হ'ল' – দেহ আত্মা পৃথক্ হয়ে গেল।

'তারপর কি সে ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াবে – মুক্ত হওয়ার কথা প্রচার ক'রে বেড়াবে?

---

* এ সমস্ত ব্যষ্টির অনুভূতি। জগদ্ব্যাপীত্বই (universalism) মুক্তিলাভের প্রকৃত প্রমাণ।

'না, আর একটা কেরাণীগিরির কাজ যোগাড় ক'রে অপর পাঁচজনে যেমন থাকে সেই রকম থাকবে' – সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। এই পরা বিদ্যা – বিদ্যার জন্য, ভোগের জন্য নয়।

সৎপথে খেটে খাওয়া । ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রথমে মাইনে পেতেন, পরে 'পেন্সিল্' (Pension) খেতেন। ঠাকুর যুগের আদর্শ জীবন যাপন ক'রে গেছেন – 'যুগাবতার'। জয় রামকৃষ্ণ।

৪৯০। **"সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করে।"**

যদৃচ্ছালাভ । রামের ইচ্ছায় যা আসে তাইতেই সন্তুষ্ট, – তবে রামের ইচ্ছা আগে জানতে হয়।

৪৯১। **"...... তাদের সঞ্চয় করতে নাই।"**

সঞ্চয় তাদের হয় না। 'বাপে ধরেছে', বেচালে পা পড়ে না।

৪৯২। **"ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে...."**

মহাবায়ু যখন সামনে বুকের ভিতর দিয়ে দেহকে তোলপাড় ক'রে সহস্রারে গিয়ে সমাধিস্থ হন। 'প্রেম ভগবানকে বাঁধবার রজ্জুস্বরূপ।' দড়ার মতন তলপেট থেকে ওঠে – এমন কি কাছে কেউ থাকলে সেও দেখতে পায়। যাঁর এই প্রেম হয়, তিনি মনে করলেই এই অবস্থা লাভ করেন দেহের মধ্যে। আবার অপরেও দেখতে পায় – হাতের চেটোয় আমলকী – ষোল আনা ব্রহ্মবিদ্যা।

৪৯৩। **"গোপন ইচ্ছা ...."**

সাধকের হয়।

পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী – অষ্টপাশ খুলে গিয়েছে —-তাঁর গোপন ইচ্ছা নেই।

৪৯৪। **" প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয়, তবে ভক্তি হয়।"**

কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ভালবাসা – এও একপ্রকার সূক্ষ্ম আত্মিক স্ফুরণ – এতে চিত্তশুদ্ধি হয়। এই চিত্তশুদ্ধি না হ'লে ভক্তিলাভ হয় না।

'ভক্তিলাভ হওয়া' – 'মানুষ-রতন'কে দেহেতে পাওয়া। আত্মা দেহেতে যোগমূর্তি ধারণ ক'রে উদয় না হওয়া পর্যন্ত সমস্তই বিচারাত্মক। ধর্ম হলো অনুভূতি।

৪৯৫। **"শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন।"**

জীবকটির হয় না।

৪৯৬। **"ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়।"**

গাঢ় ধ্যান হয়।

৪৯৭। **“.... তারপর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক হয়। বায়ু স্থির হয়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোঁড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোঁড়ে, সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়।”**

উন্মনা সমাধি।

৪৯৮। **“চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল”।**

এই প্রেম হওয়ার পরে বস্তুলাভ।

প্রেম হ'লে মন সহস্রারে আবদ্ধ হয়, নিজের দেহ ও জগৎ ভুল হয়ে যায়।

৪৯৯। **“অর্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না।”**

‘তীর ছোঁড়া’ – কুণ্ডলিনী জাগরণ। হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ভেদ করে কুণ্ডলিনী তীরের গতিতে সহস্রারে চলেছেন। এ খুব পাকা অবস্থায় হয়।

৫০০। **“এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।”**

নিঃশ্বাস বন্ধ হয় – পড়ে না।

৫০১। **“ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ, ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্‌গর্‌ ক'রে উঠে মাথার দিকে যায়।”**

যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তাঁর সামনে এই কথা – ঈশ্বর দর্শনের কথা – বললে, দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর মহাবায়ু গর্‌গর্‌ ক'রে বুকে আঘাত করতে করতে মাথার দিকে উঠে যাচ্ছে। ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণমাত্র দেহেতে প্রকাশ পাবে – তা নইলে তাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়নি।

৫০২। **“তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।”**

মহাবায়ু গর্‌ গর্‌ ক'রে উঠে সহস্রারের ঢাকা সরিয়ে দেবে আর সহস্রার দর্শন হবে – এই হলো পূর্ণ।

২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রীজয়গোপাল সেনের বাড়ি

৫০৩। **“তাঁকে জেনে এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কার্য কর।”**

এই হলো ঠাকুরের ‘আট আনা’। ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ অবতার ব্যতীত ষোলআনা হয় না। আগে তাঁকে জানতে হয় – তিনি যদি কৃপা ক'রে জানান তবে।

তারপর ব্যবহারিক জীবন। সাধারণ জীবনে ঈশ্বরের আংশিক স্ফুরণ। পূর্ণ স্ফুরণ হবার হ'লে অন্যরকম যোগাযোগ হয়।

'তাঁকে জানা' – ভগবান্ দর্শন – পরে 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা' – এই জানা।

৫০৪। **"যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা।"**

প্রথম জানা – আত্মার মধ্যে জগৎ – বিশ্বরূপ।

দ্বিতীয় জানা – অবতারতত্ত্বে – চৈতন্যের স্থূলমূর্তি – জগৎ। "রেতঃ এত কোমল তা থেকে হাড়মাস কী করে হলো?"

৫০৫। **"তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়।"**

সান্ত্বনা মাত্র, স্তোক বাক্য। তোমাদের এ সব হবে না – ভগবানকে ডাক, তাঁকে জান, তারপর আর কিছু। সপ্তমভূমিতে মন গেলে লয় হ'য়ে যাবে।

৫০৬। **"তাঁকে যদি লাভ করতে পার, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না।"**

সমস্তই 'তিনি'।

৫০৭। **"ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ।"**

বাৎসল্যভাব। ঠাকুরের 'রামলালা'। গোপালের মা'র 'গোপাল'। ঠাকুরের 'রামলালা' – নিগমে। নির্গুণে লয় হবার পর অবতরণের সময় অবতারের রূপ দর্শন হয়। শুকদেবের হয়েছিল। শুকদেব 'জড়' সমাধিতে নিমগ্ন। সমাধি ভাঙে না। পরীক্ষিৎকে ভাগবত শোনাতে হবে। দেবতারা নারদকে পাঠালেন। নারদের হরিগুণগান শুনে, শুকের সমাধি ভাঙল। দেহেতে অশ্রু, পুলক, কম্পন, ইত্যাদি দেখা দিল, আবার রূপদর্শনও হ'ল। গোপালের মা'র 'গোপাল' – আগমে, – প্রেমতনুর গোপাল মূর্তি হওয়া। এরপরে আত্মাসাক্ষাৎকার হয়। 'আত্মার দর্শন হ'লে সব সন্দেহ যায়।' বলরামবাবুর বাড়ি। গোপালের মা ঠাকুরের কাছ থেকে বাড়ির ভিতর যাচ্ছেন, যাবার সময় স্বামীজীকে (পরমারাধ্য স্বামী বিবেকানন্দকে) জিজ্ঞাসা করলেন, – "বাবা, আমার কি সব হয়েছে, না বাকী আছে?" আত্মা সাক্ষাৎকার হ'লে এ সংশয় জাগতো না – এ প্রশ্ন মনে উঠতো না।

৫০৮। **"পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে।"**

দুই ভাবের সংমিশ্রণ – দাসভাব ও বাৎসল্যভাব। এরূপ সাধনকে 'সহজিয়া' বলে। সত্যই এ অতি সহজ ও মাধুর্যময় সাধন। এতে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হতে পারে।

৫০৯। **"তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না।"**

কাম উপে যায়। 'যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম' – রাম এলে কাম থাকে না। 'রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।' কাম দেহ ছেড়ে গিয়েছে, তার লক্ষণ – তিনি যেমনি 'কাম' কথাটি উচ্চারণ করবেন, অমনি মহাবায়ু দেহ তোলপাড় ক'রে সামনে দিয়ে বুকে আঘাত ক'রে সহস্রারে উঠে যাবে – হয়ত সমাধিও হতে পারে। 'কাম' এই কথা উচ্চারণের দরুণ পাছে দেহেতে সংস্কার জাগে, তাই ভগবান তখনি দেহে প্রকাশ পান, তাঁর শ্রীমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করেন। 'কালীনামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।'

৫১০। **"বিষয়ী লোকেরা তাদের চিনতে পারে না।"**

ভগবান না দেখিয়ে দিলে, সাধুকে চিনতে পারা যায় না। ভগবান দেখিয়ে দেন – দেহস্থ আত্মা সাধুর রূপ ধ'রে ভক্তের হৃদয়ে উদয় হন – সচ্চিদানন্দগুরু – অবশ্য এই সচ্চিদানন্দগুরুর অনেক ক্রম আছে।* বিষয়ী লোকদের এরূপ সৌভাগ্য হয় না।

৫১১। **"মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়।"**

বিবিদিষা আশ্রয় করতে বলছেন। মন্দের ভাল – কৃপাময় ভগবান হয়ত কৃপা করতে পারেন।

৫১২। **"যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু।"**

'জড়' সমাধির লক্ষণ। সাধুর সামনে একবার ঈশ্বরের নাম করলেই সমাধি হয়ে যাবে। "একবার ওঁ বললে যাঁর সমাধি হয়, তাঁরই পাকা।" সাধুকে ভগবান ভক্তের অন্তরে দেখিয়ে দেন।

ঈশ্বর আছেন কোথায় ?

মানুষের হৃদয়ে। "মানুষে বেশি প্রকাশ" – The highest manifestation of God is in man. সাধু ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন। মানুষের হৃদয়ে সেই সাধুর মূর্তি রূপ ধারণ ক'রে ফুটে ওঠে। তবেই জানতে পারা যায় – ইনি সাধু – ভগবান – সচ্চিদানন্দ।

ব্যষ্টিতে দু'চারজন দেখে। জগদ্ব্যাপীত্বে – হাজার হাজার নর-নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ত্যজ, উচ্চবর্ণ সকলেই দেখবে – ইনিই জগদ্‌গুরু (La homme Universale), অবশ্য জীবিত অবস্থায়। মৃত জগদ্‌গুরু হয় না।

"মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।"

'কানে' – বাইরে।

---

* দ্রষ্টব্য-১ম ভাগের ১৪৯ নং ব্যাখ্যা।

'প্রাণে' – অন্তরে – ষষ্ঠভূমিতে – আজ্ঞাচক্রে। অবশ্য বাণী 'নাদ' থেকে আসে। আজ্ঞাচক্র – প্রকাশের পথ।

৫১৩। **"যিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তিনিই সাধু।"**

ঠাকুরের জীবন। এতদূর এ জগতে গড়াবে না। এখন যদি ভগবান কারো জীবনে এরূপ ঐশ্বর্য দেন, লোকে ভাববে – এ ছল। তবে স্থূল লক্ষণ আছে – তিনি কারোর কিছু নেবেন না। লোকে দিতে এলে বলবেন, – "আমি কারোর কিছু লই না।"

ঠাকুরকে এক মাড়োয়ারী ভক্ত দশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। ঠাকুর নিলেন না। কেন ? সেই দশ হাজার টাকা ত' দান করে দিতে পারতেন – 'জগদ্ধিতায়'। না, সাধুর গ্রহণ নিষেধ – অপরিগ্রহ। "জগতের কল্যাণ ঈশ্বর করেন।" 'ও যারা করবে তারা অন্য থাকের লোক', অর্থাৎ সাধু নয়, সমাজ কর্মী।

৫১৪। **"…. সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন।"**

"সন্ন্যাসী নারীর ছবি পর্যন্ত দেখবে না।"

'অন্তরে' কথাটির দুটি অর্থ।

প্রথম – 'অন্তরে' মানে – দূরে। সাধুর কাছে নারী আসবে না।

দ্বিতীয় – 'অন্তরে' মানে – দেহের ভিতরে। সহস্র সহস্র নারী তাঁকে বাইরে না দেখে তাদের অন্তরে, ঘরে বসে দর্শন করবে। এমন কি সুদূর আমেরিকায় – দশ হাজার পাঁচ শত মাইল দূরে থেকেও দেখবে। একে 'মহাযোগ' বলে। সাধু – কুটীচক, বহূদক – সাধক।

৫১৫। **"সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন।"**

'চিন্তা' – ধারণা – সপ্তমভূমি – সমাধি।

৫১৬। **"ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কথা কন না।"**

পঞ্চমভূমি ও ষষ্ঠভূমির মধ্যে বাচ্ খেলান।

৫১৭। **"…. তাদের সেবা করেন।"**

ভক্তি ও জ্ঞান দান করেন। মহাপ্রভু ভক্তি দান করে গিয়েছেন; ঠাকুর 'ভক্তি ও জ্ঞান' দুই দান ক'রে গিয়েছেন। অন্নদান নিকৃষ্ট দান।*

৫১৮। **"যতদিন চারা, ততদিন চারদিকে বেড়া দিতে হয়।"**

সূক্ষ্মভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ – এই অবস্থায় গুপ্তভাবে থাকা।

৫১৯। **"গাছের গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার নাই।"**

মহাবায়ু জাগরণ হ'লে আর লুকিয়ে রাখা যায় না। একেই বলে – প্রেম হওয়া – "প্রেম ভগবানকে বাঁধবার রজ্জুস্বরূপ।"

---

* আর এর উপর আছে আত্মদান। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁর চিন্ময়রূপ দেখে তাদের অন্তরে ও বাইরে।

৫২০। **"তখন হাতি বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙ্গবে না।"**

'হাতি' – মন। যোগীর মন দেহেতে আবদ্ধ – মন আর বাইরে যায় না। ব্রহ্মবিদ্যার বিনাশ হয় না।

৫২১। **"তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো, হাতে আঠা জড়াবে না।"**

চৈতন্যলাভ ক'রে কখন বিজ্ঞানময় কোষে, কখনও বা আনন্দময় কোষে থাক, তাহলে মায়ায় কখনও বদ্ধ হতে হবে না।

৫২২। **"যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু।"**

এটি হলো নিগমের বিবেক – নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি – বিজ্ঞানীর অবস্থা।

বিবেক হওয়া – ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে, 'আমি একাই আছি' – নাম-রূপ উড়িয়ে দিয়ে। "অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তো'সি" (individualism)। মনুষ্যজাতি যখন একজন জীবিত লোককে অন্তরে দেখে সে কথা প্রকাশ করে তখন – বহুত্বে একত্ব! বাইরে বহু কিন্তু ভিতরে এক, – এই হলো প্রকৃত বিবেক। এখানে নাম-রূপ উড়িয়ে দেবার দরকার নেই (universalism)।

৫২৩। **"বিবেক উদয় হ'লে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়"।**

আগমের বিবেক উদয় হয় সপ্তমভূমিতে। ঈশ্বর সৎ আর সমস্ত অসৎ – এই বিবেক। ঈশ্বরকে জানা – আত্মার সাধন।*

৫২৪। **"মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়।"**

'নিবৃত্তি' – সচ্চিদানন্দগুরু লাভের পর আপনা হতে জপ আরম্ভ হয়– এই জপে দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হয় – তখন দেহেতে যোগ আরম্ভ হয়েছে, মন স্থির হয়েছে, নিবৃত্তির সূচনা। সূক্ষ্মভাবে কুণ্ডলিনী জেগেছেন, মন – লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি ছেড়েছে, – ষোল আনা এরকম যদি কারো হয়, তিনি দক্ষিণ দিকের তলপেটের নীচে প্রাণময় কোষ দেখেন – তাঁর মন অন্নময় কোষ ছেড়ে প্রাণময় কোষে পরিণত হয়েছে। আত্মা কৃপা ক'রে দেহ থেকে মুক্ত হয়েছেন।

'বিবেক' – চতুর্থভূমিতে মন এলে চারিদিকে জ্যোতিদর্শন হয়, আর সাধক বলেন, ' এ কি! এ কি!' এই বিবেকের সূত্রপাত। দেহ ছাড়া আমার ভিতর আর একটা যেন কি আছে, আর একটা যেন কি আছে! পূর্ণ বিবেক হলো – পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান – চুপ। তারপর তত্ত্বজ্ঞানে 'তুমি'! অবশ্য এসব অনেক দূরের কথা। দেহের মধ্যে সাধকের অনুভূতির দ্বারা নিবৃত্তি ও বিবেকের সৃষ্টি হয়। দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন হয়।

---

* বিশদ ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫২৫। **"তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয়, কালীকল্পতরু মূলে।"**

মন বেড়াতে চলেছে; পঞ্চমভূমি, ষষ্ঠভূমি, সপ্তমভূমির শেষ সীমানায় – কল্পতরু। এই কল্পতরুর অপর নাম অমৃতবৃক্ষ – আমগাছ। যুবা আমগাছ, – তেজ আর সৌন্দর্য যেন চারিদিক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে – গাছের নিচের ডালে ছোট আম – আর উঁচু ডালে খুব বড় আম। এই হলো পূর্ণাঙ্গ অনুভূতি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে – এই আমগাছের উল্লেখ আছে – কিন্তু বড় রূপক।

এই কল্পতরুর দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতি – প্রথমে প্রদীপের আলো, দ্বিতীয় – রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, তারপর কল্পতরু। একসঙ্গে পরপর তিনটি দেখতে পাওয়া যায়।

৫২৬। **"…. চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।"**

কুড়াতে হয় না – আপনা হ'তে হাতে আসে। আর চার ফল নয় – এক ফল, – খোসা ছাড়ান এক প্রকান্ড আম। উন্মত্তের ন্যায় দ্রষ্টা তাতে কামড় দেন, আর খেতে থাকেন – নাক জুবড়ে খান, তবুও আঁটি পান না। এর বহু পরে খোসা ও আঁটি খেতে পান – চুষে খান। ঐ আঁটি হলো – ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ – ফেলে দেন। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত চর্তুবর্গ চায় না, হরিপাদপদ্মই সার, ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তিই সার।

৫২৭। **"বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়।"**

এই হলো পূর্ণ অবতারতত্ত্ব – এক অবতার আছেন, আর সমস্ত – ঈশ্বর -মায়া-জীব-জগৎ–তাঁর ভিতর, সগুণ-নির্গুণ – তাঁর ভিতর, একা তিনি আছেন । মা যশোমতীর কোলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাচ্ছেন, হঠাৎ হাই তুললেন – যশোমতী দেখলেন সমস্ত বিশ্বসংসার শ্রীকৃষ্ণের গালের ভিতর – সেখানেও যশোমতী কৃষ্ণ কোলে ক'রে আছেন।

ভূষণ্ডী রামের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পালাচ্ছে। যেখানে যাচ্ছে, সেইখানেই রাম। কোথাও রাম তাড়কা বধ ক'রছেন, কোথাও রাম হরধনু ভঙ্গ করছেন, কোথাও রাম রাবণ বধ করছেন, আর একদিক দিয়ে রামের হাত ভূষণ্ডীকে ধ'রবে বলে চলেছে। ভূষণ্ডী দেখল রামের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। ভূষণ্ডী ধরা দিল। রাম ভূষণ্ডীকে টপ্ ক'রে নিজের গালে ফেলে দিলেন। ভূষণ্ডী চোখ চেয়ে দেখল, সে যে গাছে বসতো, সেই গাছের ডালে বসে আছে, – সব জড়িয়ে এক।

৫২৮। **"অনুলোম বিলোম…."**

নির্গুণ অবস্থা ও পূর্ণ অবতারত্ব। এর অপর নাম 'নিত্য-লীলা'।

৫২৯। **"ঘোলেরই মাখন…."**

দেহ থেকে আত্মা।

৫৩০। **“......মাখনেরই ঘোল।”**

আত্মা থেকে নির্গুণতত্ব, আবার নির্গুণ থেকে অবতারতত্ব।

৫৩১। **“যদি ঘোল হয়ে থাকে তবে মাখনও হয়েছে।”**

যদি ঘোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়ে থাকে, তাহলে আত্মা সাক্ষাৎকার ও পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে।

৫৩২। **“যদি মাখন হ’য়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে।”**

নির্গুণ থেকে অবতারত্ব।

৫৩৩। **“আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।”**

সূক্ষ্ম থেকে স্থূল – দুই-ই একের অবস্থা – আবার দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিত – ইতি হয় না। নিত্য-লীলা, লীলা-নিত্য – ক্রমাগত – মাঝখানে একটুও ফাঁক নেই।

৫৩৪। **“যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য।”**

নির্গুণ থেকে সগুণ – সচ্চিদানন্দগুরু – আবার সচ্চিদানন্দগুরু থেকে চুপ্ হওয়া পর্যন্ত – নির্গুণ।

৫৩৫। **“তিনি দু-এক জনেতে অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন!”**

‘দু’ – এটি মাত্রা মাত্র – অর্থাৎ একজনের – ঠাকুরের।

জগদ্ব্যাপী না হ’লে অহংকার যায় না।

‘দ্বিতীয়’ জ্ঞান যার আছে তার অহং যায় নি। আমি একা অবতার নই, জগতের প্রত্যেকটি মানুষই ‘আমি’ – আত্মিক জগতে অবতার – তখন অহংকার করবার দ্বিতীয় নেই। “One is all and all is One” – ঈশ্বরতত্ত্ব ও সদ্‌বিদ্যাতত্ত্ব-কাশ্মীরী শৈববাদ (Kashmir Shaivism)।

৫৩৬। **‘ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি ‘দাস আমি’ রেখে দেন।”**

পাকা আমি – অবতারলীলা। এটি হলো ভক্তিবাদ বা দ্রাবিড়ী (Dravidian) কিংবা সেমিটিক (Semitic) কৃষ্টি। ব্যষ্টিতে আবদ্ধ।

বেদান্তে অবতার নেই, আছে জগদ্ব্যাপিত্ব। যাজ্ঞবল্ক্য উষস্তকে যা বলছেন তার ইংরেজী অনুবাদ হল- “Your Soul is the inner-self of all beings.”

‘Self’ – একটি জীবন্ত মানুষের মূর্তি।

‘Universal Self' *– “In the beginning there was Self alone in the shape of a person”, (The Bibles of the World.)

৫৩৭। **“ যে মনে বিষয় বাসনা নাই, সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাকে জানা যায়।”**

---

* Soul – Universal Self.

আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানা যায় – শেষে বোধ মাত্র। আত্মাই একমাত্র শুদ্ধ (Pure, Moral)।

৫৩৮। **"....ঠিক কে জানবে ?"**

চৌদ্দ পোয়া শরীরে ঈশ্বরের সব ঐশ্বর্যের বিকাশ হয় না। যে সময়ে যা দরকার, সেইটুকু প্রকাশ পায় – অবতারে – যুগের আদর্শ পুরুষে।

৫৩৯। **"মানুষের কি শক্তি আছে ?"**

"তুমি হাজার চেষ্টা কর, তিনি কৃপা না করলে কিছু হবে না।"*

১৫ই জুন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ
সুরেন্দ্রের বাড়ী

৫৪০। **"সখি ! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়,"**

নিগম – 'মানুষ-রতন' – প্রাণবল্লভ।

৫৪১। **"নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।"**

আগম – আদ্যাশক্তির ব্রহ্মে পরিবর্তিত হওয়া – সমাধি। আগম ব্রহ্মবিদ্যা কিন্তু অবতারতত্ত্ব ব্রহ্মবিদ্যার পার। শ্রবণ, মনন, কীর্তন করলেই 'মানুষ-রতন'কে দেখতে পাওয়া যায় না। 'মানুষ-রতন' পূর্ণলীলা – আবার এই লীলা থেকে যখন নিত্যে যায় তখন উৎকট বিরহ – যেমন শ্রীমতীর – শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাবার পর – আবার যেমন মহাপ্রভুর – কৃষ্ণবিরহে ছট্ ফট্ করছেন – কখনও সমুদ্রের কূলে – কখনও বা চটক পাহাড়ে ছুটছেন।

৫৪২। **"সখি ! তাঁর কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে।"**

'সখি' – দেহ – আদ্যাশক্তি – এখন প্রিয়বস্তু, কারণ এই আদ্যাশক্তি শ্রীকৃষ্ণরূপে কারণশরীরে মূর্ত হয়েছিলেন – দেহ কৃষ্ণ-মন্দির। আবার সেই কৃষ্ণরূপ ধারণ কর – আমি দেখি। ভক্ত লীলা চান।

৫৪৩। **"আমি তোমার দাসী হব।"**

আমি বিলাস করব – আমি ও তুমি – দ্বৈতবাদ।

৫৪৪। **"তুই তো কৃষ্ণপ্রেম শিখায়েছিলি !"**

'বিশাখা দেখাল চিত্রপটে।' এই কৃষ্ণ-দরশনে কৃষ্ণ 'প্রিয়'। সচ্চিদানন্দগুরু আত্মাকক্ষাৎকার করালে, তবে 'অস্তি, ভাতি, প্রিয়'। "না দেখলে ভালবাসবি কাকে ?"

---

* 'কৃপা'– আপনা হতে হওয়া। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"– শ্রুতি।

৫৪৫। **"প্রাণবল্লভ!"**

প্রাণের ঈশ্বর – সার বস্তু – কারণশরীর – কৃষ্ণমূর্তি – ইষ্টের রূপ – পরে আত্মা।

৫৪৬। **"সখি! যমুনার জল আনতে আমি যাব না। কদম্বতলে প্রিয়সখাকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।"**

"পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়!"

নিত্য থেকে লীলায় আসতে চাওয়া, – হচ্ছে না – তাই উৎকট বিরহ।

৫৪৭। **"আমার কানু অনুগত তনু।"**

জন্মাবধি দেহের গঠন এরকম – আপনা হতে দেহেতে আত্মিক স্ফুরণ হয়।

৫৪৮। **"সপ্তমদ্বার পারে রাজা বৈঠত, তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী।"**

নারীর দেহে কুণ্ডলিনীর গতি – ষষ্ঠভূমি – কারণশরীর – ইষ্টমূর্তি। সহস্রারে আত্মা – সপ্তমভূমি – রাজা। নারীর গতি সেখানে নেই। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার কথা শুনেছিলেন, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হলে শুনতে হত না। গোপালের মা'র 'গোপাল' – আত্মাসাক্ষাৎকার হয় নি। তিনি নিজেই সে প্রমাণ রেখে গেছেন – 'বাবা, আমার কি হয়েছে, না বাকী আছে?' এই সংশয়! মাহেশে রথযাত্রায় ভূতে ভূতে গোপাল দর্শন – আংশিক বিশ্বরূপ – ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট মাত্র।

৫৪৯। **"রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়।"**

নিত্য নয় – লীলা। চিনি হতে ভালবাসি না, চিনি খেতে ভালবাসি।
নিত্য – রাধে – দেহ।
লীলা – কৃষ্ণ – দেহ থেকে কৃষ্ণ। "স্বশরীরাৎ সমুত্থায়।"
সাংখ্যের দ্বৈতবাদ – প্রকৃতি ও পুরুষ।
দেহ – প্রকৃতি। কৃষ্ণ – পুরুষ।

৫৫০। **"এ ছোকরাটি বড় সরল।"**

ঋজু দেহ। ঋজু দেহে সহজে আত্মিক স্ফুরণ হয়। নিরঞ্জন মহারাজের দেহ সোজা ছিল – ছবি দেখলে বুঝতে পারা যায়।

৫৫১। **"সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না।"**

পূর্বজন্মের সংস্কার – আংশিক নিত্যসিদ্ধ।*

৫৫২। **"কপটতা; পাটোয়ারী – এসব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"**

---

* পূর্বপুরুষের সংস্কার

'কপটতা, পাটোয়ারী' – অবিদ্যাশক্তি – পাশ। যে শরীরে কপটতা পাটোয়ারী, সেখানে আত্মিক স্ফুরণ হয় না।

৫৫৩। **"আহা, গোপীদের কি অনুরাগ!"**

এই অনুরাগে দেহ লাল হয়ে ওঠে, আর রক্ত ঊর্ধ্বমুখী হয় – যোগের লক্ষণ দেহে ফুটে বেরোয়। রাজযোগযুক্ত দেহে আত্মা নিঃসৃত হবার সময় এই লক্ষণ দেহেতে প্রকাশ পায়। এ রাজযোগ আপনা হতে হয়।

৫৫৪। **"তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ!"**

শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি – দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

৫৫৫। **"শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁঝে শুকিয়ে যেতো – জল হতে না হতে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো।"**

অন্তরে কৃষ্ণ মূর্তি ধারণ করবার আগেই নিরাকারে লয় হত।

৫৫৬। **"কখনও কখনও তাঁর ভাব কেউ টের পেত না। সায়ের দীঘিতে হাতি নামলে কেউ টের পায় না।"**

লীলা থেকে নিত্য – 'কৃষ্ণগন্ধ গায়ে নাই, কৃষ্ণকথা মুখে নাই'। চেহারা দেখলে বোধ হয় ভেতর যেন পুড়ে গিয়েছে। "আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গিয়েছি।" এই হল বিবর্ণ – অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণের একটি লক্ষণ। সাদা ফ্যাকাশে কিংবা ঈষৎ কালো।

৫৫৭। **"তাঁকে ভালবাসতে হবে।"**

মন একাঙ্গী হবে। হনুমান বার, তিথি, নক্ষত্র ও সব কিছু জানে না – এক রাম চিন্তা করে।

কপিবৎ মহাবায়ু যখন সহস্রারে যায় তখন এই ভালবাসা। বেদমতে পাঁচ প্রকার সমাধির এক প্রকার সমাধি। ধর্ম রাজযোগের উপর স্থিতিলাভ করে, আর যোগের বিভূতি দেহেতে প্রকাশ পায় – তবে ধর্ম।

৫৫৮। **"তার জন্য ব্যাকুল হতে হবে।"**

কুণ্ডলিনী জাগরণ ও হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হওয়া। মন যখন চতুর্থভূমি ও পঞ্চমভূমির মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ে আসে – তখন এই ব্যাকুলতা।

৫৫৯। **"তা তুমি যে পথেই থাক।"**

আপনি হিন্দু হন, বৌদ্ধ হন, মুসলমান হন, খ্রীষ্টান হন, পারসী হন – দেহের মধ্যে আত্মা সাক্ষাৎকার – বাইরে কোথাও নয়।

৫৬০। **"তখন তিনি কেমন, নিজেই জানিয়ে দেবেন।"**

'আত্মা' যদি কৃপা করে সাধন করে জানিয়ে দেন, তবে জানতে পারা যায়।

তখন সাকারে বিশ্বাস হবে, নিরাকারে বিশ্বাস হবে – আবার মানুষের ভিতর তিনি অবতীর্ণ হয়ে ‘মানুষ-রতন’ হন, এতেও বিশ্বাস হবে। না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই ষোল আনা সাধন – ভগবানের লীলা – মায়ার পূর্ণ রহস্য ভেদ হলে তবে ষোল আনা বিশ্বাস – পূর্ণাঙ্গ ধারণা।

৫৬১। **“যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।”**

পাগল হতেই হয় – তা নইলে বস্তুলাভ হয় না।

৫৬২। **“রাম অধ্যক্ষ ! তবেই হয়েছে।”**

‘রাম’ – এক – অস্তি – নির্গুণ – নির্গুণে লীলা নেই।

৫৬৩। **“বড় স্পষ্টবক্তা, কারুকে ভয় করে কথা কয় না।”**

অভী – পাশ খুলে যাওয়া – ব্যবহারিক লক্ষণে প্রকাশ পায়।

৫৬৪। **“আর দেখো খুব মুক্তহস্ত।”**

‘লোকটা ধার্মিক হয়েছে মানে কি জানিস্ ? লোকটা উদার হয়েছে।’

৫৬৫। **“.......নাম ব্রহ্মের পূজা হয়।”**

জপ থেকে নির্গুণ অবস্থা। *

৫৬৬। **“এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত।”**

অহংকারের জাহাজ।

৫৬৭। **“এমন জায়গায় ডিঙি-টিঙি আসতে পারে।”**

সপ্তমভূমিতে ডিঙি যায় – এ দেখতে পাওয়া যায়। ‘ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন ?’ ‘অহং’ – নিম্নাঙ্গে জাহাজ। যত ঊর্ধ্বে যাচ্ছে ততই অহং নাশ হচ্ছে। শেষে সপ্তমভূমিতে ‘ডিঙে’ – বোধ মাত্র – ক্রমমুক্তিবাদ।

৫৬৮। **“........এ যে একেবারে জাহাজ।”**

সুতোয় আঁশ থাকলে ছুঁচের ভেতর যায় না। অহংকার লেশমাত্র থাকলে, আত্মাসাক্ষাৎকার হয় না।

৫৬৯। **“তবে একটা কথা আছে। এটা আষাঢ় মাস।”**

ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন – প্রেমের বন্যা – ‘জগাই-মাধাই উদ্ধার’।

৫৭০। **“আমি করছি, এটি অজ্ঞান থেকে হয়।”**

ঈশ্বর আছেন এ জানে না, তাই ‘আমি কর্তা’ – এই মনে হয়। এটি অজ্ঞান থেকে হয়।**

৫৭১। **“হে ঈশ্বর, তুমি করছ – এইটি জ্ঞান।”**

---

* শিকলের পাব ধরে ধরে গিয়ে নোঙর পাওয়া।

** ভগবান দর্শন না হলে ভগবান যে আছেন তা মনে হয় না। ‘খুড়ী জেঠীর ভগবান’– বিচারাত্মক।

শুধু জ্ঞান নয় – তত্ত্বজ্ঞানে বিজ্ঞানীর অবস্থা। ''গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে – জানবে সেও ভগবানের ইচ্ছা।'' '' রামের ইচ্ছা''।

এ হলো দ্রাবিড়ী কৃষ্টি ('বসানো শিব'– Hypothesis–Dravidian, Semitic or Non-Aryan Cult)। এর পরিণতি – প্রেমোন্মাদ, ভক্তি উন্মাদ আর জ্ঞানোন্মাদ, – উন্মাদ!

সনাতন ধর্ম ('পাতাল ফোঁড়া শিব' – ঋষিদের ধর্ম – Aryan Cult 'আত্মা যাকে বরণ করে তার') জগদ্ব্যাপী করে। যাঁর দেহেতে আত্মা প্রকাশ পাবে তাঁকে অসংখ্য নরনারী অন্তরে দর্শন করে একত্ব প্রচার করবে–'One and Oneness.'

৫৭২। **'' 'আমি' 'আমি' করলে যে কত দুর্গতি হয়,বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে।''**

যতদিন দেহকে 'আমি' বোধ – ততদিন উপর্যুপরি যন্ত্রণা – যন্ত্রণার শেষ নেই।

৫৭৩। **''যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয়, তখন ধোন্‌বার সময় তুঁহু তুঁহু বলে।''**

'ধুনুরী' – সচ্চিদানন্দগুরু।

'তাঁত' – কুণ্ডলিনী – সুষুম্না – সোজা চলেছে।

সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় কুণ্ডলিনী জাগরণ, আত্মাসাক্ষাৎকার, ব্রহ্মজ্ঞান – পরে তত্ত্বজ্ঞান – তবে নিস্তার – জীবন্মুক্ত অবস্থা।*

৫৭৪। **''যদি কারুর অহংকার গিয়ে থাকে, তাঁর অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।''**

যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে – ষোল আনা – তাঁর দেহেতে কাম থাকে না। তাঁর সামনে 'কাম' বললে – তাঁর দেহে রামের প্রকাশ হয়। রামের প্রকাশ – মহাবায়ু কপিবৎ সহস্রারে উঠে যাবে, – দেহটা টকাং করে নড়ে উঠবে, মুখমন্ডল স্ফীত হবে, – দাঁড়ানো ছবিতে সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের যেমন দেখতে পাওয়া যায়, আর সমাধিস্থ হবে, – তা 'ভাব' সমাধিও হতে পারে, আবার 'জড়' সমাধিও হতে পারে।

৫৭৫। **''পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়।''**

আত্মাসাক্ষাৎকারের পর – আমি আত্মা – সগুণ ও নির্গুণ – এ দুই অবস্থা।

৫৭৬। **''লোহার তরোয়াল সোনার তরোয়াল হয়ে যায়।''**

চৈতন্য সাক্ষাৎকার ও চৈতন্যময় হয়ে যাওয়া – নিগম – অবতারতত্ত্ব।

৫৭৭। **''তরোয়ালের আকার থাকে, কারু অনিষ্ট করে না।''**

দেহ থাকে কিন্তু নির্গুণ।

---

* প্রকৃত জীবন্মুক্ত অবস্থা হচ্ছে – জগদ্ব্যাপীত্ব – Universalism।

৫৭৮। "সোনার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।"

নিষ্ক্রিয় – দেহ চিন্ময় – 'সাধুর দেহ চিন্ময়'।*

৫৭৯। "তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে।"

সংস্কার – প্রারব্ধ। মন শুদ্ধ হ'লে এসব কিছু কিছু অনুভূতি হয় – তবে বুঝতে পারা যায়। কোন কোন ভাগ্যবান লোক সাধন অবস্থায় প্রারব্ধ দেখতে পান – ছবির মতন দেখতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ মনেও অতীতের কথা জাগে। আবার স্বপ্নেও বহু পুরাতন কালের অতীত জীবন দেখতে পাওয়া যায়।

৫৮০। "......তা তুমি ইচ্ছা কর আর না কর।"

যা হবার তা হয়েই আছে। বিশ্বরূপ দর্শনের আগে – কাল ও স্থান সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটে – ক্রমাগত ভবিষ্যৎ দেখায়। কাল কী হবে, আজ রাত্রে দেখা গেল – এই রকম ক্রমাগত হতে লাগল। তখন বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায় – হবে কোথায় – ও তো হয়েই আছে।

৫৮১। "তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।"

তিনি জ্ঞান -ভক্তি দান (বিক্রি নয় – 'আমি কারুর কিছু নিই না') করেন। তা নইলে নিষ্ক্রিয়।

৫৮২। "ভক্তিযোগ........"

ভক্তির দ্বারা দেহেতে যে যোগ হয়। যোগ – পরিবর্তন। ভক্তিযোগের অপর নাম রাজযোগ – দেহেতে আপনা থেকে হয়। কোন কোন ভাগ্যবান লোককে সচ্চিদানন্দগুরু এক রাত্রের মধ্যে পূর্ণ রাজযোগ শিক্ষা দেন। আবার কখনও সচ্চিদানন্দগুরু আংশিক ভাবেও শিক্ষা দেন।

৫৮৩। "................নারদীয় ভক্তি।"

সর্বত্যাগীর ভক্তি – যেমন ঠাকুর ও মহাপ্রভুর ভক্তি। তবু মহাপ্রভুর ভক্তিতে যথেষ্ট বিবিদিষার লক্ষণ আছে, কিন্তু ঠাকুরের ভক্তিতে বিবিদিষা বলে কোন বস্তু নেই। মহাপ্রভু প্রসাদ খান কলার পাতে, আর তরকারি কলার বাসনায় – ইচ্ছা করে ধাতুর দ্রব্য স্পর্শ করেন না। ঠাকুরের ইচ্ছা হয় ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করেন, কিন্তু ব্যবহার তো দূরের কথা ছোঁবার পর্যন্ত জো নেই – হাত বেঁকে যাবে, ঝন্‌ঝন্‌ কন্‌কন্‌ করবে।

মহাপ্রভু গম্ভীরা থেকে নবদ্বীপে আসবেন – সকলে তাঁকে দেখতে আসতে পারবে – শুধু আসবে না দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া – তাই হলো।

জয়রামবাটী থেকে মাঠাকরুন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর একথা শুনে,

---

*এই চিন্ময় দেহ জগদ্ব্যাপী হয়। তাঁকে নরনারী ভিতরে দেখে আর বলে---চিন্ময় দেহের প্রমাণ দেয়।

গঙ্গার ধারে গিয়ে, হাতজোড় করে বলছেন – "তুমি এসেছ, তুমি এসেছ! মথুর নেই, তোমায় আদর যত্ন কে করবে?"

প্রকৃত নারদীয় ভক্তির আরম্ভ – সচ্চিদানন্দগুরু লাভ থেকে। মধ্য স্তর – যখন আত্মা ও দেহ পৃথক হয়। আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে সন্ন্যাসী হয়। আর সর্বোচ্চ স্তর – অবতারতত্ত্বের 'মানুষ-রতন' – যিনি দেহের মধ্যে ভক্তের রূপ ধ'রে হরিনাম করেন।

৫৮৪। **"ওলা মিছরির পানা।"**

ব্রহ্মানন্দ।

৫৮৫। **"চিটে গুড়ের পানা।"**

বিষয়ানন্দ।

৫৮৬। **"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।"**

ভক্তিলাভ – স্বস্বরূপ দর্শন – জীবন-মৃত্যু রহস্য ভেদ – "বাবু, সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হলো না।"

৫৮৭। **"তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্তা – আমরা অকর্তা।"**

ব্রহ্মজ্ঞানের পর তত্ত্বজ্ঞান।

৫৮৮। **"কাঠুরে, ব্রহ্মচারী ও 'এগিয়ে পড়ো'....ইত্যাদি।"**

'ব্রহ্মচারী' – সচ্চিদানন্দগুরু।

'কাঠ' – স্থূল শরীর। 'চন্দনের গাছ' – সূক্ষ্ম শরীর।

'রূপার খনি' – কারণশরীর। 'সোনার খনি' – সহস্রার।

'হীরে-মানিক' – ব্রহ্মজ্ঞান – তত্ত্বজ্ঞান – চৈতন্যসাক্ষাৎকার –অবতরণ – লীলা ইত্যাদি।

৫৮৯। **"তাঁকে দর্শন হবে।"**

জ্ঞানীর অবস্থা।

৫৯০। **"ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।"**

বিজ্ঞানীর অবস্থা।

৫৯১। **" দেখ, - প্রতাপ, অমৃত, এসব শাঁখ বাজে।"**

কোন কোন দেহে কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন বীণার মধুর ঝঙ্কার ক'রে – অর্থাৎ 'নাদে' – শব্দে। এই রকম শরীরে কুণ্ডলিনী যখন হ্লাদিনী ভেদ করে তখন শঙ্খের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রতাপ, অমৃত – এঁদের কিছু ভক্তিলাভ হয়েছে।*

---

* পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশঃ (গীতা)।

৫৯২। **"রস -স্বরূপ...."**

পঞ্চরস বা ভাব।

"'পঞ্চরস' — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পঞ্চরস আশ্রয় ক'রে ঈশ্বরের কৃপায় ভগবান্ লাভ ও ব্রহ্মজ্ঞান। আবার ব্রহ্মজ্ঞানের পর এই পঞ্চরসের পূর্ণ আস্বাদন। পঞ্চরসের পূর্ণ স্ফুরণ ঠাকুরের একাধারে যে রকম দেখা গিয়েছে, এর আগে সে রকম দেখা যায় নি।

আগমের পঞ্চরস — কাঁচা। নিগমের পঞ্চরস — পাকা।*

৫৯৩। **"এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও।"**

ছড়ানো মন কুড়িয়ে নিয়ে এসে দেহেতে আবদ্ধ কর — সাধন কর।

'তুমি আনন্দে ত্রিবেণী স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে'।

৫৯৪। **"একজন লোকের পাহাড়ের ওপর একখানি কুঁড়েঘর ছিল,......"ইত্যাদি।**

'কুঁড়েঘর' — দেহ। 'ঝড় এলো' — সময় হল — কাল।

'পবনদেব' — মহাবায়ু। 'হনুমান' — প্রেমতনু।

'লক্ষ্মণ' — জীবাত্মা। 'রাম' — এক — ব্রহ্মজ্ঞান।

'যাঃ শালার ঘর' — জীবন্মুক্ত অবস্থা।

৫৯৫। **"এখন ডুব দাও।"**

সমাধি — মীন হয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে তলিয়ে যাওয়া আবার ভাসা — 'টাপুর টুপুর — টাপুর টুপুর'— বরফের চাঁই জলের ওপর।

৫৯৬। **"মনে করো না যে বেশি ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।"**

'চৈতন্যকে চিন্তা করে কেউ অচৈতন্য হয় না।'

৫৯৭। **"মানুষ অমর হয়!"**

মৃত্যু ধ্রুব! জন্ম-মৃত্যু রহস্য ভেদ হলে — অজ, নিত্য।

ব্রহ্মজ্ঞানের পর জন্ম-মৃত্যু রহস্য — মায়ার রহস্যভেদ হয় — জীবন্মুক্ত অবস্থা ইত্যাদি..........এসব অবতারের।

৫৯৮। **".......দয়া।"**

সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

৫৯৯। **"শুকদেব, নারদ, এঁরা দয়া রেখেছিলেন।"**

তাই জ্ঞান, ভক্তি দান করেছিলেন। ভক্তিদান, জ্ঞানদান — উৎকৃষ্ট দান। অন্নদান — নিকৃষ্ট দান।

৬০০। **"যাঁরা মহাশয়ের কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে?"**

---

*'তলপেটে কোটি পদ্ম' - চণ্ডীদাস। নিগমের পঞ্চরস হলো তলপেটে।

ঠাকুর এ কথার জবাব দিলেন না। এর মানে – দৃষ্টি নিজেতে আবদ্ধ কর, অপরেতে নয়। আর তাছাড়া, তুমি এসব বুঝতে পারবে না; নিষ্কাম শুদ্ধ মন হলে বুঝতে পারতে।

৬০১। "আমি বলি যে, সংসার করতে দোষ কি?"

যাদের ষোল আনা হবে না – তাদের। সংসারে তাঁরা বদ্ধ হন না যাঁদের ষোল আনা, – নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারাদি।

চৈতন্যদেব বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু সে ত্যাগ দেখাবার জন্য – কী করে ত্যাগ করতে হয় – এই শিক্ষা। ঠাকুরের বিবাহ হয়েছিল – নারীর মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য – আদর্শ নরনারী – 'কামগন্ধ নাহি তায়'।

৬০২। "এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে, এ কথা অনেককেই মানতে হয়েছে।"

ইউরোপের – জগতের বাইরে ভগবান – এই ধারণা। ঠাকুরের 'ম' আর 'রা'। আগে 'ম' – ঈশ্বর – আত্মা; পরে 'রা' – আত্মার মধ্যে জগৎ।

ইউরোপের লোকের দেহের গঠন, জলবায়ু এ রকম যে দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হন না। ইউরোপে এমন কোন লোক নেই, যাঁর আত্মাসাক্ষাৎকার হয়েছে। তাঁরা বাইরে ভগবানকে খোঁজেন – অবশ্য যাঁরা খোঁজেন তাঁরা।

৬০৩। "নুচি খাই নাই মনে হলে আবার আসবার ইচ্ছা হবে।"

যতক্ষণ প্রবৃত্তি, ততক্ষণ বারবার জন্ম – যন্ত্রণা। শ্রেয় নিবৃত্তি।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

আত্মার সাধন বা বিদেহ সাধন বা বেদান্তের সাধন আর তার প্রমাণ –

বিদেহ সাধন দুই রকম - ব্যষ্টি এবং জগদ্ব্যাপিত্বে।

ব্যষ্টি - বেদান্তের সাধন - ম, রা, বীজ, স্বপ্নবৎ, লয়।

ম - আত্মা বা ভগবান বা ব্রহ্ম।

রা - আত্মার মধ্যে জগৎ - বিশ্বরূপ।

বীজ - বিন্দুমাত্র (Mathematical point) - জড় সমাধি।

স্বপ্নবৎ - বীজ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় - অনুভূতি সাপেক্ষ।

লয় - স্থিতসমাধি, মহানির্বান বা মহাকারণে লয় হওয়া।

বিশ্বব্যাপিত্বে - 'ম' - সহস্রারে সচ্চিদানন্দগুরু যাকে ভগবান দেখিয়ে দেন তিনি 'ম'। To see God means to become God. মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ - সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তাঁকে হাজার হাজার নরনারী শিশু বৃদ্ধ দেহের ভিতরে এবং বাইরে দ্যাখে আর সে কথা জানিয়ে দেয়।

'রা' - সমস্ত বিশ্বব্যাপী মনুষ্যজাতির আত্মিক রূপ 'তিনি' - তাঁর চিন্ময় রূপ। তিনি বিশ্বরূপ। সহস্রারে আত্মার মধ্যে যে জগৎকে দেখা হয়েছিল অর্থাৎ আমিই এই মনুষ্যজাতি - এই তার প্রমাণ। মানুষ নিজেই এই প্রমাণ দেন তাঁকে।

বীজ - ঈশোপনিষদ কথিত সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ পরমব্রহ্ম আর মনুষ্যজাতি হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্ম। Absolute equality and abstract equality। যাঁকে সকলে অন্তরে বাইরে দেখে তিনি সূর্য (তেজ - মানুষের দেহে প্রাণ - এই প্রাণশক্তিকে সহস্রারে সূর্যের মতন দেখতে পাওয়া যায় - আর সেই সূর্যে থাকে তাঁর মূর্তি - নরনারী দেখে একথা বলে - "সূর্যের ভিতর আপনাকে দেখেছি।") - Absolute equality - আর যারা দেখে তারা হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্ম - Abstract equality.

এই গ্রন্থ সম্পর্কে মতামত
(১)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ও সংস্কৃত বিভাগের অধিকর্তা ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, এম.এ., পি.আর.এস্, পি-এইচ্.ডি., কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় বলেন –

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর যৌগিক ব্যাখ্যা-"ধর্ম ও অনুভূতি" নামক গ্রন্থখানি আমি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থে যোগবিভূতি ও যৌগিক অনুভূতির যে বিচিত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা বৈদিক ধর্ম ও দর্শনের অনুমোদিত সত্য। এই পরম ও চরম সত্যই 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' প্রভৃতি উপনিষদের বাণীতে ঘোষিত হইয়াছে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন – 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম'। গিরিকুন্তলা সাগরমেখলা এই বিশাল বিচিত্র ধরিত্রীর প্রতি অনুপরমাণুতে ঈশ্বর বিরাজমান। ঈশ্বর স্বীয় লীলা প্রকট করিবার জন্য জীবদেহ ধারণ করেন এবং ঈশ্বরানুগৃহীত জীবকে তাঁহার বিচিত্র লীলা দেখাইয়া থাকেন। জীবের দৃষ্টিতে যখন ভগবৎবিগ্রহ ফুটিয়া উঠে,কর্ণে সত্যের অমৃতবাণী ধ্বনিত হয়, তখনই অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ার নাগপাশ ছিন্ন হয়, জীবের প্রকৃত শিব দর্শন হয়। এই দর্শনের জন্যই জীবের অন্তরের আকূতি অনাদিকাল হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে–

"হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষণ্ণপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে"।।

হে জগৎ পোষক সূর্য! তুমি তোমার হিরন্ময় আবরণ উন্মোচন কর, আমরা তোমার প্রকৃতরূপ দর্শন করিব, সত্যধর্মা হইব এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করিব। এই সত্যের জ্যোতির্ময় রূপের কথা বিচিত্র ছন্দে এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের ব্যাখ্যাচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। অনুভূতিতেই ধর্মের বিকাশ, অনুভূতি ব্যতীত ধর্ম প্রাণহীন। ধৃতির সূত্রে পুষ্ট না হইলে অনুভূতিও সত্য দর্শনের সহায়ক হয় না। গ্রন্থখানি স্বল্পায়তন হইলেও ইহার প্রতিপাদ্য তত্ত্ব স্বল্পপরিসর নহে। বেদ,পুরাণ, গীতা, উপনিষদ্ ও বিভিন্ন হিন্দু দর্শনের অনুমোদিত তত্ত্বের সহিত ইহার নাড়ীর যোগ অবিচ্ছেদ্য। অনুসন্ধিৎসুপাঠক শ্রদ্ধার সহিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে গ্রন্থোক্ত রহস্য অনুধাবন করিতে পারিবেন। জীব যে সত্য-শিব সুন্দরেরই প্রতিচ্ছবি "চিদানন্দরূপঃ শিবো'হম্" এই মহাসত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবেন।

মতামত

(২)

যুগান্তর – গ্রন্থটির উপজীব্য – ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃতের যৌগিক রূপ। গ্রন্থকারের যৌগিক ব্যাখায় শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর অমৃতত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যাখা ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই। .... গ্রন্থকার আত্মা সাক্ষাৎকার, বেদান্তের সাধন ও অবতারত্ব সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা কোন পুস্তকের উদ্ধৃতি নহে, উপলব্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষের স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা।

(১২-১১-১৯৬১)

দেশ – এইরূপ প্রয়াস আমাদের দেশে হইয়া থাকিলেও এইভাবে হয় নাই।

(২১-০৪-১৯৬২)

উজ্জীবন – রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত অত্যন্ত সহজ সরল, যে কোন সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝার কোন অসুবিধা হয় না। লেখক এই সহজ বচন সমূহের মধ্যেই এক গূঢ়ার্থ লক্ষ্য করেছেন এবং সেইগুলিকেই ব্যাখা করেছেন। গ্রন্থকারের যৌগিক ব্যাখ্যার আলোকে রামকৃষ্ণবাণীর এক নূতন রূপ ফুটে উঠেছে যা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। (ব্যাখ্যাগুলিতে) সত্যই বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়।

অগ্রহায়ণ - ১৩৬৮

উজ্জ্বলভারত – গ্রন্থটি রচয়িতার প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রকাশ। তাই পরিচিত কথাকেও ইহা মানুষের নিকট নূতনভাবে উপস্থিত করিয়াছে। পৌষ ১৩৬৮

হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড ঃ- The book is likely to be an admirable gift for all occasions and valuable addition to any library. (19.8.1962)

ধর্ম
ও
অনুভূতি

তৃতীয় ভাগ

নিবেদন

১

একঃ।

"একং সৎ" – ঋগ্বেদ।

"স একঃ – অথর্ব বেদ।

এই 'এক' কে এবং কি?

মানুষ, আর তার দেহব্যাপ্ত প্রাণ-চৈতন্য।

দেহের সাধারণ অবস্থায় এই প্রাণ-চৈতন্য বহির্মুখীন্।

দেহের যোগযুক্ত অবস্থায় প্রাণ-চৈতন্য অন্তর্মুখীন্।

এই অন্তর্মুখীন্ প্রাণ-চৈতন্যকে কুণ্ডলিনী বলে।

এই কুণ্ডলিনী সপ্তভূমি অতিক্রম ক'রে সহস্রারে আত্মার রূপ ধারণ করে।

আত্মা, ভগবান, ব্রহ্ম, তিন-ই এক। নাম বিভিন্ন।

"এবম্ এব এষঃ সম্প্রসাদঃ,
অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়,
পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য"

এ "পরং জ্যোতি" – আত্মা – এক।

এক যে তার প্রমাণ?

ব্যষ্টি – একটি লোকের নিজস্ব দেহের সাধন – এতে প্রমাণ হয় না।

বিশ্বাস ক'রে নিতে হবে তার কথা।

বিশ্বাস – প্রমাণ নয়।

বিশ্বাসকে প্রমাণ বলা – আত্ম প্রবঞ্চনা।

আত্মা সাক্ষাৎকারের প্রমাণ হ'লো – "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে"।

যাঁর আত্মাসাক্ষাৎকার হয়েছে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর রূপ সংখ্যাতীত নরনারী-শিশুবৃদ্ধ অন্তরে দেখবে আর বলবে।

জগতের নরনারী এই আত্মা সাক্ষাৎকারের প্রমাণ দেয়।

তাঁকে নিজেকে বলতে হয় না – "মাইরি।"

আত্মা সাক্ষাৎকারের প্রমাণও "স্বয়ম্ভু।"

যারা দেহের ভেতরে আত্মাসাক্ষাৎকারীর রূপ দেখে প্রমাণ দেয় তারাও আপনা হ'তেই এ জিনিস দেখে।

জগতের লোক প্রমাণ দিচ্ছে – "একং সৎ"।

– "স একঃ"।

তথা "স উত্তমঃ পুরুষঃ।"

প্রমাণ সমেত এই সেই – 'এক'।

২

ঊর্দ্ধ্বরেতা।

রেত বহির্মুখী বা নিম্নগামী হয়ে সন্তান উৎপাদন করে।

মানুষ নিজেই নিজেকে সন্তান রূপে সৃষ্টি করে – আত্মজ।

পুত্র দর্শনে পিতার গাঢ় আনন্দ। 'পিতা নিজেকেই দেখছেন বহুরূপে।'

পিতা – সৃষ্টি কর্তা – এক।

পুত্র – বহু – আর বহু রূপ।

রেত অন্তর্মুখীন্ হয়ে সহস্রারে গমন করে – তখন সহস্রারে মধুপাত দর্শন হয়।

মধুপাতের পরিণতি – মধুবিদ্যার মাধ্যমে – "একো'হং বহুস্যাম্" – নিজেকে নিজের বিশ্বব্যাপী – অসংখ্য রূপদান – বাইরে নয় – অন্তরে – আত্মিক একত্ব। যিনি ঊর্দ্ধ্বরেত হয়েছেন মনুষ্যজাতি তাঁর চিদ্-ঘন-কায় জীবন্ত রূপ অন্তরে দেখবে আর বলবে।

সংখ্যা –সংখ্যাতীত – বিশ হাজার হ'লেও নয়।

ঊর্দ্ধ্বরেতা হওয়ার এই প্রমাণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আমরা ধৈর্যরেতা ও ঊর্দ্ধ্বরেতা দু'টি কথাই পাই। ঊর্দ্ধ্বরেতা সম্বন্ধে ঠাকুর কোন কিছুই বলেন নি – শুধু পুরাণের কাল্পনিক শুককে দেখিয়ে দিয়েছেন।

শুক মনুষ্য দেহের একটি যৌগিক অবস্থা।

ধৈর্যরেতা সম্বন্ধে বলেছেন, বার বৎসর বীর্য ধারণ করলে – মাথায় একটি নাড়ী জন্মায়, তাকে বলে মেধা নাড়ী।

সে নাড়ী জন্মালে সমস্ত কথা তার মনে থাকে – সে সমস্ত জানতে পারে।

আসল কথা ধৈর্যরেতা হ'লে – তার জাতিস্মরতা লাভ হয়।

জাতিস্মরতার অর্থ – "বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন" – নয়।

যিনি ধৈর্যরেতা – তাঁর নিজের বর্তমান জীবনের সমস্ত কাহিনী তাঁর আবশ্যক মত স্মৃতিতে উদয় হয়।

আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের সমস্ত অবতার, পরমহংস ও আচার্যের বাহিনী – অতীত এবং বর্তমান – সকলেই এ সম্বন্ধে নিস্তব্ধ ও নীরব।

জগতের অন্যান্য ধর্মগুলি – এই ঊর্ধ্বরেতা ও ধৈর্যরেতা বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ।

একমাত্র New Testament- এ একটা অর্থহীন কাকলি শুনতে পাওয়া যায় -

"Some are born eunuchs and some make themselves eunuchs."

সেই লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতেই আবদ্ধ – একটু নড়ে চড়ে চতুর্থ ভূমিতেও গেল না।

ঊর্ধ্বরেতা ও মধুবিদ্যা –

জগৎ এর বাস্তবরূপ (দেহতত্ত্ব) বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ –

"Hieroglyphic on an obelisk".

অন্ধকার আর অন্ধকার।

৩

মধুবিদ্যা

১ ম অংশ।

মধুমতী সূক্তম্ - ঋগ্বেদ

মধু

– চৈতন্যের প্রতীক (Consciousness - Knowledge)।

– বহুত্বে একত্বই চৈতন্য।

মধুমতী সূক্ত – বহুত্বে একত্বের পরিণতি।

একত্বেই জগৎ মধুময় বা মধুমতী।

মধুবিদ্যা – ছান্দোগ্য।

"ওঁ অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশো'ন্তরিক্ষমপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ।

ক। অসৌ বা আদিত্যঃ–

– ঐ সূর্যই

১) এটি বাইরের সূর্য

– আকাশে – Macrocosm.

২) সহস্রারে স্বপ্নে ও ধ্যানে আর একটি সূর্য দেখতে পাওয়া যায় –

– দেহতত্ত্ব - Microcosm.

খ। **দেবমধু** – সর্বজনপ্রিয়।

মানুষই দেবতা, তা ছাড়া আর কিছু নেই।

১) আকাশের ঐ সূর্য সকলকার–

বাইরের চৈতন্য স্বরূপ – "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" – Macrocosm.

২) সহস্রারের সূর্য – একত্বের চৈতন্য স্বরূপ – বহুত্বে একত্ব – দেহতত্ত্ব – Microcosm.

গ। **তস্য** – তার।

১) আকাশের সূর্যের অবলম্বন কী?

দ্যৌঃ – এই দ্যুলোক – Macrocosm.

২) সহস্রারে সূর্যের অবলম্বন কী?

তুরীয়– নির্গুণ ব্রহ্ম – দেহতত্ত্ব – Microcosm.

ঘ।**অন্তরিক্ষম্**

অন্তরিক্ষ দুটি।

১) বাইরে – Macrocosm.

২) দেহের ভিতরে – পঞ্চম ভূমিতে আবার সপ্তম ভূমিতে – Microcosm.

ঙ) **অপূপঃ***

এটি উপমা – অন্তরেও বটে আবার বাইরেও।

চ) **মরীচয়ঃ**- – রশ্মিসমূহ।

১) বাইরে – সূর্য কিরণসমূহ –Macrocosm.

২) দেহতত্ত্বে – মধুপাতে মধু (দেখতে পাওয়া যায়)

– চৈতন্য – দীপকের লাল আলো (দেখতে পাওয়া যায়)–Microcosm.

ছ। **পুত্রাঃ** –

১) বাইরে – সূর্যকিরণ সম্ভূত জল – Macrocosm.

২) দেহতত্ত্বে - নিজেকে অর্থাৎ নিজের চিদ্-ঘন-কায় রূপ মনুষ্য জাতির অন্তরে সৃষ্টি করা – "মনের মানুষ"–"একোহং বহুস্যাম্"।

আমার অন্তরে সূর্য। সূর্যের কিরণ – মধু।

আমার অন্তরে জগৎ – "রা"। সেই জগতে কিরণপাত অর্থাৎ মধুপাত – Microcosm.

সমুদ্রে ঝিনুকসমূহ স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য হাঁ ক'রে বিচরণ করে

– মনুষ্যজাতিও সেইরূপ "মধু" বা "একত্বের" প্রয়াসী।

সূর্যকিরণ বা মধু তাদের ভিতর–"অপূপঃ"।

আমার অন্তর আকাশ থেকে পড়ছে – মুক্ত হচ্ছে – আমার রূপ ফুটে উঠছে।

অন্তর জগৎ ও বহির্জগৎ এক।

"যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে –"

---

* মৌচাক, মধুপিষ্ট

Macrocosm & Microcosm are identical – বৃহদারণ্যক।

এই মধুবিদ্যার দ্বারা – আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সংখ্যাতীত – আমার চিদ্-ঘন-কায় রূপ অন্তরে দেখছে।

২য়অংশ

অনুভূতি।

(শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, ১৩ই মার্চ, ১৯৬২, হইতে ১৯শে মার্চ, ১৯৬২ মধুবিদ্যা প্রসঙ্গ শুনে লেখেন এবং এলাহাবাদের পাঠচক্রে লিখে পাঠান। নিম্নে সেই লেখার অনুলিপি)।

শ্রী জীবন – রহস্যবিদ্যা আজ আর রহস্যবিদ্যা নেই। এতদিন পরে তার সমাধা হয়েছে। রহস্যবিদ্যা বলে উপনিষদকে। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার কথা – ব্রহ্মবিদ্যা হচ্ছে – আত্মিক একত্ব।

তা'হলে আমাদের জীবনে রহস্যটা কি?

এই একটা লোককে এত অগণিত লোক তাদের দেহের মধ্যে দেখছে।

বিশ-বাইশ বছর আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম (চৈতন্য সাক্ষাৎকারের পরে) স্বপ্নটা এই। এই যে আমার বিছানা – এর ডবল (Double) বিছানা – সাদা ধব ধবে চাদর পাতা। তার ওপর চার পাঁচ ফোঁটা মধু পড়ে গেল। বিছানাটা নষ্ট হবে, তাই হাত দিয়ে মুছে ফেলতে গেলুম, কিন্তু মুছতে গিয়ে বেড়ে যেন সারা বিছানাটা মধুতে আপ্লুত হয়ে গেল।

জেগে উঠে ব্যাখ্যা করলুম – হ্যাঁ মধুর রং লালচে, চৈতন্য সাক্ষাৎকারের সময় যে দীপকের আলো দেখেছি – অনেকটা তারই মত। তাহলে মধু চৈতন্যের প্রতীক আর মধু দেখা চৈতন্য সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হবে।

তারপর নগেন বাবু স্বপ্নে দেখলেন – বাজারে সরু নল দিয়ে মধু বিতরণ হচ্ছে – আমি সেখানে দাঁড়িয়ে। "ধর্ম ও অনুভূতি"-র প্রথম ভাগে বলেছি। সেখানেও অর্থ করেছি চৈতন্যের দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি (১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আবার বছর তিনেক আগে সত্য (বেহালায় বাড়ি) এসে বললো "স্বপ্ন দেখলুম – আপনার মাথাটা জুড়ে একটা মৌচাক, তাতে মৌমাছিরা এসে বসছে"।

বললুম – তা হবে। ঠাকুরের কথা আছে – ফুল ফুটলে মধুকর আপনি এসে সেখানে বসে।

আর, কয়েকদিন আগে পাড়ার একটি ছেলে (নাম জানিনা – সকালের দিকে বাইরে থেকে প্রণাম ক'রে চলে যায় – এখানকার কথা কিছুই বিশেষ জানে না) এসে

বললো – ভয়ে, ভয়ে, – কি একটা স্বপ্ন দেখলুম। আপনার সারা দেহটা একটা মৌচাক হয়ে গেছে – আর সাদা ধব ধব করছে (শুক্ল যজুর্বেদীয়)। ভয় হ'লো – বসন্ত নয়ত!

(পরে জেনেছিলাম – ছেলেটির নাম শীতল। তারা চারটি ভাই – চারটি ভাই-ই আমায় স্বপ্নে দেখে। সব ভাই ক'টি যে আমায় স্বপ্নে দেখে – আমি আগে জানতাম না)।

সত্য আর এই ছোকরার স্বপ্নের আগে – অভয় থেকে আরম্ভ ক'রে (অভয়ের প্রথম স্বপ্ন ১৯৫১) ১৪ জনকে স্বপ্নে দেখিয়েছে – সূর্যমন্ডলের ভেতর আমি রয়েছি।

দু'তিন দিন আগে ব্রহ্মসূত্র (English Translation) খুলে এক জায়গায় পেলুম "The Sun indeed is the honey as in Madhuvidya"

(ছান্দোগ্য উপনিষদ) ৩/১/১

ভাবলুম – হ্যাঁ, সূর্য জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানের অপর পরিভাষা – চৈতন্য। তাই মধু বলছে দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হ'ল – এ একটা কি বলছে – মধুবিদ্যা।

আমার পণ্ডিত মশাই (শ্রীধীরেন রায়) কে জিজ্ঞাসা করলুম। সে বললো হ্যাঁ, ছান্দোগ্যে মধুবিদ্যার কথা আছে। নিয়ে আসবো। ও আবার ঋগ্বেদের মধুমতী সূক্ত (ঘরেই ছিল) থেকে পড়ে শোনালো – "মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইত্যাদি, ইত্যাদি। কি একটা ব্যাখা ও ক'রল ঠিক বুঝতে পারলুম না।

পরের দিন সকালে ফের একবার পড়লুম। পড়েই বুঝতে পারলুম – ওঃ! ঐ মধুবিদ্যার effect ব'লে গেছে। কবে কোন যুগে কার হয়েছিল – শ্রুতিতে চলে আসছে। সে বাইরে "মধুমতী" দেখছে – ভিতরের কথা বলতে পারছে না। চোখে ন্যাবা না লাগলে ত' আর বাইরে চারদিকে ন্যাবা দেখা যায় না।

ছান্দোগ্য এল। মধুবিদ্যার একটা Chapter (অধ্যায়) - এ একটা শ্লোকের ব্যাখ্যায় (স্বামী গম্ভীরানন্দ) দেখলুম "সাধ্যগণের সহিত এক হইয়া প্রণবকে অগ্রণী করিয়া এই মধুবিদ্যা লাভ করিয়া তৃপ্ত হন।" বুঝলাম সংস্কৃত "মুখেন" কথার অর্থ করেছে "প্রণব" আর "এক হইয়া" কথাটির অর্থ করেছে চিন্তায় এক হইয়া। "এক হইয়া" মানে যে আত্মিক একত্ব লাভ করিয়া– "One and Oneness" (এই তোদের আমাকে অন্তরে দেখা) সে ভদ্রলোক জানবে কি ক'রে! না হ'লে ত' আর জানবার বা বোঝবার যো নেই। আর "প্রণবকে অগ্রণী করিয়া" মানে – সর্বক্ষণ অনুশীলনের দ্বারা

– এখানে যা দিনের পর দিন চলেছে আজ বিশ - একুশ বছর ধ'রে।

স্বপ্নে ঐ যে অনেকক্ষণ ধ'রে হাত দিয়ে মধু মুছতে লাগলুম – ওর অর্থ হ'লো – অনুশীলন এবং জগদ্ব্যাপিত্ব (ঐ বড় সাদা ধবধবে চাদরটি হ'ল জগৎ অর্থাৎ আমার চৈতন্যের দ্বারা জগৎ আপ্লুত হচ্ছে– তথা আমার বিশ্বব্যাপিত্ব)।

তারপর ধীরেন নিয়ে এলো ছান্দোগ্যের শঙ্কর ভাষ্যের আনন্দগিরির টীকা। তাতে দেখলুম একটা Metaphor (রূপক) রয়েছে – 'মধুপিষ্ট'। বলছে প্রথমে 'দ্যৌ' বা দ্যুলোক – তার নিম্নে অন্তরীক্ষ – অন্তরীক্ষ যেন মধুচক্র – "অপূপঃ"। তার নিম্নে – সূর্যকিরণসমূহ – মধু।

ছান্দোগ্য ব্যাখ্যা করেছে Macrocosm এ – আমি ব্যাখ্যা ক'রে নিলাম দেহতত্ত্বে, Microcosm-এ।

দ্যুলোক অর্থাৎ নির্গুণ – তুরীয় – তার নিম্নে অন্তরীক্ষ – মধুপিষ্ট। অর্থাৎ আমিই অন্তরীক্ষ (শূন্য), আমি নেই। অর্থাৎ আমার 'ক্ষুদ্র আমি' – নেই।

বিশ্বব্যাপী "আমি" (Universal self)। অন্তরীক্ষে – সূর্য, আমার বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তির প্রতীক।

সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ – আমারই প্রাণশক্তির সারিভূত রূপ – পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। ১৪ জন নরনারী সূর্যমন্ডলে আমার সুবর্ণময় রূপ দেখেছে – সূর্যমণ্ডলস্থ সূবর্ণময় পুরুষের কথা ছান্দোগ্যে উল্লেখ আছে।

সূর্যের কিরণে যেমন জগৎ প্লাবিত হয়, তেমনি আমার প্রাণশক্তি জগৎকে প্লাবিত করছে। জগৎ কোথায়? আমার ভেতরে – "রা"। আমার প্রাণসূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে সেই ভেতরের জগতে। আবার ভেতরের জগৎ বাইরের জগৎ এক।

আমার প্রাণশক্তির সারিভূত রূপ – বহির্জগতে তোদের – মনুষ্য জাতির মধ্যে ফুটে উঠছে – তাই সকলে আমাকে দেখে।

এত দিনে রহস্যবিদ্যার সমাধা হ'লো এই মধুবিদ্যা দিয়ে। মাথাটা হালকা হয়ে গেল। ঘুমোলে এ আনন্দ চলে যাবে, রাত জাগলে হয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য ! ঐ ছেলেটিকে কে এমন ক'রে দেখালো বল্‌তো? আমার সমস্ত দেহটা – সাদা ধব ধবে মৌচাক। সে আমারই প্রাণশক্তির বিকাশ – আমি কিন্তু কিছু জানি না।

ভাগবত প্রণেতা এই মধুবিদ্যাকে মধুর রসে পরিবর্তিত করেছেন। বৈষ্ণবদের পরকীয়া রতির সৃষ্টি – মধুর রস – কি জঘন্য কুৎসিৎ রূপ দিল এই মধুবিদ্যাকে।

তন্ত্রকার মধুবিদ্যাকে রেখে দিল মধুপর্কের বাটিতে খানিকটা মধু ক'রে।

সর্বসাধারণকে সেই মধুপর্কের বাটিতে মধু দেখে ‘‘মধুমতী’’ হয়ে সন্তুষ্ট হতে হয়!

আশ্চর্য! কোন আচার্য, কোন পরমহংস, কোন অবতার বা কোন স্বামী কিংবা স্ত্রী এই ‘‘মধুবিদ্যা’’ নিয়ে টুঁশব্দ করেন নি – অথচ যথেষ্ট কেতাব লেখা হয়েছে।

ঊর্দ্ধ্বরেতা না হ’লে মধুবিদ্যা লাভ হয় না। মধুবিদ্যার দ্বারা বিশ্বব্যাপিত্ব বা বহুত্বে একত্ব। ভাগ্যবান আমরা, – মধুবিদ্যা লাভে, – জগৎ ‘মধুমতী’।

৪

একটি বিশ্লেষণ

মনুষ্যজাতির শাশ্বত সনাতম ধর্ম– The mystery (রহস্য) of the human life – বেদে বলছে – ‘‘এবম্ এব এষঃ সম্প্রসাদঃ

অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়, পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য,

স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ’’।

আবার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে বলেছেন – ‘‘সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ’’

“He only lives who lives in all” –Swami Vivekananda.

১. Thesis – ব্যষ্টি।

২. Anti-thesis –বহুত্বে একত্ব –বিচারাত্মক – পাণ্ডিত্য (Intellectualism)

৩. Synthesis – বহুত্বে একত্ব – প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ।

১. Thesis – ব্যষ্টির অনুভূতি। উদাহরণ –

‘‘নৃমুণ্ডস্তুপের ওপর ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একা বসে আছেন’’ – জগৎ মৃত আর তিনি একা জীবিত – ‘‘অভয় পদের’’ প্রতীক।

‘‘অভয়পদ’’ একটি Esoteric condition (অভ্যন্তরীন অবস্থা) – তাঁর অনুভূতি একা তাঁর সম্বন্ধে Purely esoteric.

– ইহাই ব্যষ্টি – নিজেতেই আবদ্ধ – Individualism

২. Anti-thesis – স্বামীজী (পরমারাধ্য স্বামী বিবেকানন্দ) বলেছেনঃ-

(ক) “One and oneness” (খ) “Religion is Oneness”

(গ) “He only lives who lives in all”

(ঘ) ‘‘একা আমি, হই বহু হেরিতে আপন রূপ’’।

স্বামীজী এই বাণীগুলির নিজস্ব অনুভূতির কথা কিছুই বলেন নি, আর প্রমাণও দেন নি। তাহ’লে এগুলি – বিচারাত্মক বা পাণ্ডিত্য – ‘‘শঙ্কর’’ ও ‘‘রামানুজের’’ মতন – “Sankar and Ramanuja are mere Pandits”

– Swami Vivekananda’s letter.

3. Synthesis–

বেদ বলছে –

(ক) ‘‘সর্বভূতস্থম্ আত্মানম্ সর্বভূতানি চ আত্মনি’’।

(খ) ‘‘স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।’’

(গ) ‘‘ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ’’।

বেদের এই শাশ্বত সত্যের বাস্তব রূপ আছে – অর্থাৎ অনুভূতি।

১) নিজস্ব।

২) জগতের মনুষ্যজাতি যে প্রমাণ দেয় – অবশ্য তাদের অনুভূতির পরে।

এই বিশ্বব্যাপিত্ব বা বহুত্বে একত্বের বাস্তব রূপ হচ্ছে ঃ- ‘‘তাঁকে কেন্দ্র ক’রে সমষ্টিগত সাধনের এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। তাঁর রূপ ফুটে ওঠে হাজার হাজার মানুষের অন্তরে। তাঁকে স্বপ্নে, ধ্যানে, জাগ্রত অবস্থায়, Trance এ দেখে আবালবৃদ্ধবনিতা। তাঁকে দেখে হিন্দু, দেখে মুসলমান, দেখে খৃষ্টান দেখে পার্শী, দেখে ইহুদি, দেখে ভারতবাসী আবার বিদেশী। এদের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ শিক্ষিত, কেউ বা নিরক্ষর। তাঁর কাছে আসার পর যেমন লোকে তাঁকে দেখতে শুরু করে তেমনি আবার তাঁকে না দেখে, তাঁকে না জেনে, তাঁর কথা না শুনেও বহুলোক তাঁকে দেখেছে, আর তাদের সংখ্যাই হ’ল বেশি। পরে ঘটনাচক্রে তারা এসেছে তাঁর কাছে – কথা প্রসঙ্গে নিবেদন করেছে তাদের পূর্বদর্শনের কথা। তাঁর কাছে মেয়েদের আসতে দেওয়া হয় না। তবুও তারা ঘরে থেকেই তাঁকে দেখে। বাড়ির কোন একজন লোক তাঁর কাছে এল, সে লোকটি তাঁকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তাঁকে দেখা শুরু হয়ে গেল সে বাড়িতে। আবার কখন কখনও বাড়ির কর্তা, যিনি তাঁর কাছে এসেছেন তিনি দেখেন পরে, বাড়ির মেয়েরা ঘরে বসেই তাঁকে দেখেন আগে। বাপ, মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে – সকলেই তাঁকে দেখতে থাকে। দাস-দাসীরাও বাদ পড়ে না। পিতামহ দেখেন, পিতা দেখেন, পৌত্রও দেখেন তাঁকে। কোন বিচার নেই, কোন ভেদাভেদ নেই। কোন গণ্ডিও নেই। তাঁকে দেখার জন্য শুধু প্রয়োজন হ’ল – মনুষ্য দেহ। আর কিছুই না’’ (১ম ভাগ, ধর্ম ও অনুভূতি – নিবেদন)।

এই-ই ‘‘বহুত্বে একত্ব’’ বা ‘‘বিশ্বব্যাপিত্বে’’র বাস্তব (Reality) রূপ ও প্রমাণ (Practical demonstration) – তথা “Practical Vedanta” – তথা “Vedanta in everyday life”.

তোমার জীবদ্দশায় বিশ্বব্যাপিত্বের, বা ব্রহ্মত্বের, বা বহুত্বে একত্বের প্রমাণ তোমায় দিতে হবে না – প্রমাণ দেবে, জগতের মনুষ্যজাতি – অন্তরে দেখে বলবে – ‘‘তং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ’’।

ইতি

কুড়িয়ে পাওয়া মানিক।

(২৫-৬-১৮৮৪)
কলিকাতায় ঈশানের বাড়ি

৬০৪। "উনি ত মার্কামারা"

ব্যষ্টি 'কান্‌তুলসে' – কানে তুলসী দেয়, লোকে জানুক আমি ধার্মিক।

যোলআনা নয় – পাঁচসিকা পাঁচ আনা লক্ষণ – "গায়ে কৃষ্ণগন্ধ নাই, মুখে কৃষ্ণ নাম নাই" – যেমন ঠাকুর, বাইরে থেকে দেখতে তোমার আমার মতন মানুষ, কিন্তু ভেতরে ক্ষীরের পোর।

বিশ্বব্যাপিত্ব -"মার্কামারা" ব্যষ্টিতে হবে না। ব্যষ্টির "হাঁসে কাঁদে নাচে গায়" কিংবা "বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ" – যা ভাগবত প্রণেতা বলছেন, ... অবশ্য তিনি এই লক্ষণগুলি 'আল্‌ভার'দের কাছ থেকে নিয়েছেন, – এ সকলেই অনুকরণ করতে পারে – এ Self hypnotism । যদি সকলে অনুকরণ করতে নাও পারে, – যাঁদের হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রেও Self hypnotism -ই ।

সনাতন ঋষিদের বৈদিকধর্মে "মার্কামারা" তিনিই হন – যাঁকে হাজার হাজার নরনারী শিশুবৃদ্ধ অন্তরে দেখে আর সে কথা বলে। তাঁকে না দেখে দেখে, দেখেও দেখে। আর তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তারা দেখে এসে ব'ললে তবে তিনি জানতে পারেন।

বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে এক হয়ে আছেন। 'বিভু' মানে পরমাত্মা (The Universal Self) অর্থাৎ তিনি সর্বজনীন। তাঁর জীবন্ত অবস্থায় তাঁকে সকলে স্বপ্নে, Trance- এ, ধ্যানে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। বেদের কথা –

"এবম্ এব এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে – স উত্তমঃ পুরুষঃ।(ছান্দোগ্য ৮/১২/৩)

"স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে "– মানে তাঁর জীবিত অবস্থায় যে রূপ সেই রূপ হাজার হাজার নরনারীর অন্তরে ফুটে উঠবে।

(১) "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" – কঠ।

(২) "একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" – শ্বেতাশ্বতর।

এই রূপটি হ'চ্ছে জীবন্ত মানুষের রূপ।

প্রচলিত ব্যাখ্যা ঃ –

পৃথিবীর বিভিন্ন নরনারীর রূপ বিভিন্ন বটে, কিন্তু ভেতরে এক আত্মা। সে আত্মার রূপ কি, আর কেই বা জানছে। এমনকি গীতাকারও পুরুষোত্তম কি তার লক্ষণ ব'লতে

পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিজে বগল বাজিয়ে "আমিই পুরুষোত্তম" বল্‌লেই পুরুষোত্তম হওয়া যায় না। পুরুষোত্তমের লক্ষণ হ'চ্ছে – হাজার হাজার নরনারী তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় তাদের অন্তরে দেখবে আর বলবে। ঋষি বলছেন, "আত্মা অরে দ্রষ্টব্য"। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ দেখেছেন একথা কোথাও পাওয়া যায় না। কেউ বলেন নি এক ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব ছাড়া। বর্তমান জগৎ তার কাছেই প্রথম শুনলো, "আত্মাকে দেখা যায়"। "আত্মা, ভগবান, ব্রহ্ম – তিনই এক"। "মাইরি বলছি, তাঁকে দেখেছি"।

একমাত্র শ্বেতাশ্বতরে পাওয়া যায়, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

কিন্তু সে আত্মা নয়, আত্মিক রূপ। মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী সড়াৎ ক'রে ভ্রূ'র মধ্যে আসে আর ভ্রূ-মধ্য ভেদ ক'রে সহস্রারে যায় এবং দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে ঐ আত্মিকরূপ – সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত। তবে সেটা আদিত্যবর্ণই বটে। এটা ঠিক।

আত্মাসাক্ষাৎকার হলো ত্রিপুটি অবস্থা। ত্রিপুটি অবস্থায় – জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা। জ্ঞান হলো ব্রহ্মপুর থেকে আগত ব্রহ্মেরই আর এক রূপ – যাঁকে ঠাকুর "সচ্চিদানন্দগুরু" আখ্যা দিয়েছেন, সে আখ্যা ভুল। কারণ, "গুরু" কথা প্রযোজ্য হয় না। এ সমস্তই হ'লো আত্মার বিকাশ।

এই ত্রিপুটি অবস্থায় জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এক সঙ্গে জড়িত। জ্ঞাতাই "জ্ঞেয়" রূপে পরিবর্তিত হ'য়ে র'য়েছে, অথচ সে নিজেও আছে। এই আত্মা সাক্ষাৎকারের সময় আত্মার মধ্যে থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ 'সচ্চিদানন্দ' বা ব্রহ্মপুর থেকে আগত পুরুষ 'আত্মা'কে দেখিয়ে দেন। আর আত্মা নিজেই নিজের কথা শুনছে আর দেখছে।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতঃ অয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।" – কঠ

আর, এই আত্মা-সাক্ষাৎকারের প্রমাণ, ঐ "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে"। তাঁর ব্রহ্মত্ব লাভ হ'য়েছে – তাই হাজার হাজার নরনারী শিশু বৃদ্ধ তাঁকে বাস্তবে দেখে বা না দেখে তাদের অন্তরে তাঁকে দেখে সেই ব্রহ্মত্ব বা একত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

স্বামীজীর ONE AND ONENESS – যদিও তিনি এ কথার ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, because it was purely and simply intellectualism with him কারণ তাঁকে ত' তাঁর জীবদ্দশায় হাজার হাজার নরনারী শিশুবৃদ্ধ তাদের অন্তরে দেখে তাঁকে বলেনি, আমেরিকাতেও নয়, ভারতেও নয়। কিন্তু স্বামীজী Late Principal J.R. Banerjee -র কনিষ্ঠপুত্র শ্রী নলিনীকে (যিনি এই একত্বের কথা বুঝতে পারেন নি যদিও এখানে এসে তাঁর একত্ব লাভ হয়েছিল) স্বপ্নে বলেছিলেন, "আমি

আমেরিকায় লেক্‌চারে এর কথাই বলেছি ONE AND ONENESS যা এখানে ফুটেছে।" তিনি তাঁর Complete Works এর Vol VII page 161 দেখতে বলেছিলেন। আশ্চর্য আরও এই যে তখনও পর্যন্ত নলিনী জানতেন না যে স্বামীজীর Complete Works আছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানুষের ধর্ম"-তে বলেছেন, "আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি – যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।"

আর আশ্চর্যের বিষয়, বেদে, "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" স্পষ্ট ভাষায় থাকলেও শ্বেতাশ্বতরের ঋষি সে কথা উল্লেখ করছেন না বা পরবর্তী কোনও আচার্যই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করছেন না।

বরঞ্চ ব্রহ্মসূত্রে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদের প্রথম সূত্রে এর কথা ('স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে') উল্লেখ ক'রে ২০টি সূত্রের দ্বারা তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন – কিন্তু বোঝাতে পারেন নি। অথচ কথাটা খুব সোজা, – জীবিত মানুষেরই ব্রহ্মত্ব লাভ হয় (সাধন ক'রে হয় না – আপনা হ'তে হয়। সেই কথা – "বিদ্বতে বস্তু লাভ, বিবিদিষায় নয়"।) আর সহস্র সহস্র নরনারী শিশুবৃদ্ধ তাঁকে তাদের অন্তরে নানাভাবে দ্যাখে। এটাই এই সূত্রের একেবারে concrete example।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যে'নুপশ্যন্তি ধীরা।
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।।

আরও আশ্চর্যের কথা – জগতের কোনও ধর্মেই একথার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না – একমাত্র ভারতবর্ষের এই বেদ ছাড়া। আর, বেদ বলতে বোঝায় মনুষ্যজাতির সনাতন ধর্ম। Natural evolution of the life power in human body.

৬০৫। "আপনি কি সার মনে করেছো?"

ব্যষ্টি দেহের সার – আত্মা, ভগবান, ব্রহ্ম।

বিশ্বব্যাপিত্ব যে ব্যক্তির আত্মা সাক্ষাৎকার হয়েছে – ষোল আনা বেদমতে সাধন আপনা হ'তে হয়েছে – তাঁর রূপ সহস্র সহস্র নরনারীর দেহে ফুটে উঠবে ও তারা তাঁর একত্বের বা ব্রহ্মত্বের প্রমাণ জানাবে। এই "সার"।

৬০৬। "তুমি আম খেয়ে চলে যাও"।

ব্যষ্টি এটি যেন একটি উপমা – কিন্তু প্রকৃত তা নয়। সত্যই আম খেতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেহেতে অমৃতবৃক্ষ – সেই বৃক্ষে ছোট বড় অমৃত ফল।

আবার কিছুদিন পরে, তোমার হাতে প্রকান্ড ছাড়ানো আম (অমৃত)। তুমি যতদূর মানুষের ব্যগ্রতা হ'তে পারে, ততদূর ব্যগ্রতা সহকারে খাচ্ছ – নাকজুব্ড়ে। আঁটি কিন্তু পাচ্ছ না। আবার কিছুদিন পরে, খোসা ও আঁটি চুষে খাচ্ছ। 'বীচি ও খোলা বাদ দিলে, ওজনে কম পড়ে' – বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্ব বা ব্রহ্মত্বই অমৃতত্ব আর, একত্ব বা ব্রহ্মত্বের ব্যাখ্যা ৬০৪ নং - এ দেওয়া হয়েছে।

৬০৭। "এক গেলাস হ'লেই তোমার হ'য়ে যায়।"

ব্যষ্টি এ অবতারতত্ত্ব। নিগমে চেতন সমাধি। সহস্রার থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত – চৈতন্যের অবতরণ। দপ্ ক'রে হয় – দেখতে পাওয়া যায়। 'শুক আর নারদের চেতন সমাধি।'

বিশ্বব্যাপিত্ব এই অবতারতত্ত্ব ব্যষ্টিতে আবদ্ধ। বিশ্বব্যাপিত্বে আলাদা বস্তু। গেলাসের যৌগিক রূপ – দেহ। মানুষের ব্রহ্মত্ব বা একত্ব লাভের পর, প্রতি দেহে যখন সে রূপ ফুটে ওঠে, সকলে দ্যাখে আর বলে, – তখন সে বিশ্বব্যাপী হয়, তবে "হয়ে যায়" – তা নইলে কিছুই কিছু নয়।

৬০৮। "তাঁর গুণ কোটি বৎসর বিচার করলেও কিছু জানতে পারবে না।"

ব্যষ্টি একসের ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মের একটিমাত্র গুণের উল্লেখ আছে বেদে – "স একঃ"। বহুত্বে একত্বের দ্বারাই সেই বিশেষণ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম আকাশে কোথাও লুকিয়ে নেই – এই মানুষ ব্রহ্ম হয়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন – "অহং ব্রহ্মাস্মি"। তাঁকে অসংখ্য নরনারী-শিশুবৃদ্ধ অন্তরে অর্থাৎ দেহস্থ আত্মিক জগতে দর্শন ক'রে বলে – "স একঃ"। "স একঃ" উপলব্ধির বস্তু।

৬০৯। "সংসারে কিছুই নাই"।

ব্যষ্টি সত্যই নেই – নেতি, নেতি – আমি শুদ্ধাত্মা। এই অবস্থায় কিছু নেই – শুধু শুদ্ধাত্মা।

'বেলের শাঁস' – খোলা বীচি নেই।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্যষ্টির এই সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র মূল্য নেই। এ Negative Religion.

সংসার – মানুষ, মানুষের দেহ আর তার প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিই দেহীর অজ্ঞাতসারে দেহস্থ ব্রহ্মপুর থেকে অজানা মানুষের রূপ ধারণ ক'রে দেহেতে আবির্ভূত হয়। তারপর দেহেতে রাজযোগের স্ফুরণ – মুর্তি ধারণ ক'রে ফুটে ওঠা। এই

রাজযোগের মাধ্যমে প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী সহস্রারে "পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য" অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করে, আর "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" – অর্থাৎ আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁকে দেহের ভিতরে দ্যাখে আর বলে – "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ"।

শুধু যে হিন্দুর ভিতর এ আবদ্ধ – তা নয়। অন্য ধর্মাবলম্বীরাও দেখে আর বলে, বিভিন্ন ধর্মের প্রশ্ন ওঠে না – মানুষ হ'লেই হ'লো। এই হ'ল 'মানুষের ধর্ম' - স্বভাবসিদ্ধ।

আজ এ সংসারে মানুষ হয়ে এসেছিলাম তাই এই বেদধ্বনি – "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" শুনছি – মনুষ্যজন্ম সার্থক হচ্ছে।

ব্যষ্টিতে আবদ্ধ এই অবতার আর পরমহংসের দল ফতোয়া জারি করছেন "সংসারে কিছুই নাই" – কিছু কুণ্ঠা বোধ করছেন না – যদিও সংসার প্রতি কার্যে তাঁদের সাহায্য করছে।

৬১০। "মা, এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও।"

ব্যষ্টি জগৎ থেকে দৃষ্টি কুড়িয়ে অন্তরে ভগবানে নিবদ্ধ। এসব দেখতে পাওয়া যায় – 'মা মুখ বাঁকিয়ে দিয়েছে।'

বিশ্বব্যাপিত্ব জগতে প্রচলিত ধর্ম সমূহ ব্যষ্টিতে আবদ্ধ। মসেস (Moses) থেকে আরম্ভ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সমস্ত আচার্য, অবতার, পরমহংস - ইত্যাদি সকলেই Carlyle এর "Hero Worship" এর "Hero" – অর্থাৎ মনুষ্যজাতি জগতে এসেছে শুধু তাঁদের পূজা করতে। এই মুখ বাঁকাতে হবে।

সনাতন ঋষিদের ধর্ম – " ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" – তথা "অহং ব্রহ্মাস্মি"। আত্মিক জগতে আমিই সমস্ত মনুষ্যজাতি – "একঃ বশী সর্বভূতান্তরাত্মা" – এই কথার প্রতিষ্ঠা।

আর, মনুষ্যজাতি আমার রূপ অন্তরে দেখে জানিয়ে দেবে – "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "শুধু নিজের মুক্তি হ'লে হবে না। জগতের সমস্ত লোকের মুক্তি চাই।" নিছক কথার কথা।

পাতঞ্জল তাঁর যোগশাস্ত্রে বলেছেন – সকলকার মুক্তি না হ'লে নিজের মুক্তি হয় না।

নাগার্জ্জুন বৌদ্ধধর্মে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন – সমস্ত লোকের মুক্তি – একটিরও মুক্তি যদি বাকী থাকে অবলোকিতেশ্বর নিজে ততক্ষণ মুক্ত

হবেন না। অবশ্য এটি তাঁর নিছক কল্পনা। বেদের ক্ষীণ অনুকরণ আর অস্ফুট প্রতিধ্বনি।

৬১১। **"যেন সংসারী ক'রো না"।**

ব্যষ্টি বেঁধে ঠেঙানো।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে সংসারের প্রশ্ন নেই।

এই আত্মিক একত্ব বা পরাবিদ্যা হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ, ইহুদী (Jew), শিখ, কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব, সিন্দুর ফোঁটাধারী শাক্ত, গেরুয়া বেশধারী সন্ন্যাসী, এমন কি পোস্তার গুণ্ডা পর্যন্ত – সকলে আমাকে অন্তরে দেখে এই জানিয়ে দিয়েছে – আমিই প্রতি মানুষের অন্তরে – আর এই একত্বে প্রতি মানুষের সমান অধিকার। সন্ন্যাসী কিংবা শ্রমণদের একচেটে নয়। শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের একচেটে নয় – মানুষ মাত্রেই এর অধিকারী।

এই আত্মিক একত্বের মূর্তরূপ (Concrete example) আজ জগতে প্রথম দেখছি। অতীত জগতে কোন আচার্যের জীবনে দেখতে পাই না কেন?

বেদ জগতে এই একত্বের দুন্দুভি বাজিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেখানেও এর পরিস্ফুট (Vivid) সজীব (alive) ছবি পাই না কেন?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, " অহং ব্রহ্মাস্মি"– প্রমাণ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, - "আমাকে তোমার কি বোধ হয়?" অর্থাৎ আমি অবতার। কই তিনি ত' কোন প্রমাণ দিচ্ছেন না যে তিনি অবতার! আর, অবতার যে কি তাও কেউ জানে না, (এর মীমাংসা খুব সহজ। নিজে নিজেকে প্রশ্ন করলেই ধরা পড়ে যাবে – জানি না) এক পুরাণের ঠাকুরমার ঝুলির গল্প ছাড়া। উল্টে তিনি মনুষ্যজাতিকে ছোট করবার জন্য বলছেন, " অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।" Natural Sophistry – তোমরা সব অপদার্থ – আমাকে অবতার বলে চিনতে পারলে না।

তিনিই আবার বলেছেন – "বেদান্ত মতে অবতার নেই – পুরাণমতে অবতার"। সত্য জগতে এক।

"বাউলের দল এলো, নাচলে, গাইলে, চলে গেল, – কেউ জানলেও না, চিনলেও না"।

বাউলের দলের কি চিনিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না? অথচ তিনিই গাইতেন –

"ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব
ধরা না দিলে পারিস কি ধরিতে?"

ধরা দিলেন না কেন?

বেদে এর মীমাংসা "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" – যাঁর ভিতরে এই ব্রহ্মত্ব

স্ফুরিত হবে তাঁকে অসংখ্য নরনারী অন্তরে দেখে – আত্মিক একত্ব লাভ ক'রে – মনুষ্য জন্মের সার্থকতার বিজয় বৈজয়ন্তী আকাশে তুলে ধরবে।

একত্ব স্বয়ম্ভু আর স্বয়ংদীপ্ত।

২৫-৬-১৮৮৪

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে

৬১২। "পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, বেশ ! বেশ !"

ব্যষ্টি ঠাকুর প্রথমে ভাবাবিষ্ট হ'লেন। ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষণ ঠাকুরের দেহেতে প্রকাশ হ'ল। "এক" বহুরূপে প্রতীয়মান। ঠাকুর নিজের ভিতরে পণ্ডিত মশাইকে দেখতে পেলেন – পণ্ডিত মশায়ের আত্মিক অবস্থার বিষয়ে জানতে পারলেন – পরে বললেন, – "বেশ, বেশ" – খানিকটা অকৃত্রিম (Bona fide)

বিশ্বব্যাপিত্ব সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চ আত্মনি

সম্পশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা। – কৈবল্য উপনিষৎ।

"All is one and one is all" --- Pantheism

(১) ঈশ্বরতত্ত্ব, (২) সদ্‌বিদ্যাতত্ত্ব বা সদ্ আখ্যা তত্ত্ব। – কাশ্মীরী শৈববাদ।

উপরে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল সে আমার নিজের অনুভূতির ওপর ভিত্তি ক'রে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব শুধু "বেশ বেশ" ক'রে সেরে গেছেন। তিনি যে কেন "বেশ বেশ" করলেন সেটা অন্ধকারে রয়ে গেল।

তিনি অবতার – জীবকে তরাতে এসেছেন, আবার তিনি আচার্য – সকলকে শিক্ষা দেবেন। তাঁর উচিত ছিল পরিষ্কার ক'রে বলা – কি ক'রে জানতে পারলেন – "বেশ ! বেশ !"

সে সব কিছুই করলেন না, এ কি রকম ?

জিনিসটা আসলে অতি সহজ – যাঁর ব্রহ্মত্ব লাভ হয়েছে – অসংখ্য নরনারী তাঁকে নিজেদের দেহের ভিতরে দেখে বলবে আবার যিনি এই " বিষ্ণুত্ব" বা "পরমপদ" বা "ব্রহ্মপদ" লাভ করেছেন তিনিও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নিজের ভেতরে দেখবেন।

শুধু "বেশ বেশ" করা একটা পরিহাস মাত্র – আর, গৌরবত্ব প্রকাশ ক'রে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ !

৬১৩। "কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি।"

ব্যষ্টি "কলিতে বেদমত চলে না" – পঞ্চকোষের সাধন হয় না।

পঞ্চকোষের পূর্ণ সাধন হ'লে – ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও যোগৈশ্বর্য বুঝতে পারা যায়। শুধু নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারাদির হয়। তাই চণ্ডিদাসের - "কোটিতে গুটি"।

বিশ্বব্যাপিত্ব "ভক্তি" ও নেই আর "ভক্ত" ও নেই।

"Is not this dualism based on falsehood?"

- Swami Vivekananda

আছে আত্মিক একত্ব আর তার প্রমাণ।

প্রমাণের কথা বেদ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছে – "স্বেন রূপেণ অভিনি ষ্পদ্যতে"।

দ্বৈতবাদে, দ্রাবিড়ী, অনার্য বা সেমিটিক (Semitic) ধর্মে অবতার। তাই অবতারের এই বেদোক্ত প্রমাণ বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয় না।

ঠাকুর অকুণ্ঠিতচিত্তে বলছেন "ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটি নমস্কার।" আর অন্যদিকে ফতোয়া – "অষ্টমীতে একটি পাঁঠা।"

সনাতন ঋষিধর্ম তাঁর কাছে ব্যঙ্গমাত্র। আর আছে তার পরিবর্তে একটি "পাঁঠা", অবশ্য অষ্টমীতে। শুধু একটু "ঝোল" আঙুলে ক'রে জিভে ঠেকাবার জন্য – পাছে মা রাগ করে!

এদিকে বেদ বলছে –

"যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।

চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।।"

আবার মহর্ষি জৈমিনি তাঁর উত্তর মীমাংসায় ব্যাখা দিয়েছেন – অসংখ্য নরনারী যাঁর ব্রহ্মত্ব লাভ হয়েছে - তাঁকে অন্তরে দেখবে, তবে "হবে"।

৬১৪। **"আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না"**

ব্যষ্টি জ্বর – ব্যাধি – "আমি" রূপ ব্যাধি। "বাদশাহী আমলের টাকা নবাবী আমলে চলে না" – নতুন যুগ, ভগবান নতুন ভাবে লীলা করবেন, দেহে নতুন ভাবে সাধন হবে।

বিশ্বব্যাপিত্ব ঋষিদের বেদোক্ত সনাতন ধর্ম – একত্ব – ONE AND ONENESS –আপনা হ'তে মানুষের দেহেতে প্রকাশ পায় আর এ যে হয় তার জীবন্ত প্রমাণ আবালবৃদ্ধবনিতা আমাকে দিয়েছে আর দিচ্ছে।

জগতের ইতিহাসে সত্যিই নতুনত্বের চমকপ্রদ রহস্য উদ্‌ঘাটন। একটি জীবন্ত লোকের ব্রহ্মত্ব লাভ আর তার চিদ্-ঘন-কায় মূর্তি এমনকি জীবন্ত মূর্তি – হাস্‌ছে – কথা কইছে, যোগশিক্ষা দিচ্ছে – ঘুম ভাঙাচ্ছে – অফুরন্ত ভঙ্গিমা।

হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে এসব দ্যাখে আবার সেই সংবাদ আমার কাছে

এসে পৌঁছায়।

বেদেও এরকম জীবন্ত উদাহরণ (Concrete example)পাওয়া যায় না আর পৃথিবীর অন্য কোনও ধর্মেও পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ নতুন।

৬১৫। "আজকাল ফিবার মিকশ্চার" –

ব্যষ্টি তাঁর কৃপা – আমাদের জন্য ঠাকুর ব্যবস্থা করেছেন ইন্‌জেক্‌সন (Injection) – অন্তর ফুঁড়ে বেরোয় – আত্মার বরণ – সচ্চিদানন্দগুরু।

বিশ্বব্যাপিত্ব একেই বেদমতে সাধন বলে –

পাতাল ফোঁড়া শিব – "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"

ব্রহ্মপুর থেকে একটি অজানা লোক আসে আর তাকে ব্রহ্মপুরে নিয়ে যায়। প্রতীকাপন্ন লোক প্রতীক প্রাপ্ত হয় – যেমন গোপালের মা'র গোপাল, গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ। মাহেশে প্রতি লোকের ভিতরে গোপাল (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা, তাই বা হচ্ছে কার। পৃথিবীতে একমাত্র গোপালের মা – কামারহাটির ব্রাহ্মণী। মা ঠাকুরাণীর হয়নি কেন ? ভাগবতে গোপীদের কথা আছে – কাল্পনিক ! মহপ্রভুরও এ অবস্থা হয়নি কেন ? হয়নি, তার প্রমাণ – তা'হলে রাত্রিতে চটক পাহাড়ে ছুটতে হোত না – যাঁকে সামনে দেখতেন তাঁকেই 'কৃষ্ণ' ব'লে জড়িয়ে ধরতেন !) দেখাকে "ব্রহ্মজ্ঞান" বা "আত্মজ্ঞান" বা "ব্রহ্মত্ব" বলে না।

প্রত্যিটি লোক যদি গোপালের মাকে নিজের অন্তরে দেখতো আর বলতো – তবেই "ব্রহ্মজ্ঞান" বা "আত্মজ্ঞান" বা 'একত্ব' হতো।

৬১৬। "হাজার লেক্‌চার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু ক'রতে পারবে না"।

ব্যষ্টি আত্মা যদি কৃপা ক'রে দেহের মধ্যে প্রকাশ হন – তবে প্রকাশ। তোমার লেকচারে দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হবে না।

বিশ্বব্যাপিত্ব আত্মা – পরমাত্মা – The Universal Self – জীবন্ত মানুষের চিদ্‌ঘনকায় মূর্তি – ব্রহ্মপুরের লোক।

"In the beginning there was self alone in the shape of a person".

- The Bibles of the world (translation–Brihad Aranyak).

. এখানে "Beginning" মানে জগৎ সৃষ্টির আরম্ভ নয় – মানুষের দেহে যোগের আবির্ভাব।

ধর্ম (Cosmic law) বা এই দেহমধ্যে ব্রহ্মত্বের বিকাশ – রাজযোগের ওপর ভিত্তি ক'রে বিশ্বব্যাপী হয়। আর এই বিশ্বব্যাপিত্বের প্রমাণ দেয় – মনুষ্যজাতি। আনুমানিক নয় – 'মনে হওয়া নয়' – "আমাকে তোমার কি মনে হয়" – এরকম নয়

– অন্তর চক্ষে – সপরিবারে দেখে বলে।

৬১৭। ‘পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়?’

ব্যষ্টি ‘পাথরের দেওয়াল’ – দেহ। পেরেক – পেরেকের শেষ অংশ – বিন্দু

‘পেরেক মারা’ – ভ্রুমধ্যে সেই বিন্দু আর বিন্দুর সহস্রারে প্রবেশ – আর প্রথম স্তরের চৈতন্যের অবতরণ হচ্ছে –তাই দর্শন।

বিশ্বব্যাপিত্ব পাথর পাথর-ই – আর মানুষ মানুষ-ই। উপমা অপ্রযোজ্য। মনুষ্যজন্ম হয়েছে – (“অমৃতস্য পুত্রাঃ” - “সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই”) – ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য – এটি হলো তার birth right.

এ যে হয় আমরা তা নিত্য দেখছি – শুনছি – হাজার হাজার প্রমাণ পাচ্ছি।

হাঁড়ি, শুঁড়ি, মেথর, মিতা, ধোপা, নাপিত, চোর, ছ্যাঁচোর, মাতাল, বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মাবলম্বীগণ – সকলেই এই একত্বের অধিকারী। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় – তারা নিজেরা আমাকে তাদের অন্তরে দেখে আমার কাছে এসে – এই আত্মিক একত্বের প্রমাণ দিয়েছে। অবশ্য সেখানে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক থাকত, কথামৃত পাঠ হতো – নিত্য।

এই একত্বই – বহুত্বে একত্ব – Unity in Diversity – নামরূপ বিভিন্ন কিন্তু অন্তরে এক।

এই-ই মনুষ্যজাতির সনাতন ধর্ম।

জগতে একমাত্র বেদে এর উল্লেখ – “ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ” – আর এর বাস্তবরূপ, ভাগ্যবান আমরা দেখছি। এই-ই মনুষ্যজাতির “উপনিষদ” – শাশ্বত রহস্যবিদ্যার অন্তর্নিহিত সত্য।

৬১৮। “সাধুর কমণ্ডুলু (তুম্বা) চারধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো।”

ব্যষ্টি কমণ্ডুলু –দেহ।

“বিবিদিষা” - কৃচ্ছ্র সাধন– বহূদক – এ সবে কিছু হয় না। “আত্মা যদি কৃপা ক’রে দেহ থেকে মুক্ত হন তবে মুক্তি”।

বিশ্বব্যাপিত্ব কমণ্ডুলু (তুম্বা) চিরকাল কমণ্ডুলু।

মানুষ – জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে মানুষ। বিশ্বব্যাপিত্ব হ’লে, তবে সে “মানহুঁস” হয়। উপমা অপ্রযোজ্য।

মানুষকে তুম্বার পর্যায়ভুক্ত করা সত্যের অপলাপ।

সিদ্ধাই এর জোর নেই তাই বাবুই গাছে আঁব হ'লো না।

৬১৯। "বাঁছুর একবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়, তবে দাঁড়াতে ও চলতে শিখে।"

ব্যষ্টি তত্ত্বজ্ঞান হ'লে ব্রহ্মবিদ্যার মর্ম বোঝা যায় – স্বয়ম্ভু – আপনা হ'তে হয়।

বাছুর – ধুনুরীর তাঁত – তুঁহুঁ তুঁহুঁ,– তুমি, তুমি – তত্ত্বজ্ঞান। পড়ে যায় আবার দাঁড়ায় – সাধনের স্তর – তুবড়ীর ফুল কাটা – এই একরকম কাটছে, আবার থেমে যাচ্ছে – আবার একরকম নতুন ফুল কাটছে।

৬২০। "কে ভক্ত, কে বিষয়ী চিনতে পার না।"

ব্যষ্টি – ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজের ভিতরে ভক্তের চেহারা দেখতে পান – যেমন ঠাকুর। তবে অপরের অবস্থা বুঝতে পারা যায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে "সর্বভূতানি চ আত্মনি"। আমার নিজের অনুভূতির আলোকপাতে ঠাকুরের এই কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬২১। "তা সে তোমার দোষ নয়"।

ব্যষ্টি তোমার দ্বারা লোকশিক্ষা হবে না।

৬২২। "প্রথমে ঝড় উঠলে, কোন্‌টা তেঁতুল গাছ, কোন্‌টা আম গাছ বুঝতে পারা যায় না।"

ব্যষ্টি নবানুরাগ – প্রবর্তক।

৬২৩। " গৃহস্থের বৌ"

ব্যষ্টি ভাগবতী তনু। চণ্ডীদাসের "তাহে কুলবধূ বালা"।

৬২৪। "ছেলে হলে"

ব্যষ্টি আত্মায় পরিবর্তিত হওয়া।

এই ভাগবতী তনু আত্মায় পরিবর্তিত হয়।

৬২৫। "শাশুড়ী"

ব্যষ্টি দেহ। "গুরু দুরুজন"

৬২৬। "দশমাস পড়লে"

ব্যষ্টি সপ্তমভূমি – সহস্রারে অবস্থান।

৬২৭। "ছেলে হ'লে ঐটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে"।

ব্যষ্টি ছেলে – আত্মা। ঠিক দেহ প্রসব করেছে – দেহ থেকে জন্মেছে।

আত্মার সাধন – আত্মা – আত্মার মধ্যে জগৎ বা বিশ্বরূপ – বীজবৎ – স্বপ্নবৎ।

৬২৮। **"আর কর্ম ক'রতে হয় না।"**

ব্যষ্টি নিষ্ক্রিয়।

৬২৯। **"জ্ঞানীদের"** -

ব্যষ্টি যাঁর পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে, আত্মার সাক্ষাৎকার হ'লেই জ্ঞানী হয় না। ব্যষ্টির এই তথাকথিত 'জ্ঞানী' হলো – শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের "ফাঁকা আওয়াজ"।

জ্ঞান মানে হলো – আমি আর আমার সম্মুখে এই বিরাট মনুষ্যজাতি – এদের সম্বন্ধ নির্ণয়।

এই মনুষ্যজাতিই আমাকে অন্তরে দেখে এই জ্ঞান দান করেছে – আত্মিক জগতে আমিই তারা। বহুত্বে এই একত্ব।

একেই বলে জ্ঞান।

৬৩০। **"কর্মত্যাগ"।**

ব্যষ্টি 'আমি' নাশ – "'আমি' ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে বা একত্বে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান – "আজু দশদিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা।"

ব্যষ্টির এই ক্ষুদ্র 'আমি' – আজ বিশ্বব্যাপী আমি – "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু।"

৬৩১। **"বাবা, আর একটু বল বাড়াও!"**

ব্যষ্টি আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতার লীলা। অবতার যুগের আদর্শ। শক্তি তোমার ভিতর অবতীর্ণ না হ'লে তুমি যুগের আদর্শ হবে না। তোমার জীবনে শিক্ষণীয় বস্তু কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না যে জিনিষ মানুষ তোমার কাছ থেকে শিখবে।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে, আদর্শবাদ বা Hero worship বা অবতারবাদ নেই – আছে – "বহুত্বে একত্ব" – "ভূমৈব সুখম্"—বহুর দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত (সু) এই জ্ঞান (খ) – আত্মিক একত্ব।

বেদান্ত মতে অবতার নাই – ঠাকুর বারবার বলছেন।

আবার তিনি আকুলি ব্যাকুলি ক'রে সকলকে জিজ্ঞাসা করছেন – "আমাকে তোমার কি বোধ হয়?" তিনি নিজেকে অবতার ব'লে প্রচার করতে সদাই সচেষ্ট ও ব্যগ্র!

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃতে পাওয়া যায় স্বামীজী অবতার স্বীকার করছেন না, বলছেন, "ভগবান অন্তর্যামীরূপে সকলকে শিক্ষা দিবেন।"

ঠাকুর –" হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি শিক্ষা দিবেন।"

এখানে ঠাকুর স্বামীজীর কথা স্বীকার করছেন – অবতারের আবশ্যক নেই।

পরবর্তীকালে আবার স্বামীজী – "অবতার বরিষ্ঠায়" ব'লে স্তোত্র রচনা করছেন! Big personality র Big exploitation ছাড়া এ আর কিছু নয়!

আমেরিকাতে অবতার সম্বন্ধে লেক্‌চার দেবার সময় স্বামীজী যা উল্লেখ করেছেন – তা হ'লো তন্ত্রমতে "শাক্তী" – সে অতি সামান্য – তাকে High class Mesmerism বলা চলে। শাক্তীর স্থায়িত্ব নেই – চিরকাল থাকে না।

স্বামীজী "মানুষরতন"-এর কথা কোথাও কিছু বলেন নি। ঠাকুর "মানুষ রতন" কেই অবতার বলছেন। "মানুষরতন" এর কথা একমাত্র ছশ' বছর আগেকার চণ্ডীদাসে আছে। এই "মানুষ রতন"-কে নিজের দেহের ভিতর দেখা যায় – আমিও কয়েকবার দেখেছি। অবশ্য এও সত্য – চৈতন্য সহস্রার থেকে কটি দেশ (কোমর – মূলাধার) পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়ে এই "মানুষ রতন" - এর রূপ ধারণ করে। তবে ইনি যে অবতার– "প্রত্যক্ষসিদ্ধ" – সেটা আনুমানিক আর কাল্পনিক। এই "মানুষ রতন" ব্যষ্টির বিশেষ এক প্রকার যোগজ অনুভূতি।

প্রচলিত অবতারবাদ সর্বৈব কাল্পনিক ও মিথ্যা।

যাঁরা এই অবতারবাদ প্রচার করেন তাঁরা অজ্ঞ আর সত্যের পরিবর্তে মিথ্যা প্রচার করেন।

৬৩২। "আর কিছুদিন সাধন-ভজন কর"।

ব্যষ্টি তুমি সাধক মাত্র। প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। সিদ্ধের সিদ্ধ অবস্থায় তোমার জীবন অপরের আদর্শ হতে পারে – সেও তাঁর ইচ্ছায়। সব অবতারের সমান আদর্শ নয়। শক্তির তারতম্যে অবতারের তারতম্য, আর আদর্শেরও তারতম্য। যখনকার যা আবশ্যক, শক্তির স্ফুরণে তার প্রকাশ।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে "তুমি কর' একথার স্থান নেই। আত্মিক একত্ব স্বয়ম্ভু – বিদ্বৎ – পাতাল ফোঁড়া শিব – বসানো নয়।

৬৩৩। "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি"।

ব্যষ্টি গাছ – দেহ – ষষ্ঠভূমি। না উঠতেই – সহস্রারে না গিয়েই। এক কাঁদি – ডাব – জল – সচ্চিদানন্দ। তুমি সাধক মাত্র। তোমার আত্মা সাক্ষাৎকার হয়নি। তুমি জ্ঞানলাভ করনি। তুমি অজ্ঞান। তুমি ভগবানের কথা কি বলবে?

বিশ্বব্যাপিত্ব বেদে এই গাছে ওঠার কথা আছে – "অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়" – তবে কাঁদি – স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে - অর্থাৎ আত্মিক একত্ব।

তোমার জীবিতকালে অসংখ্য লোক তাদের দেহের ভিতরে তোমাকে দেখে

তোমার বিশ্বব্যাপিত্ব বা পরমব্রহ্মত্বের প্রমাণ দেবে। Universalism– আত্মিক "One and oneness."

এই একত্ব– কার সঙ্গে একত্ব ?

ঈশোপনিষদ বলছেন –

"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্যপ্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যো'সাবসৌ পুরুষঃ সো'হমস্মি"।

সহস্রারে প্রাণবায়ুর শেষরূপ সূর্যমণ্ডল আর এই সূর্যমণ্ডলের মধ্যে মানুষের রূপে পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম।

যদি কারও এই পরমব্রহ্মত্ব লাভ হয় তাহ'লে কতকগুলি নরনারী তাঁকে সূর্যমণ্ডলে দেখতে পায় আর তারা এসে সে কথা বলে। আমাদের এখানে ১৪ জন নরনারী আমাকে এরকম দেখেছেন (মেয়েরা তাঁদের স্বামীর মাধ্যমে এই অপূর্ব অনুভূতির কথা ব'লে পাঠিয়েছেন)।

এ সব অনুভূতি দেহের মধ্যে হয়। প্রাণবায়ুই সূর্যের রূপ ধারণ করে আর তারই মাঝে দেখতে পায় আমার এই মানুষ রূপ – হিরন্ময়।

৬৩৪। **"তবে তুমি লোকের ভালোর জন্য এসব করছ।"**

ব্যষ্টি বৃথা অহঙ্কার তোমাকে কর্তা সাজিয়েছে।

"জোনাকিও ভাবে সে জগৎকে আলো দিচ্ছে।"

৬৩৫। **"যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয়"।**

ব্যষ্টি বিবেক – জ্ঞান – আত্মা সাক্ষাৎকার।

যার আত্মাসাক্ষাৎকার হয়নি, তার শুদ্ধবুদ্ধি হয় না – সে অপরের আদর্শ হতে পারে না।

বিশ্বব্যাপিত্ব মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই ব্রহ্মত্ব বা একত্ব লাভ।

মানুষের ব্রহ্মত্ব লাভের কথা বেদ বলেছে – কোন্ সহস্র সহস্র বৎসর আগে – আজ সে সময় নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই। European scholar- রা এবিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ। হাঁ, তাঁরা আর্যবংশ সম্ভূত। কিন্তু গ্রীক Pythagoras থেকে আরম্ভ ক'রে ২৭০০ বছরের ভিতর কারও আত্মার সাক্ষাৎকার হয়নি। আত্মার সাক্ষাৎকার হলে – সে লুকিয়ে রাখতে পারা যায় না। আপনা হ'তে জগতে প্রচার হয়। "ন ততো বিজুগুপ্সতে।" " বিজুগুপ্সতে" মানে ঘৃণা করা নয় – গোপন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বুদ্ধদেব"- এ এই অর্থ করেছেন। আমার জীবনে – আবালবৃদ্ধবনিতা এই অপূর্ব

সত্যের প্রমাণ দিচ্ছে।

Egyptian, Babylonian, Assyrian বা Persian কিংবা যে সমস্ত ধর্ম আধুনিক জগতে প্রচারিত তাদের ভিতরও এই বেদোল্লিখিত প্রমাণের কথা আজও শোনা যায়নি।

হ্যাঁ, একটি কথা পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্মে – "অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব" – সে শ্রীবুদ্ধের কথা নয় – নাগাজ্জুর্নের – শ্রীবুদ্ধের ৫০০ বছর পরে।

মাত্র বেদের অস্ফুট প্রতিধ্বনি – "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।"

৬৩৬। **"যদি আদেশ হয়ে থাকে"**

ব্যষ্টি ১ম। সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকার হ'য়ে বলেন।

২য়। দৈববাণী হয় মাথায়।

৩য়। অপরে – একজন দু'জনে নয় অন্তত চার পাঁচ জন লোক দেখবে তুমি লেকচার দিচ্ছ। একঘর লোকের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলছ।

এই তৃতীয় আদেশই শ্রেষ্ঠ আদেশ। এই ব্যবস্থা ঠাকুর এখন করেছেন। তুমি বলবে, তুমি আদেশ পেয়েছ – আমি বিশ্বাস করবো কেন? আমার ভেতর থেকে যদি আমাকে তোমার বিষয় দেখান, তখন আমি বুঝতে পারবো, আমার বিশ্বাস হবে। তাই ঠাকুর এখন নতুন ব্যবস্থা করেছেন – তোমার অবস্থা অপরে তার নিজের ভেতর থেকে জানবে – তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না – অবশ্য এ ভারী মজার কৃপা – আর সম্পূর্ণ নতুন – অন্তর থেকে সচ্চিদানন্দ জানিয়ে দিচ্ছেন। অদ্ভুত ঠাকুর – তাঁর অদ্ভুত কৃপা।

বিশ্বব্যাপিত্ব এই আদেশ পাওয়া ব্যষ্টির সংস্কার বিশেষ। তোমার ব্রহ্মত্ব লাভ হোক, তোমাকে অসংখ্য লোক অন্তরে দেখবে। আজ জগতে চারশ' কোটি জন সংখ্যা – তার ভেতর এই একটি লোককে এই অগণিত নরনারী দেখে কেন?

"From lower truth to higher truth" ব'লে কোন কথা নেই। – স্বামীজী নিজেই একথা ব'লেছেন। নিজেই নিজের কথা খণ্ডন করেছেন – আর ঐ বৃহৎ মন্দির* বাইরে দেখলে কি হবে! একেবারে রাস্তায় বসিয়ে গিয়েছেন ঠাকুরকে।

১৮৯৩ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের স্বামীজীর লেকচারে কি অদ্ভুত ফারাক!

৬৩৭। "আদেশ পেয়ে কেউ যদি লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না"।

ব্যষ্টি "আদেশ পেয়ে" – সত্যস্বরূপ ভগবানের কথা ব'লে। সত্য–সত্য। সত্য ত' আর মিথ্যা নয়। সে যে আদেশ পেয়েছে তার লক্ষণ তার কথা শুনে লোকের

* বেলুড় মঠ

আত্মিক স্ফুরণ হবে।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে বা Universalism - এ "সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চ আত্মনি।"

লেকচার বা লোকশিক্ষার স্থান নেই – একটা হাসির কথা মাত্র।

বেদে এর চূড়ান্ত মীমাংসা করেছে – স্মরণাতীত কালে – "অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়, পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য, স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।"

লোকশিক্ষা – মিথ্যা অহংকার – একটা False Vanity। আদেশ Self illusion – আত্মপ্রবঞ্চনা। নিজের অন্তর্নিহিত বাসনা মূর্ত হ'য়ে নিজেকে প্রতারিত করে।

ঠাকুর নিজেই বলছেন – "এ সব মাথার খেয়ালে নয় ত'?" মনে এ সন্দেহ কেন?

ব্রহ্মপুর এই দেহের সহস্রারে। বেদ বলছে - সেখান থেকে 'অজানা' লোক এসে 'সম্প্রসাদকে' ব্রহ্মপুরে নিয়ে যাবে।

আমরা সংখ্যাতীত নরনারী বেদের এ সত্য আমাদের জীবনে পরিস্ফূট হতে দেখছি – ঋষিদের – মানবজীবনের সনাতন পরাবিদ্যা সত্য।

অতীতেও সত্য বর্তমানেও সত্য।

আবার ভবিষ্যতেও সত্য – অনাদি ও শাশ্বত।

৬৩৮। "বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে।"

ব্যষ্টি এটি দেখতে পাওয়া যায়। তুমি দেখবে যে তা নয়, অপরে তোমার বিষয় দেখবে – তোমায় এসে বলবে। সে দ্রষ্টা তুমি শ্রোতা মাত্র। একটি টিনের বড় আটচালা ঘর, চারদিকে ঘেরা। পাঁচজন বন্ধু শুয়ে আছে। মাঝখানে তুমি। টিনের চালে একটি ছেঁদা। সেই ছেঁদা দিয়ে সূর্যকিরণ এসে পড়ছে – তোমার মুখে। দ্রষ্টা ঐ পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে একজন বন্ধু।

৬৩৯। "বড় বড় পন্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।"

ব্যষ্টি কেঁচো আর জাত সাপে (জাগ্রত কুণ্ডলিনী) যা প্রভেদ – এই অবতীর্ণ শক্তির কাছে – তিনি যেই হোন না কেন – সেই রকম প্রভেদ।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে কেঁচো কিংবা জাত সাপ – এ সব কোন প্রশ্ন ওঠে না। Zoological Garden (চিড়িয়াখানা) - এর দরকার হয় না।

মানুষ মাত্রই ব্রহ্ম – আমি – "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" – আর মানুষ তার প্রমাণ দেয় – আমাকে দিতে হবে না।

৬৪০। "প্রদীপ জ্বাললে – বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে – ডাকতে হয় না।"

ব্যষ্টি আত্মা যাঁকে কৃপা করে কৃতার্থ করেছেন – তাঁর কাছে আপনা হতে আকৃষ্ট হয়ে লোক আসে – "সাইনবোর্ড" মারতে হয় না। সাধারণ লোক নয়, যাঁরা সংস্কারবান পুরুষ তাঁরাই আসেন, "আদাড়ে গুলো নয়।"

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে এই লোক বাছাবাছি নেই – সকলেই "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" হয়।

মেয়েদের আসতে হয় না – ঘরে বসেই হয়। মা জননীরা (আবার - আমিই সেই "মা জননী" রূপে) বেদের এই অশ্রুতপূর্ব সত্যের প্রমাণ দেন।

"নেতরেষাম্" – বেদে বলছে। কিন্তু "সিদ্ধা'য়ের জোর থাকলে বাবুই গাছেও আম হয়।"

৬৪১। "আমি সে সকল লোককে বলি দূর কর – আমার ওসব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না।"

ব্যষ্টি বিষয়ী লোকের সঙ্গ কিছুতে সহ্য হয় না। আমি পূর্ণ – আমি কিছু চাই না। জীবনে যা পেয়েছি জীবন তাতে পরিপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে পূর্ণ তিনিই যিনি নিজের জীবন্ত রূপের চিন্ময় মূর্তিতে মনুষ্যজাতির অন্তর পূর্ণ করেছেন –

"একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

"আমি কারুর কিছু লই না" – অপরিগ্রহ – অতএব আমি পূর্ণ।

এ মিথ্যা অহংকার আর কাল্পনিক পূর্ণ।

প্রতি পদ বিক্ষেপে, প্রত্যেক মানুষ জগতের মনুষ্যজাতির সাহায্য নিচ্ছে। আমি মনুষ্যজাতির আবার মনুষ্যজাতিই আমি –

"যস্মিন্ সর্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।

৬৪২। "লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।"

ব্যষ্টি লোহা আসে, মাটি আসে না। যাদের সংস্কার আছে তারা আসবে, অপরে নয়।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে লোহা নেই, চুম্বক নেই Metallurgical Department নেই।

আছে মানুষ – তাঁর ব্রহ্মত্ব বা আত্মিক একত্ব – আর সেই একত্বের স্ফুরণ – "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।"

৬৪৩। "সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, – ফুরায় না।"

ব্যষ্টি যাকে আদেশ দেন, ভগবান সেই শরীরে আদেশরূপে প্রকাশ পেয়েছেন – সে শক্তির শেষ নেই।

৬৪৪। "যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচারে কি হবে।"

ব্যষ্টি যে দেহেতে ভগবান আদেশ রূপে স্ফুর্ত হন নাই – তার কথা কেউ শুনবে না।

৬৪৫। "তাই ভাল লোক না হলে, লেকচারে কোন উপকার হয় না।"

ব্যষ্টি ভাল – সৎ –অস্তি –

"পাকা আমি" – সগুণ, নির্গুণ আর অবতারতত্ত্ব। এই অবতীর্ণ শক্তির কথা – অপরের শরীরে ধারণা হয়, ফুটে ওঠে। কাশীপুরের বাগানে, "নরেন লোকশিক্ষে দিবে" – চিকাগো লেকচারে মূর্ত হয়েছিল – এই "পাকা আমি" না হলে তার কথায় – অবশ্য ঈশ্বরীয় কথা, তার কাছ থেকে শুনে অপরের আত্মিক স্ফুরণ হয় না। ঠাকুরের "মা, আমি বলছি না, তুমি বলছ।"

এই 'পাকা আমির' ভিতর থেকে ঈশ্বর কথা বলেন। 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী।'

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে 'ভাল মন্দ' নেই আর "লেকচার"ও নেই। জগতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মের লেকচার হয়েছে (আরম্ভ শ্রীবুদ্ধ থেকে আর আজও সমানে চলেছে), কত ধর্মশিক্ষার ক্লাস হয়েছে, কত রাশি রাশি বই লেখা হয়েছে, কত মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, রাশি রাশি বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী বিভিন্ন ভাষায় Translation হয়েছে – কিংবা হাসে, কাঁদে , নাচে, গায়, মুহুর্মুহু সমাধি – হাজার হাজার বার দশাপ্রাপ্তি – লক্ষ অঙ্গবিকার – "মুই সেই" – "আমি হয়েছি- আমি এসেছি" – বালকবৎ-জড়বৎ- উন্মাদবৎ- পিশাচবৎ – এসব কিছুই কিছু নয়।

মার্কামারা বেদের প্রমাণ, "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।"

৬৪৬। "চাপরাশ।"

ব্যষ্টি লিখিত দলিল – ভগবান মূর্তি ধারণ করে বলেন – আদেশ দেন – ভক্ত দেখে, এ যে একবার হয় তা নয় – বার বার হয় – কখনও আকাশবাণী, কখনও স্বপ্নে, কখনও বা লিখে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চাপরাশের কথা "কথামৃতে" আছে। ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে একখন্ড কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, 'নরেন লোকশিক্ষে দিবে'। একদিকে চাপরাশ কাকে বলে দেখানো হলো আবার সেই সঙ্গে স্বামীজিকে চাপরাশও দেওয়া হ'ল।

বিশ্বব্যাপিত্ব "আদেশ", "চাপরাশ" – ইত্যাদি সমস্তই আত্মসৃষ্টি আর

আত্মপ্রবঞ্চনা (Self illusion --- false vanity in the sub-conscious state takes form)

বিশ্বব্যাপিত্বে মনুষ্যজাতি তোমার সঙ্গে এই আত্মিক একত্ব ঘোষণা করবে অবশ্য অন্তরে দেখে– আনুমানিক নয়, কাগজে লিখে নয়, লেকচার দিয়ে নয়, কিংবা চিঠিতে লিখে নয় – "Religion is Oneness"

৬৪৭। **"তাঁর খুব শক্তি চাই।"**

ব্যষ্টি অফুরন্ত শক্তি। ভগবান তাঁর ভেতর থেকে কাজ করেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বের চেয়ে 'খুব শক্তি'র প্রমাণ আজ পর্যন্ত জগতের দরবারে কেউ দাখিল করতে পারেনি।

হ্যাঁ, Hydrogen bomb, Atom bomb এদের formula তৈরি হয়েছে – অপরে তৈরী করতে পারে।

জগতের চারশ' কোটি লোকের মধ্যে এই একটি লোককে অসংখ্য নরনারী অন্তরে দেখে – আর কি করে সেই দেখা সম্ভব হয়, তার formula আজও তৈরী হয়নি।

এই একত্বই ধর্ম।

বহুবার বহুলোক জগতে ধর্মের প্রমাণ চেয়েছে – প্রমাণ পায়নি। সংখ্যাতীত নরনারী আজ সেই ধর্মের প্রমাণ দিচ্ছে – আমাকে অন্তরে দেখে বলছে, "যো'সাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি।"

"Absolute equality and abstract equality"– Plato.

৬৪৮। **"চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা করে গেলেন তারই বা কি রয়েছে বল দেখি?"**

ব্যষ্টি বুদ্ধ ও শঙ্কর বিবিদিষার প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু এই বিবিদিষা মূর্ত হয়ে উঠেছিল – ষোল আনা নয় পাঁচসিকা পাঁচ আনা – মহাপ্রভুর জীবনে – "গোরা নারীর ছবি হেরবে না।" ঠাকুর নিজেও বলেছেন – "গৌর অবতারে ভারি নিষ্ঠা কাষ্ঠা, কেমন না?"

এই আদর্শ-কঠোরী চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তদের শিক্ষা দিচ্ছেন – "তোমরা সংসারে থেকে হরিনাম কর।"

মহাপ্রভু বুঝেছিলেন বিবিদিষায় বস্তুলাভ হয় না – ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরলাভ – তাই বললেন সংসারে থেকে হরিনাম কর। ভক্তেরা গ্রহণ করতে পারেনি এই উপদেশ – মহাপ্রভুর জীবন দেখে।

ঠাকুরের জীবন – সে তোমার আমার জীবন – সর্বসাধারণের জীবন –

তাই তিনি সর্বসাধারণের। চাকরি ক'রে খেয়েছেন – তারপর ''পেন্সিল'' (Pension) খেয়েছেন – কিন্তু নিশিদিন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা – ভেতরে ক্ষীরের পোর–এই যুগের আদর্শ জীবন।

বিশ্বব্যাপিত্ব শ্রীবুদ্ধ থেকে আরম্ভ আর আজ পর্যন্ত সমস্ত আচার্যের এক শিক্ষা – '' তুমি কর।'' তাতে যদি না হয় – সে তোমার ক্রুটি – ব্যস্ – আমি খালাস।

বেদবিদ্রোহী বিবিদিষা-পন্থী আচার্য এঁরা – শুধু দল তৈরি ক'রে মনুষ্যজাতিকে বিভ্রান্ত করেছেন আর নিজের মহিমা প্রচার করেছেন !

বেদের শাশ্বত সত্য ''ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ'' – ''সর্বভূতস্থম্ আত্মানম্, সর্বভূতানি চ আত্মনি'' – এই স্বভাবসিদ্ধ মানবধর্ম – অর্থাৎ জীবন্ত মানুষের ব্রহ্মত্ব লাভ আর তাঁর সঙ্গে আত্মিক একত্ব।

বেদের মধুবিদ্যার দ্বারা এই একত্ব (দ্রষ্টব্য–'নিবেদন') – আর এই "The Universal Religion of Mankind" সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

৬৪৯। ''এ সাগর অমৃতের সাগর।''

ব্যষ্টি অমরত্ব প্রাপ্তি।

বিশ্বব্যাপিত্ব মনুষ্যজাতিই – সমুদ্র (জন-সমুদ্র) আর এই আত্মিক একত্বই অমৃতত্ব।

যে জীবন্ত মানুষের রূপ ধরে এই একত্ব তথা অমৃতত্ব মূর্ত হয়, তিনিই পুরুষোত্তম – বেদের ''স উত্তমঃ পুরুষঃ''।

ধর্ম প্রামাণিক আর প্রাণময় – জীবন্ত।

ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র – Maginot line – কামানের গর্জনের মধ্যেও আমাকে দেখে (অবশ্য তিনি ক্রিশ্চান আর ফ্রেঞ্চ) একত্ব লাভ করে। আবার সাড়ে দশ হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর অপরার্দ্ধে Honolulu-তে আমাকে দেখে জগতে ঘোষণা করে – এই আত্মিক একত্বই – শাশ্বত সত্য। (দ্রষ্টব্য ৮৫৯ নং ব্যাখ্যা, বিশ্বব্যাপিত্ব)

৬৫০। ''অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।''

ব্যষ্টি দেহেতে ভগবান। তিনি দেহে প্রকাশ পান। এ প্রকাশ হবার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। তাঁর যে রকম ইচ্ছা, সেই রকম ভাবে প্রকাশ পেতে পারেন – অনন্ত পথ।

বিশ্বব্যাপিত্ব এই একত্বই অমৃতের সাগর। প্রতি মানুষের অন্তরে একটি জীবন্ত মানুষের রূপ – ''একঃ বশী সর্বভূতান্তরাত্মা।''

৬৫১। ''তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়'' –

ব্যষ্টি নিত্যসিদ্ধ।

বিশ্বব্যাপিত্ব ঝাঁপ দিতে হয় না। আপনা হতেই হয় – স্বয়ম্ভু – স্বয়ংপ্রকাশ।

৬৫২। "সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও" –

ব্যষ্টি একটু খাও – আস্বাদন মাত্র – ষষ্ঠভূমির কথা – জ্যোতি দর্শন। এতে বস্তুলাভ হয় না। এই হলো সাধন সিদ্ধ। এঁরা জীবন্মুক্ত হন না। মৃত্যুকালে এঁরা মহাকারণে লয় হন – তাও আবার গুলিয়ে যেতে পারে। "মহামায়ার রাজ্যে বড় হিজিবিজি"।

বিশ্বব্যাপিত্ব ষষ্ঠভূমির এই কাল্পনিক সংস্কারজ রূপদর্শনের অনুভূতিকে কেউ ধর্ম জগতের "ভগবান দর্শন" বলে ইংরাজীতে কেতাব লিখে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি বলে পরিচয় দিয়েছেন। হা ভগবান! ইনি কি বেদের এই শাশ্বতবাণী, "অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য, স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" একথা পড়েননি? এমন কি তাঁর গুরুদেবও এ কথার ব্যাখ্যা করেননি? অবশ্য এ উপলব্ধি বিশ্বব্যাপিত্ব না হলে বলা যায় না।

শ্রী আর আর দিবাকর (বিহারের ভূতপূর্ব গভর্নর) তাঁর 'Shri Aurobinda The Mahayogi, বইতে লিখেছেন, শ্রীঅরবিন্দের আলিপুর জেলে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয়েছিল – ঐ যে, শ্রীবাসুদেব মূর্তি দর্শন করেছিলেন!

এই সব লেখক ইষ্টমূর্তি সাক্ষাৎকার আর ভগবান দর্শনের প্রভেদ বোঝে না – আর এদের গুরুদেবেরও ভগবান দর্শন হয়নি, কারণ শ্রীঅরবিন্দ যদি শ্রীদিবাকরকে ইষ্টসাক্ষাৎকার ও ভগবান দর্শনের ফারাক বুঝিয়ে দিতেন তা হলে এরকম একটা বেফাঁস কথা জগতের দরবারে বেরোত না।

"আল্লা সুকৌশলী" কোরাণের এই বাণী শাশ্বত সত্য–রোগীর নিজের মুখ দিয়েই ব্যক্ত হচ্ছে – তিনি ভগবান বা যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের দর্শকবৃন্দকে চ্যালেঞ্জের কথা মনে পড়ছে। সেই সাত হাজার নরনারীকে তিনি Challenge করলেন "যারা হিন্দু ধর্ম বিষয়ে জানেন তাঁরা অনুগ্রহ করে হস্তোত্তলন করে আমাকে জানান।" সাত হাজার ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন খানি হাত উঠেছিল। তখন তিনি বজ্রনির্ঘোষ স্বরে বলেছিলেন,

"Still you dare to criticise Hinduism?"

শ্রীদিবাকর ও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ঐ একই কথা – Still you dare to play the role of a teacher and to write about religion?

খবরের কাগজে প্রকাশ, কে একজন মহাত্মা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিল "আপনার

কি ভগবান্ দর্শন হয়েছে?"

মহাত্মা গান্ধী জবাব দিয়েছিলেন – "না, তবে, বটে, কিন্তু!"

৬৫৩। "কেউ তোমায় ধাক্কা মেরেই ফেলে দিক।"

ব্যষ্টি কৃপাসিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ ও স্বপ্নসিদ্ধ।

৬৫৪। "যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হলেই ঈশ্বরকে পাবে।"

ব্যষ্টি অন্তরে ঈশ্বর যদি কৃপা করে স্ফুর্ত হন – এ যুগের ইন্‌জেকসন – ঠাকুর কৃপা করে যা দেখিয়েছেন – তবে ঈশ্বরকে পাওয়া, ঈশ্বর লাভ, বাহিরে আড়ম্বরে নয়।

বিশ্বব্যাপিত্ব এক পথ – একত্ব বা বিশ্বব্যাপিত্ব।

৬৫৫। "কর্মযোগ বড় কঠিন।"

ব্যষ্টি হয় না।

৬৫৬। "জ্ঞানযোগও – এযুগে ভারী কঠিন।"

ব্যষ্টি হয় না।

বিশ্বব্যাপিত্ব "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" না হলে জ্ঞান হয় না, ব্যষ্টির জ্ঞান – অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎকার ব্যষ্টিতেই আবদ্ধ আর প্রমাণহীন।

জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান – জগতের মনুষ্যজাতি তোমাকে নিজেদের দেহের ভিতর দেখে এই আত্মজ্ঞান দান করে – "আমরা তুমি"। সমস্তই তাদের ওপর নির্ভর – তোমার ওপর নয়।

জ্ঞানই আত্মিক একত্ব – আর একত্বই জ্ঞান।

৬৫৭। "তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ"

ব্যষ্টি আপনা হতে হয় – তাই সহজাত – সহজ।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে যোগের ফিরিস্তিও (list) নেই আর ভক্তিও নেই।

ভক্তিযোগ কল্পিত বস্তু – বসানো শিব। ভক্তিযোগের শেষ সীমা – পাগল হওয়া – "আমায় দে মা পাগল করে।"

গৌরাঙ্গ ও ঠাকুর উভয়েই উন্মাদ হয়েছিলেন। তাঁদের জীবনে তাঁরা উভয়ে এর প্রভূত পরিচয় দিয়েছেন।

গৌরাঙ্গের সমুদ্রকে যমুনা দেখা – পাগলেই দেখে। দেবদাসীরা গভীর রাত্রে গান গাইছে আর তিনি শুনছেন – কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছে। পাগলেই এরকম শোনে – আর দে ছুট, দে ছুট – চটক পাহাড়!

ঠাকুরের কথা – গা-ময় বিষ্ঠা– হাতে হাতকড়া, বসে আছেন দক্ষিণেশ্বরে।
(– 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস')*।

ভক্তি উন্মাদ, প্রেমোন্মাদ, আর জ্ঞানোন্মাদ – ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান – এই

---

* সংকলক –সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনটি কথা উচ্ছেদ করলে থাকে – উন্মাদ – The common and concomitant factor is উন্মাদ।

ঋষিবাক্য – ধর্ম – অমৃতত্ব। অমৃতত্ব এই আত্মিক একত্ব।

"অমৃতস্য পুত্রাঃ" – সর্বজনীন আর সর্বকালীন।

৬৫৮। **"ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।"**

ব্যষ্টি দেহেতে ভগবানের প্রকাশ – তাই তিনি ষষ্ঠ ভূমিতেও থাকতে পারেন – আবার অবতীর্ণ হতেও পারেন – সমস্ত তাঁর কৃপা – তাঁর ইচ্ছা।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে 'ভক্তবৎসল' খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান বা একত্ব আপনা আপনি হয় – স্বয়ম্ভু – পরাবিদ্যা।

"ভক্তবৎসল" ব্রহ্মজ্ঞানের পুটলিটি হাতে দিয়ে যান না। অদ্ভুত নাটকের কল্পনা আর সত্যের অপলাপ।

৬৫৯। **"তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন।"**

ব্যষ্টি মায়ার সম্পূর্ণ রহস্য ভেদ। অপরকে দেখিয়ে দেন তোমার চেহারা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস মূর্তির মতন আর মহামায়া নারীর মূর্তি ধারণ করে পদসেবা করছেন।

৬৬০। **"কলকাতায়"**

ব্যষ্টি সপ্তমভূমি।

৬৬১। **"গড়ের মাঠ"**

ব্যষ্টি সহস্রার – রাসফুল – ঢাকা চামড়া গুড়িয়ে যায় – দেখতে পাওয়া যায়।

৬৬২। **"সুসাইটি"***

ব্যষ্টি আত্মার সাধন – সব মৃত – কিছুই নেই। মিউজিয়াম – মৃতের কঙ্কাল।

৬৬৩। **"কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন করে আসি"।**

ব্যষ্টি তাঁর কৃপা না হলে কলকাতায় – সপ্তমভূমিতে প্রবেশ করা যায় না।

৬৬৪। **"জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে, জ্ঞানও পাবে।"**

ব্যষ্টি কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে দেহ ভেদ করলে, তবে ভক্তি। আবার কুণ্ডলিনী সহস্রারে গিয়ে "মড়ার খুলিতে বিষ ঢাললে" তবে আত্মা সাক্ষাৎকার।

৬৬৫। **"জ্ঞানও পাবে"**

ব্যষ্টি আমি না – এই জ্ঞান – তত্ত্বজ্ঞান।

৬৬৬। **"ভক্তিও পাবে"**

ব্যষ্টি দেহের মধ্যে 'মানুষ-রতন'কে পাওয়া।

৬৬৭। **"ভাব সমাধিতে রূপ দর্শন।"**

---

* এশিয়াটিক সোসাইটি

ব্যষ্টি ষষ্ঠভূমিতে ইষ্ট-সাক্ষাৎকার ও নানাবিধ ঈশ্বরীয় সাকার মূর্তি দর্শন।

৬৬৮। "নির্বিকল্প সমাধিতে অখন্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়।"

ব্যষ্টি আত্মা সাক্ষাৎকার।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্যষ্টিতে নির্বিকল্প সমাধি হয় না। লয় হওয়াকে কাল্পনিক ভাবে ধরে নিয়েছেন ওঁরা অর্থাৎ ঠাকুর এবং তোতাপুরী দুজনেই – 'লয়' হলেই নির্বিকল্প সমাধি। তোতাপুরী এরকম শিক্ষা দিয়েছিলেন। ধ্যানে 'লয়' হওয়া বা সহজিয়া সমাধিতে 'লয়' হওয়া মোটেই নির্বিকল্প সমাধি নয়। সাংখ্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সমাধিকে লয়যোগ বলে নির্দেশ দিয়েছে। সাংখ্যমতে চার রকম যোগ -

১। রাজযোগ, ২। লয়যোগ, ৩। হঠযোগ, ৪। মন্ত্রযোগ।

– এই মন্ত্রযোগই পরবর্তীকালে ভক্তিযোগ বলে প্রচলিত হয়।

Justice Woodroffe তাঁর "Serpent Power" নামে বইয়েতে হিন্দুর শাস্ত্র থেকেই বলছেন – লয়যোগ বা মন্ত্রযোগে (বা ভক্তিযোগে) – সবিকল্প সমাধি। রাজযোগেই একমাত্র নির্বিকল্প সমাধি। Samadhi in Rajayoga is Complete (চিৎ-স্বরূপ ভাবঃ)।

পাতঞ্জলের ভাষ্যকার কৈবল্যপাদে 'নির্বিকল্প সমাধি'কে "চিৎ-স্বরূপভাবঃ" (তদাকারকারিত) বলে নির্দেশ করেছে।

'চিৎ-স্বরূপভাবঃ'- এর অর্থ "বিশ্বব্যাপিত্ব"।

"একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

নাম রূপ সমেত নির্বিকল্প সমাধি – নাম রূপ নাশ হয় না।

সাদা কথায় নির্বিকল্প সমাধির প্রমাণ হলো, অসংখ্য নরনারী শিশুবৃদ্ধ সেই নির্বিকল্প সমাধিবান পুরুষকে তাঁর জীবদ্দশায় তাদের অন্তরে দেখবে আর সেই কথা জগৎকে জানাবে – "তদাকারকারিত"। নির্বিকল্প সমাধির প্রমাণ হলো এই আত্মিক বিশ্বব্যাপিত্ব।

Justice Woodroffe আরও বলেছেন, – সবিকল্প সমাধিতে মহাবায়ু সহস্রারে অবস্থান করতে পারে না – চতুর্থভূমিতে নেমে আসে। ঠাকুরের জীবনে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে দুটি মাঝির মারামারি, চপেটাঘাত, আর সেই থাবড়ার দাগ ঠাকুরের পিঠে ফুটে ওঠা – এটি চতুর্থভূমি - হৃদয়। Justice Woodroffe তাঁর বইয়েতে লিখেছেন – মন চতুর্থভূমিতে থাকলে এরূপ লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

ঠাকুর নিজেও বলতেন, "মা আমার মন নীচে নাবিয়ে রেখে দিয়েছেন।" "নীচে নাবিয়ে রাখা" মানে ষষ্ঠভূমি আর পঞ্চমভূমির মধ্যে বাচ্ খেলানো নয়।

এই থাবড়ার দাগকে শরৎ মহারাজ বিশ্বব্যাপিত্ব বলে গিয়েছেন – জগতের দরবারে পরিচয় রেখে গিয়েছেন তিনি এসব কিছু বুঝতেন না।

"মহিম মহারাজ" অর্থাৎ শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর বই "রামকৃষ্ণ অনুধ্যান"- এ লিখেছেন, দার্জিলিঙে স্বামীজিরও এই প্রকার লক্ষণ দেহেতে ফুটেছিল – অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিত্ব।

বিশ্বব্যাপিত্বের আদ্যশ্রাদ্ধ আর পুরোহিত শ্রীশরৎ মহারাজ ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে "মহিম মহারাজ।"

বিশ্বব্যাপিত্বের লক্ষণ বেদে হাজার হাজার বছর আগে উল্লেখ আছে – "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে"। পিঠে থাবড়ার দাগ নয়।

৬৬৯। "তখন"

ব্যষ্টি তারপর

৬৭০। "অহং, নাম, রূপ থাকে না।"

ব্যষ্টি বোধমাত্র – জড় সমাধি ও পরে স্থিত সমাধি।

বিশ্বব্যাপিত্ব এটি ব্যষ্টির। নির্বিকল্প সমাধি নয়।

৬৭১। "আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়।"

ব্যষ্টি কুণ্ডলিনীর মহাবায়ু হওয়া, আর দেহকে তোলপাড় করা। ঠাকুর বসে থেকে থেকে লাফিয়ে উঠতেন। মহাপ্রভুর "ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভুঁয়ে গড়ি যায়।"

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্যাষ্টির Self created ভাব প্রবণতা।

৬৭২। "তবে যখন তুমি আদেশ করবে তখন তোমার কর্ম করবো, নচেৎ নয়।"

ব্যষ্টি তখন ঘাড়ে ধ'রে করায়, তুমি সাক্ষী মাত্র।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্যষ্টির ভিত্তিহীন আত্মম্ভরিতা আর বেদ বিদ্রোহিতা –

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" – নচেৎ নয়।

৬৭৩। "চিল শকুনিও অনেক ঊর্ধ্বে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে।"

ব্যষ্টি মনের বাস কপালে কিন্তু দৃষ্টি লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে।

৬৭৪। "যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করতে পার, তাহলে তীর্থে যাবার কি দরকার ?"

ব্যষ্টি দেহেতে ভগবান। তিনি কৃপা করে দেহের অন্তরে ও বাইরে যদি প্রকাশ পান তবেই ভক্তিলাভ হ'লো। আবশ্যক শুধু তাঁর কৃপা –হিমালয়ের গহ্বরেরও দরকার নেই আর সমুদ্রের মাঝে নির্জন দ্বীপেরও আবশ্যক নেই।

ঠাকুর ৩১ বৎসর ঐ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর বাড়িতে থেকে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। কোথাও যেতে হবে না, ভগবানের কৃপা হলে তবে ভগবান দর্শন। আর তাঁর কৃপা কোন কিছুর অপেক্ষা করে না।

৬৭৫। "তীর্থে যাবার কি দরকার?"

ব্যষ্টি তীর্থগমন, দুঃখভ্রমণ, মন উচাটন হ'য়োনা রে।
তুমি আনন্দে, ত্রিবেণী স্নানে, শীতল হওনা মূলাধারে।।

৬৭৬। "কাশী গিয়ে দেখলাম, সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!"

ব্যষ্টি "যার এখানে আছে, তার সেখানেও আছে। আর যার এখানে নেই, তার সেখানেও নেই।" কামারপুকুরে ঠাকুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে শিবমন্দির। শিব চতুর্দশীর দিন সেই মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন শিবঠাকুর মাথা নাড়ছেন। আবার কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে ঠাকুরের দেহে শিবঠাকুর এসে মিশে গেলেন।

শিবঠাকুর কামারপুকুরে না কাশীতে – কোথায়?

শিবঠাকুর ঠাকুরের সঙ্গে। তাই ঠাকুর শিবঠাকুরকে কামারপুকুরেও দেখছেন আবার কাশীতেও দেখছেন।

৬৭৭। "তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'লো, তাহ'লে তীর্থে যাওয়ার আর ফল হ'ল না।"

ব্যষ্টি তীর্থে গিয়ে যদি তীর্থদেবতার দর্শন না পাওয়া গেল, তা হ'লে বৃথা তীর্থ ভ্রমণ। ঠাকুর বৃন্দাবনে রাখালকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। হৃদয়বাবু ও মথুরবাবু স্বপ্নে রাখাল কৃষ্ণকে দেখেছিলেন।

একজন ভক্ত কামারপুকুরে যাবেন। সন্ধ্যাবেলায় জয়রামবাটীতে পৌঁছিলেন। সেই রাত্রে জয়রামবাটীর আশ্রমে, ঠাকুরের বাড়ির গৃহদেবতা রঘুবীর শালগ্রাম শিলাকে স্বপ্নে দেখলেন।

৬৭৮। "আর ভক্তিই সার"

ব্যষ্টি দেহের সার – আত্মা, ভগবান। ভগবানকে না দেখলে ভক্তি হয় না।

বিশ্বব্যাপিত্ব না, ভক্তিই সার নয় – পরাবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা বা অগ্নিবিদ্যাই সার। বিশ্বব্যাপিত্বই ধর্ম – তা নইলে সমস্ত কষ্টকল্পনা মাত্র – যেমন মহাপ্রভুর রাধা হওয়া। দশাসই বৃহদাকার পুরুষ, তিনি হচ্ছেন কল্পিত 'রাধা'–পুরুষের চেহারা যেমন তেমনি রইলো।

কাল – রাত্রি। স্থান–গম্ভীরা – নীলাচল। প্রভু আমার ঐ বিরাট দেহ লয়ে

স্বরূপ দামোদরের গলা জড়িয়ে বিরহ-কাতরা 'প্যারীর' ন্যায় বিরহোচ্ছ্বাস করছেন –

"উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি,
কঠিন এ পোড়া প্রাণ ছাড় নারীজাতি।"

ধন্য রে কলির রাধা– alias (ওরফে) কল্কি অবতার ! সত্যকারের রাধা কেউ ছিল না – ভাগবতে উল্লেখ নেই। ভাগবতে মহাপ্রভুর রাধার মন্তব্য মাত্র, আনুমানিক। তবুও এ প্রায় পাঁচশ' বছর আগেকার কাহিনী।

আবার এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখছি, দক্ষিণেশ্বরে বাইশ বছরের আড়াই মন ওজনের ' গোপাল' অর্থাৎ রাখাল মহারাজকে কোলে নিয়ে – দাড়ি গোঁফ সমেত ঠাকুর, মা যশোমতী হয়েছেন !

৬৭৯। "সময় না হলে ফল হবে না।"

ব্যষ্টি ব্রহ্মজ্ঞান না হ'লে অমৃতবৃক্ষ দেহেতে হয় না–তলার ডালে ছোট ও উপরের ডালে বড় অমৃত ফল ফলে না – এ দেখতে পাওয়া যায়।

৬৮০। "বাবা, হাগাই তোমাকে ওঠাবে, এজন্যে তুমি কিছু ভেবো না।"

ব্যষ্টি অন্তরে ভগবানের প্রকাশ – যার হয় সে জানে – অবশ্য অপর লোকও জানতে পারে – তবে পরে।

৬৮১। " সেইরূপ, ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া, ঠিক সময় হ'লেই হয়।"

ব্যষ্টি ব্যাকুলতা – যোগের লক্ষণ – দধিমন্থন – মাখন উঠবে। ভগবান যখন আত্মারূপে দেহেতে প্রকাশ পাবেন – তখন দেহ, মন, প্রাণ, চিত্ত সব ব্যাকুল হয়ে উঠবে। গাছের শুক্‌নো পাতা পড়লে শ্রীমতীর মতো চমকে উঠবে। – আর মনে হবে ঐ কৃষ্ণের পদশব্দ।

৬৮২। "সেইরূপ উত্তম থাকের আচার্য আছে।"

ব্যষ্টি উত্তম থাকের আচার্য – সচ্চিদানন্দগুরু। একজনের ধ্যান হোত না – তাঁর ধ্যান করতে ইচ্ছাও হতো না। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু তাঁর ঘাড় ধ'রে জোর ক'রে ধ্যান করাতে বসালেন। সেই থেকে তাঁর বেশ ধ্যান হতে আরম্ভ হ'লো।

বিশ্বব্যাপিত্ব ধর্মজগতে আচার্য ব'লে কিছু নেই। মানুষকে প্রতারিত ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার একটি স্বকপোলকল্পিত শূন্যে উড্ডীয়মান অহংকারের পতাকা, মৃদু বায়ুর দ্বারা পৎ পৎ শব্দকারী ভাষা – আচার্য !

আত্মিক একত্ব আপনা হ'তে হয় – আচার্য নেই – সকলের সমান অধিকার।

"ঘড়াটাও টা আর সরাটাও টা" – অপ্রযোজ্য উপমা – ব্রহ্মত্ব বা একত্ব নয়।

৬৮৩। " কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায় – যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়,

তাহ'লে বৈদ্য কি করবে?"

ব্যষ্টি মহাপ্রভুকে একজন জিজ্ঞাসা করল, এইসব লোক আপনার সঙ্গ করে, তবু এদের ধারণা হয় না কেন? মহাপ্রভু জবাব দিলেন, এরা যোষিৎ সঙ্গ করে।

'বাবুই গাছে আম হয় না', 'সাধুর তুম্বা চার ধাম সাধুর সঙ্গে ঘোরে কিন্তু তেতোই থাকে।'

৬৮৪। "পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়।"

ব্যষ্টি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের শরীরে, আত্মা ভক্তের রূপ ধারণ করেন, তবে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বুঝতে পারেন – এটি ভক্ত – এর সঙ্গে হরিকথা বলতে পারা যায়। এটি পরীক্ষিৎ – ভাগবৎ শোনার পাত্র।

চণ্ডীদাসের – "পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিবে,
তা বিনু সকলই পর"। – এই হ'লো পিরীতি।

বিশ্বব্যাপিত্ব উপরের ঐ ব্যাখ্যা ব্যষ্টির – বিশ্বব্যাপিত্বে অর্থাৎ একত্বে – "সর্বভূতানি চ আত্মনি।"

৬৮৫। "মনে কর, বাপ নাই; হয়তো বাপের ঋণ আছে, সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবেক?"

ব্যষ্টি এ সব ব্যবহারিক লক্ষণ – যোগাযোগের অভাব।

৬৮৬। "ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নন।"

ব্যষ্টি পরাভক্তি।

বিশ্বব্যাপিত্ব একেবারে ভুল! সেই দ্রাবিড়ী, বা সেমিটিক বা অনার্য ধর্ম -Father, Mother, Sir!

অদ্বিতীয় প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনা!

ঋষিবাক্য – 'তত্ত্বমসি' – 'অহং ব্রহ্মাস্মি' – প্রমাণ দেবে বিশ্বব্যাপিত্বে -"ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" – "স উত্তমঃ পুরুষঃ"।

এই উত্তম পুরুষ "কামচার" হন – "সর্বভূতস্থং আত্মানং সর্বভূতানি চ আত্মনি" – সকলে তাঁকে অন্তরে দেখে, আর তিনি সকলকে অন্তরে দেখেন।

৬৮৭। "রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে, এইবার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।"

ব্যষ্টি দেহেতে রামের – ভগবানের যত প্রকাশ হবে, তত পশুত্ব নাশ হবে। একের হ্রাস – অপরের প্রকাশ। রাবণ – দেহবুদ্ধি। রামচন্দ্র – ভগবান।

বিশ্বব্যাপিত্ব রাবণ নেই – আছে রাম (এক)। The Universal religion of

mankind is "Religion is Oneness".

এই আত্মিক একত্ব সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

সর্বজনীন ঃ – আমার এই ব্রহ্মত্বের বা একত্বের রূপ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই দেখে।

সর্বকালীন ঃ – সূর্যমণ্ডলে আমার এই সুবর্ণময় রূপ – যাকে বেদে বলছে পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা "বশী" (নিয়ন্তা) – শাশ্বত। তাই পিতা পুত্র আর পৌত্র – তিনজনেই দেখে।

ঈশানের বাড়ি

২৫-৬-১৮৮৪

৬৮৮। "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি"

ব্যষ্টি কানার কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

গাছ – দেহ।

না উঠতেই – ষষ্ঠভূমি অতিক্রম না ক'রেই – সাধন হতে না হতেই।

কাঁদি – ডাবের কাঁদি। ডাব – মস্তক ও মুখমণ্ডল – চেতন সমাধি – নিগমের – শুক ও নারদের – তবে লোকশিক্ষা।

বিশ্বব্যাপিত্ব ৬৩৩ নং দ্রষ্টব্য।

৬৮৯। "একটু বিবেক বৈরাগ্য আছে"

ব্যষ্টি একটু সাধন ভজন আছে – সাধক।

৬৯০। " কেন না ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।"

ব্যষ্টি ভগবান যখন ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তখন সেখানেই পূর্ণ, যোল আনা। আর কোথাও নেই। আত্মা যেখানে সংকলিত হয় – সেই দেহেতেই আত্মা। আত্মা বহু নয় – আত্মা এক – আর সেই আত্মার মধ্যেই জগৎ। সেই জগতের ছবি দেখছি বাইরে – একের মধ্যে বহু – আবার বহুরও অপর রূপ এক।

বিশ্বব্যাপিত্ব মনুষ্যজাতির সঙ্গে এই আত্মিক একত্বই পূর্ণত্ব বা ভগবানত্ব – আর তার প্রমাণ দেবে মনুষ্যজাতি।

ব্যষ্টিতে সহস্রারে ভগবান্ দর্শন হয় – ত্রিপুটি– তিন – আবার তিনের এক হওয়া – কিন্তু বাইরে তার প্রমাণ নেই।

ঋষি কোন্ স্মরণাতীত কালে বলছেন, – "অহং ব্রহ্মাস্মি" – প্রমাণ নেই।

তারপর কত সহস্র বৎসর অতীত হয়েছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর মনুষ্যজাতিকে

আবার ঋষিবাক্য শোনালেন – ‘‘মাইরি বলছি, ভগবানকে দেখেছি’’ – **প্রমাণ** নেই।

“To see God is to become God”

বেদে এর প্রমাণ – ‘‘স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে’’ – বিশ্বব্যাপিত্ব।

৬৯১। **‘‘কখনও ভগবান চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ।’’**

ব্যষ্টি আগম

‘‘স্বকার্য সাধনে চল মা, শিরোমধ্যে,
পরমশিব যথা আছে, সহস্রার পদ্মে’’।

৬৯২। **‘‘আবার কখনও ভক্ত চুম্বক পাথর হন, ভগবান ছুঁচ হন’’**

ব্যষ্টি নিগম।

অবতীর্ণ হবার পর ‘‘মানুষ-রতন’’ হয়ে ভক্তের দেহেতে হরিনাম করেন।

‘‘ভক্তির কারণে পাতাল ভুবনে
বলির দুয়ারে দ্বারী হয়ে রই।’’

৬৯৩। **‘‘ভক্তের এত আকর্ষণ যে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভগবান তার কাছে গিয়ে পড়েন।’’**

ব্যষ্টি তিন অবস্থা; সগুণে – আত্মা; নির্গুণে – কিছু নেই; অবতারতত্ত্বে – ‘‘মানুষ-রতন’’।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিদ্বতে এই সব অপূর্ব অনুভূতি – অবশ্য ব্যষ্টিতে – বিবিদিষায় নয়। চেষ্টায় নয় – আপনা হতে হয়।

‘‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ’’– বেদ অপৌরুষেয়।

৬৯৪। **‘‘কিন্তু সেই ব্যাধ পূর্ণজ্ঞানী।’’**

ব্যষ্টি সৎপথে থেকে খেটে খেয়ে সাধু হও। জ্ঞান ভক্তি যা কিছু হয়, সমস্তই ভগবানের কৃপায় – তোমার চেষ্টায় নয়। ‘‘পেট চলা’’ মতন উপার্জন – অবশ্য সৎপথে – তাতেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায়। ধর্মব্যাধের জীবনে এই নির্দেশ – ঠাকুরের জীবনেও এই ভাব পূর্ণভাবে আছে। দক্ষিণেশ্বরে চাকরি, তারপর পেন্‌সন্‌।

বিশ্বব্যাপিত্ব পূর্ণজ্ঞান – আত্মিক একত্ব – বিশ্বব্যাপিত্ব। ব্যষ্টিতে পূর্ণজ্ঞান নেই।

৬৯৫। **‘‘বালিতে চিনিতে মিশানো–পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।’’**

ব্যষ্টি বালি – অনিত্য; চিনি – নিত্য। আত্মাসাক্ষাৎকার করে – ‘‘আমি আত্মা’’ এই জ্ঞানলাভ করে থাকবে।

৬৯৬। **‘‘জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয় রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটুকু ত্যাগ করবে।**

ব্যষ্টি জল – বিষয় রস – দেহসুখ – ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে।

দুধ – চিদানন্দরস – চিৎপথে, যোগের পথে – দেহেতে ঈশ্বরীয় বিকাশের সময় যে সব অনুভূতি হয় – তাতে যা আনন্দ। ধ্যানে – ব্রহ্মানন্দ। সহজিয়ায় – "করামলকবৎ" অবস্থায় – সচ্চিদানন্দ। আবতারত্বে – নিত্যানন্দ।

হংস ও পরমহংস – বেদান্ত মতে সিদ্ধের অবস্থা।

হংস – ষষ্ঠভূমিতে জ্যোতিদর্শন।

পরমহংস – সপ্তমভূমিতে আত্মাসাক্ষাৎকার। হংসের আংশিক। পরমহংসের পূর্ণ। তবে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হলে এসব কিছু হয় না। হংস ও পরমহংস দেখতে পাওয়া যায়। যখন সাধনের যা অবস্থা হয় – ভগবান দেখিয়ে দেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে – অবধূত, হংস, পরমহংস – দুধ – জল – গয়লার কারবার – এসব কিছুই নেই – আছে আত্মিক একত্ব – প্রমাণ সমেত।

ঠাকুর বলছেন, "বেদান্তমতে সিদ্ধ হলে পরমহংস হয়।"

স্বামীজী তাঁর লেকচারে বলছেন –

1. "Vedanta continues its search for the final unity"
2. "Vedanta is not yet complete."
3. Vedanta formulates not Universal Brotherhood but Universal Oneness!"

ঠাকুর এই অসম্পূর্ণ (not complete) মতে কি করে সিদ্ধ হলেন – "পরমহংস"!!

স্বামীজীর বেদান্তের এই ভাষণের তাৎপর্য – জগতে এ পর্যন্ত কেউই হননি – "পরমহংস"!!

হংসের প্রমাণ ঃ

হংস – এ অবস্থা অপরকে দেখিয়ে দেয়। তিন বন্ধু। এক সঙ্গে বসে ধ্যান করছিলেন। একটি বন্ধুর ধ্যান ভেঙে গিয়েছিল। তিনি দেখলেন, যে দু'জন বন্ধু ধ্যান করছিলেন তাদের দুজনের মধ্যে – এক জনের আত্মিক চিন্ময়রূপ দেহ হতে বের হয়ে অপর জনের দেহে প্রবেশ করল, পরে সেখান থেকে বেরিয়ে যে দেহ হতে গিয়েছিল - সেই দেহেতে পুনরায় প্রবেশ করল। এই অবস্থাকে "হংস" বলে, – এক দেহ থেকে অপর এক দেহে যাওয়া – হন্ - হন্তি - গচ্ছন্তি।

পরমহংস ঃ

পরমহংসের অর্থ হল – অগণিত নরনারীর দেহেতে প্রবেশ, প্রকাশ, আর সেই প্রকাশের রূপ দেখে তাদের স্বীকার।

পরমহংস প্রমাণ সাপেক্ষ।

পরমহংসত্ব – বিশ্বব্যাপিত্ব – একত্ব।

সিস্টার নিবেদিতা স্বামীজী সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন, "তিনি বলতেন, আমাদের এই লোকগুলোর ভেতর জোর করে ঢুকতে হবে।"

আবার ঠাকুর বলেছেন – দু'রকম পরমহংস – "জ্ঞানী, আর প্রেমী!" কোথায় যে পেলেন তার হদিস পাওয়া যায় না – বোধ হয় কাছা খুলে মসজিদে নমাজ পড়বার সময়। সমস্তই স্বকপোল কল্পিত। যা খেয়ালে আসছে তাই বলছেন, কারণ এ সম্বন্ধে কেউই কিছুই জানেন না – তাঁর শ্রোতারা। এ সমস্ত তাঁদের কাছে – "মথি লিখিত সু-সমাচার" ওরফে "Gospel Truth"! একরকম একচ্ছত্র অধিপতি – সামনে অবতারের মার্কা আর পেছনে পরমহংসের তক্‌মা – হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় – কাপড় ফেলে ন্যাঙটো হয়ে পায়চারি– উন্মাদ হয়ে লিঙ্গপূজা!!

৬৯৭। "আর পানকৌটির মত। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে।"

ব্যষ্টি এই জীব – মনে করলেই পরমূহূর্তে শিব – সমাধিস্থ। ব্রহ্মবিদ্যা – স্মরণ, মনন করলেই দেহেতে ভগবানের প্রকাশ – বিজ্ঞানীর অবস্থা।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে বিজ্ঞানী নেই। একত্ব – গরিব মানুষ (Poor man)। শুধু জানায় আত্মিক জগতে সকলে এক।

৬৯৮। "আর পাঁকাল মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।"

ব্যষ্টি পাঁকাল মাছ – সগুণ আত্মার প্রতীক। দেহ ও আত্মা পৃথক হয়ে থাকা, এ অবস্থার যৌগিক লক্ষণ – ঘাড় ডাইনে বাঁয়ে ঘট্ ঘট্ করে নড়তে থাকে, আর ভেতরে খট্ খট্ শব্দ হতে থাকে। কাছের লোক এ অবস্থা দেখতেও পায়, আর শব্দ শুনতেও পায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে বা একত্বে এ সব ব্যষ্টির দেহতত্ত্বের কোন প্রশ্ন ওঠে না। ব্যষ্টির এই অনুভূতি সুদুর্লভ – "কোটিতে গুটি" – এও অত্যুক্তি!

৬৯৯। "গোলমালে মাল আছে – গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

ব্যষ্টি দেহেতে ভগবান আছেন – দেহ ছেড়ে সেই ভগবানে যুক্ত হয়ে থাক।

বিশ্বব্যাপিত্ব "মাল" হলো "বহুত্বে একত্ব"। অনুমানিক বা কাল্পনিক নয় – প্রমাণ সমেত বাস্তব রূপ – তা নইলে সবই "গোল" – ফাঁকা আওয়াজ – পদ্মলোচন আর শঙ্খধ্বনি।

১৯-১০-১৮৮৪
সিঁথি ব্রাহ্মসমাজ

৭০০। **"দে মা পাগল করে।"**

ব্যষ্টি "ঈশান, ঈশ্বরের জন্য পাগল হও, পাগল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"

বিশ্বব্যাপিত্ব এই পাগল হওয়াই বিবিদিষার শেষ তকমা (Zenith)।

মহাপ্রভু ও ঠাকুরের জীবনে তা সুস্পষ্ট – দু'জনেই পাগল হয়েছিলেন।

মহাপ্রভুর জীবনে – সমুদ্রে ঝাঁপ, গভীর রাত্রে চটক পাহাড়ে ছুট, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাত্রে চারদিকে ঘুরে বেড়ান – ইত্যাদি উদাহরণ।

ঠাকুর নিজেই বলছেন, "কালে উন্মাদ হলাম।"

একত্ব–" তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী।"

৭০১। **"কারণানন্দ চাই না।"**

ব্যষ্টি দেহে ভাগবতী তনু বা কারণশরীরের আনন্দ। ভাগবতী তনু না হ'লে ঈশ্বরীয় আনন্দ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরীয় আনন্দের আরম্ভ ভাগবতী তনুতে। ধ্যানে ব্রহ্মানন্দ, মুহুর্মুহু সমাধিতে সচ্চিদানন্দ, সহজিয়ায় – নিত্যানন্দ।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বই একমাত্র আনন্দের উৎস– (Vide Swamiji's Complete Works, Vol VII, P 161) – অবশ্য, বহুত্বে একত্ব।

৭০২। **"সিদ্ধি খাবো।"**

ব্যষ্টি খাবো – দর্শন করবো। ঈশ্বর দর্শন করবো আর ঈশ্বর দর্শনের আনন্দ পাবো।

বিশ্বব্যাপিত্ব বহুত্বে একত্বই সিদ্ধি। তা না হ'লে – সেই পুরাতন শঙ্খধ্বনি আর চির পরিচিত অতীতের পদ্মলোচন।

সত্যিই সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখের কথা 'সিদ্ধ' কথার অর্থ এ পর্যন্ত কেউ দেননি।

ব্যষ্টির সিদ্ধের প্রমাণ নেই।

ঠাকুর ভগবান দর্শনের কথায় সিদ্ধ ব'লছেন – "পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য"; কিন্তু " স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে " না হ'লে – এর প্রমাণ হ'লো না।

সাংখ্য তাই বলছেন – "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ।" অর্থাৎ সাংখ্য direct আর বাস্তব প্রমাণ চাইছেন।

জীবন্ত মানুষের ব্রহ্মত্ব বা একত্ব – 'স একঃ' – আর সেই একের রূপ বহুত্বে, এই সিদ্ধির direct বাস্তব প্রমাণ।

সিদ্ধ ঃ-

মানুষ হয়ে জন্মেছি – মনুষ্যজীবনের কোনও উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া

(Fulfilment of purpose)।

এখন এই উদ্দেশ্য কি আর পূর্ণ হয় কিসে?

ঋষি ব'লছেন – "অহং ব্রহ্মাস্মি"

বেদে ব্রহ্মত্বের লক্ষণ দিয়েছে, –

১। 'য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি, কামং কামং পুরুষো নির্মিমানঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।'

২। 'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।'

এর সরল অর্থ অগণিত নরনারী এই লোকটির আত্মিক চিন্ময় রূপ অর্থাৎ চিদ্ঘনকায় রূপ অন্তরে দেখবে আর তাঁর সিদ্ধিলাভ করার সাক্ষ্য দেবে – জগতে মনুষ্যজাতির দরবারে।

বেদের এই সব মহাবাক্যের বাস্তবরূপ আমরা দিনের পর দিন দেখছি আর শুনছি। মনুষ্যজাতির এই অন্তর্নিহিত সত্যের বাস্তব রূপ হলো সিদ্ধ হওয়া বা সিদ্ধিলাভ – ঠাকুরের – "ভগবান লাভ"। তিনি নিজে জানতেন না– তাই এ কথার ব্যাখ্যা কোথাও দেননি। অনুভূতি না হ'লে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

সিদ্ধিলাভ করা অর্থাৎ প্রেমের দ্বারা এই আত্মিক একত্ব স্থাপন করা –

"To formulate a harmonious religious creed, to make all religions come together in love."– Swami Vivekananda.

"তাঁকে স্বপ্নে, ধ্যানে, জাগ্রত অবস্থায়, Trance-এ দেখে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। তাঁকে দেখে হিন্দু, দেখে মুসলমান, দেখে খ্রীষ্টান, দেখে পার্শী, দেখে ভারতবাসী আবার বিদেশী।" (দ্রষ্টব্য- নিবেদন)

বিশ্বপ্রেম মুখের ফাঁকা আওয়াজ নয়। এই বহুত্বে আত্মিক একত্বই বিশ্বপ্রেমের প্রমাণ আর বিজয় পতাকা – তথা- সিদ্ধ আর সিদ্ধিলাভ।

বেদ এই পুরুষটিকে বলছে "স উত্তমঃ পুরুষঃ।"

৭০৩। **"সিদ্ধি কি না বস্তুলাভ"।**

ব্যষ্টি বস্তু – আত্মা। আত্মা সংকলিত হওয়া আর সাক্ষাৎকার করা।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্যষ্টির এই ব্যাখ্যা ব্যষ্টিতে আবদ্ধ।

" স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" না হ'লে কিছুই হ'লো না।

৭০৪। **"অহংকারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।"**

ব্যষ্টি 'সুতোয় একটি রোঁয়া থাকলে ছুঁচের ভিতর যায় না'। – আদ্যাশক্তি দেহ থেকে মুক্ত হয় না – আত্মারূপে পরিবর্তিত হতে পারে না। দেহের একটি তন্তুও যদি

ক্ষতিগ্রস্ত হয় – তা হ'লে আর ষোল আনা আত্মা সংকলিত হয় না।

"কালো পাঁঠা মায়ের বলিতে লাগে কিন্তু পাঁঠায় যদি একটু ঘা থাকে আর বলি হয় না।"

বিশ্বব্যাপিত্ব "আমি অবতার" – "মুই সেই"

এর চেয়ে দীর্ঘ অহংকারের নিশান – ঝাণ্ডা – আর কিছুই নেই।

অহংকার নাশের প্রকৃত রূপ – বেদে নির্দেশিত এই একত্ব – "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" – চিন্তা নয় – " তোমরা ভাব" নয়, অনুমান নয় – বাস্তব – মানুষের জীবনে ফলে।

অহংকার প্রকাশ করবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই – এই-ই হ'লো স্বতঃপ্রমাণিত (Self evident) অহংকার নাশ।

৭০৫। **"সাধক"**

ব্যষ্টি প্রাণময় কোষ, জ্যোতিদর্শন, অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন, দ্বিদল পদ্ম, জ্ঞানচক্ষু, রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন, পর্দার আড়ালে সূর্য দর্শন ইত্যাদি। এই অবস্থায় সাধক।

৭০৬। **"সিদ্ধ"**

ব্যষ্টি সিদ্ধ দুইরকম, তন্ত্রমতে সিদ্ধ আর বেদমতে সিদ্ধ।

তন্ত্রমতে সিদ্ধ – সচ্চিদানন্দগুরু ইষ্ট দর্শন করিয়ে ইষ্টে লীন হয়ে যান। বেদমতে সিদ্ধ – সচ্চিদানন্দগুরু আত্মা-সাক্ষাৎকার করিয়ে আত্মায় মিলিয়ে যান। মিলিয়ে যাওয়ার অর্থ – তিনি জানান, আত্মাই সচ্চিদানন্দগুরুর রূপ ধারণ ক'রে আসেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব "স্বচ্ছন্দ দর্শন" – সদ্যমুক্তি (কাশ্মীরী শৈববাদ) – একত্ব।

৭০৭। **"সিদ্ধের সিদ্ধ"**

ব্যষ্টি বিজ্ঞানীর অবস্থা, বিশ্বরূপ দর্শন থেকে বিজ্ঞানীর অবস্থা আরম্ভ – আর "মানুষ-রতন" হওয়া, পরে লীলা থেকে নিত্য ও নিত্য থেকে লীলা পর্যন্ত।

৭০৮। **"কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস"**

ব্যষ্টি দেহেতে আত্মা আছেন আর সেই আত্মা সাক্ষাৎকার হওয়া।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে "বিশ্বাসের" স্থান নেই।

বিশ্বাস – Self hypnotism.

৭০৯। **"আর কাঠ থেকে আগুন বের ক'রে ভাত রেঁধে, খেয়ে"**

ব্যষ্টি আগুন – আত্মা। বেদান্তের বা আত্মার সাধন – বিশ্বরূপ, বীজ, স্বপ্নবৎ আর, 'জড় সমাধি' – সচ্চিদানন্দসাগর দর্শন ও স্পর্শন – দেহেতে "শুক" – সচ্চিদানন্দগুরু জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই। তবে তিনি ষোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু – তবে "শুক"।

৭১০। “শান্তি আর তৃপ্তি লাভ করা।”

ব্যষ্টি অবতারতত্ত্ব ও লীলা থেকে নিত্য।

অবতারতত্ত্ব – প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান – তারপর ঋষি বা পুরাণপুরুষ দর্শন, চৈতন্য সাক্ষাৎকার, চৈতন্যের অবতরণ প্রথমে কণ্ঠপর্যন্ত,পরে কটিদেশ পর্যন্ত আর তারপর “মানুষ-রতন” বা অবতীর্ণ মূর্তি।

লীলা থেকে নিত্য – অন্ধকার – অন্ধকার ভেদ করে অপূর্ব ঐশ্বর্যময়ী নারীমূর্তি। তিনি কথা কন, কথা বেশ আবদার মিশ্রিত, দ্রষ্টা তাঁকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন – আর সেখানে জ্ঞানের মূর্তি দর্শন ও বিদ্যুৎ রেখা দর্শন ও পরে লীন।

স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় – লীলা থেকে নিত্য।

৭১১। “তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।”

ব্যষ্টি লীলা থেকে নিত্য ও নিত্য থেকে লীলা

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে এই একত্বই সীমা।

– কামচার।

‘কামচার’ কথাটি Aryan Language, সংস্কৃত নয়।

বৈদিক ঋষিরা এই কথাটি ব্যবহার করেছেন – তাৎপর্য পরিস্ফুট নয়। পরবর্তী আচার্যেরা শঙ্কর, রামানুজ ইত্যাদি কামচার কথা ব্যবহার করেছেন কিন্তু অর্থ দেননি। একমাত্র আনন্দগিরি অর্থ করেছেন – ‘স্বতন্ত্র’। একথারও অর্থ নেই। চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুকে ‘স্বতন্ত্র’ ঈশ্বর ব’লে উল্লেখ আছে – আনন্দগিরির ব্যাখ্যা ঢুকিয়ে দিয়েছে – তাজ্জব আচার্য! দুটিই অর্থহীন।

Max Mueller-এর মতে কতকগুলি আর্যভাষার কথা বেদে আছে–তাদের ঠিক অর্থ পাওয়া যায় না।

অনুভূতিমূলক অর্থ – যা আমি পেয়েছি –

“সর্বভূতস্থং আত্মানং, সর্বভূতানি চ আত্মনি” – কাশ্মীরী শৈববাদে যাকে বলছে, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ‘সদ্‌বিদ্যা’ বা “সদ্‌আখ্যা” তত্ত্ব।

৭১২। “মিছরির রুটি সিধে ক’রে খাও, আর আড় ক’রে খাও, মিষ্টি লাগবে।”

ব্যষ্টি মিছরির রুটি – সহস্রার। সহস্রারে গেলে তবে সমাধি – ব্রহ্মানন্দ। সমাধি ভেদে এই আনন্দের তারতম্য আছে।

৭১৩। “কিন্তু দৃঢ় হ’তে হবে।”

ব্যষ্টি মন দেহেতে আবদ্ধ হয়ে থাকবে – যোগীর দৃষ্টি অন্তরে আবদ্ধ।

৭১৪। **"ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকতে হবে।"**

ব্যষ্টি কুণ্ডলিনী জাগরণ ও হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হওয়া।

৭১৫। **"ডুব দাও"।**

ব্যষ্টি সহস্রারে তলিয়ে যাও।

৭১৬। **"ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না।"**

ব্যষ্টি নিগমের অনুভূতিসমূহ হয় না।

৭১৭। **"জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।"**

ব্যষ্টি সহস্রারে দ্বৈতজ্ঞানের বিলাস, সমাধি, ব্রহ্মানন্দ।

৭১৮। **"হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ, বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ; চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, সব করিয়াছ, এসব কথায় আমাদের অত কাজ কি?"**

ব্যষ্টি তোমাদের ভগবান হায়, হায় দূরে — তোমরা অধম শ্রেণীর ভক্ত। মন বাইরে ছড়িয়ে রয়েছে। ভগবান তোমাদের অন্তরে। বাগানের মালিক "বাবুকে" অন্তরে খুঁজতে হয়। — "সব সন্তানকো পাশ মোঁ।"

৭১৯। **"তাঁকে দর্শন হয়"**

ব্যষ্টি সাকার ও নিরাকার রূপ দর্শন।

৭২০। **"তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়"**

ব্যষ্টি বিজ্ঞানীর অবস্থা। তিনি কি যতদূর তিনি জানান — ততটা জানতে পারা যায় — জীবন মৃত্যুর রহস্যভেদ — মায়ার রহস্যভেদ, অবতারতত্ত্ব ইত্যাদি।

৭২১। **"একথা কারেই বা ব'লছি, কে বা বিশ্বাস করে!"**

ব্যষ্টি চিত্তশুদ্ধি না হ'লে এসব কথা ধারণা হয় না।

৭২২। **"হৃদ্দ 'অস্তি' মাত্র বোধ হয়।"**

ব্যষ্টি শুষ্কজ্ঞান।

কাশীতে মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে যেমন দেখেছিলেন।

৭২৩। **"কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন হবে।"**

ব্যষ্টি কৃপার আরম্ভ — সচ্চিদানন্দগুরু লাভ। সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় কুণ্ডলিনী জাগরণ — নানারকম আত্মিক স্ফুরণ ও শেষে আত্মার কৃপায় আত্মার দর্শন।

৭২৪। **"তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।"**

ব্যষ্টি সাকার রূপে কথা কন আবার নিরাকার রূপেও কথা কন। একজন ভক্ত চারবছর আগে স্বপ্নে দেখেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "হবে, হবে, তোর হবে।"

চার বছর পরে, কথামৃত পড়া হ'চ্ছে। সামনে ঠাকুরের ছবি। ভক্তটি মনে ভাবছেন — ঠাকুর বলেছিলেন, "হবে'। কি হ'লো?" অমনি তাঁর মাথায় ধ্বনি বেরোল

– "এই তো হ'চ্ছে – আর কি হবে"? অবশ্য এই ভক্তটি এর আগে বহুবিধ অনুভূতি করেছিলেন। স্বপ্নে জ্যোতিদর্শন করে সমাধি ও অবতারত্ব পর্যন্ত।

সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মসেসের সঙ্গে যেরকম লীলা ক'রেছিলেন, আজও ঠিক তাই – তবে, জগতের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান লোক এই লীলার আস্বাদন পান।

৭২৫। **"ঘড়াটাও টা আর সরাটাও টা"**

ব্যষ্টি আত্মিক শক্তির স্ফুরণের তারতম্য। ঠাকুরের ছবি প্রত্যেক বাড়িতে। হাজরা মহাশয় কোথায়?

বিশ্বব্যাপিত্ব আছে একত্ব – ঘড়াও নেই আর সরাও নেই।

৭২৬। **"যদি শক্তি বিশেষ না হয় লোকে কেশবকে এতো মান্‌তো কেন?"**

ব্যষ্টি "ওগো সে যে দৈবীমানুষ"।

কেশববাবু দৈবীমানুষ – শক্তি বেশী ছিল – তাই মান্‌তো।

বিশ্বব্যাপিত্ব "একোবশী" – "মনের মানুষ" হওয়া চাই – সে জোর ক'রে মানাবে – স্বপ্নে জোর ক'রে ঘাড়ে ধ'রে ধ্যান করাতে বসাচ্ছে।

"তোমাকে প্রমাণ করতে হবে – তুমি মহাত্মা" – রবীন্দ্রনাথ।

" স্বে মহিম্নি" – বেদ বলছে – ঈশ্বর নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

অন্তর্যামীরূপে তিনি প্রতি মানুষে। মানুষের অন্তরে তাই আমার রূপ ফুটে ওঠে। তখন ঘাড়ে ধ'রে মানায়।

৭২৭। **"তোমাদের ত্যাগ কেন ক'রতে হবে।"**

ব্যষ্টি ভগবান তোমাদের সংসারে রেখেছেন – তোমরা সংসারে থেকেই ভগবানকে ডাক। সংসারে রাখা বা সমস্ত ত্যাগ করান – সে তাঁর ইচ্ছা।

বিশ্বব্যাপিত্ব এই একত্বে বা ব্রহ্মত্বে – "ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম"।

সত্যাশ্রয়ী ঠাকুর সত্য বলছেন – অবতার ব্যষ্টিতে আবদ্ধ – "আমার অতদূর হয় নাই" – সত্যেই একত্ব তাঁর হয়নি।

৭২৮। **"তাই এখন তর্ তর্ ক'রে লিখতে পারে।"**

ব্যষ্টি তর্ তর্ ক'রে কুণ্ডলিনী সহস্রারে যায় আর মুহুর্মুহু সমাধি।

৭২৯। **" রোগটি হচ্ছে বিকার"।**

ব্যষ্টি "আমি" রূপ বিকার।

৭৩০। **"আচার তেঁতুল"**

ব্যষ্টি কামিনী।

৭৩১। **"নীরোগ হ'য়ে"**

ব্যষ্টি তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে – "আমি-না, তুমি"।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে নীরোগ হয়।

সবই আমি।

"আমি" রূপ ভবব্যাধি ("Piggish ego") দূর হয়েছে — "নিরদ্বন্দ্ব"।

৭৩২। "ঈশ্বরের পাদপদ্মে"

ব্যষ্টি ষষ্ঠভূমিতে। পাদপদ্ম দেখতে পাওয়া যায়।

৭৩৩। "আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর-টীশ্বর সব ঘুরে যাবে।"

ব্যষ্টি অন্নচিন্তা করতে হ'লে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না।

বিশ্বব্যাপিত্ব অভাব বিশ্বব্যাপিত্বের গতি রুদ্ধ করে না। একত্ব স্বভাবসিদ্ধ, আপনা হ'তে হয়।

৭৩৪। "জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ — জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে ছিলেন।"

ব্যষ্টি আত্মাসাক্ষাৎকারের পর, — এ কিন্তু আধখানা। পূর্ণ — শুকদেব — ব্রহ্মর্ষি।

বিশ্বব্যাপিত্ব পুরাণের এই কাল্পনিক আদর্শবাদের Heroes — এঁদের সৃষ্টি ক'রে পুরাণকারেরা যে আদর্শবাদ স্থাপন করতে চেষ্টা ক'রেছে — সে স্বভাবজাত শিব সুন্দরের (একত্বের — 'শিব ঐক্যস্থাপনে') জ্ঞান নয়।

জ্ঞান বিশ্বব্যাপিত্বে — "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" — আর "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।"

৭৩৫। "একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের"

ব্যষ্টি আধখানা। আত্মার সাধনের সামান্য অংশমাত্র।

বিশ্বব্যাপিত্ব স্থান নাই "আধখানার" — একত্বের জগতে। সেই পুরাতন গল্প — "কানাদের হাতি দেখা।"

৭৩৬। " নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।"

ব্যষ্টি তোমরা শুধু ডেকে যাও — বিচার ক'রো না।

বিশ্বব্যাপিত্ব "নাম"-ও নেই আর "বিশ্বাস"-ও নেই। ব্রহ্মপুর থেকে লোক আসা চাই-ই চাই (Indispensable, Peremptory) তা নইলে ব্যষ্টির সাধন হয় না।

একত্ব সুদূর দুরাশা রাজ্যের একটা কষ্টকর কল্পনা।

"তিরিশ বছর মালা জপ করে তবু কিছু হয় না কেন ?"

৭৩৭। "তাঁকে আমমোক্তারি দাও।"

ব্যষ্টি অহংনাশ না হলে আমমোক্তারি দেওয়া যায় না।

পূর্ণ আমমোক্তারি তত্ত্বজ্ঞানে — "তুমি, তুমি"।

বিশ্বব্যাপিত্ব "আমমোক্তারি" দিতে হয় না — এটা আদালত নয়! তিনি নিজে

যদি দেহীকে ধারণ করেন তবেই ‘‘আমমোক্তারি’’ – ‘‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।’’

ব্রহ্মপুর থেকে দেহেতে অজানা লোকের আবির্ভাব – আর তিনি ব্রহ্মপুরে নিয়ে যাবেন – এ সমস্ত ঘটে, দেখতে পাওয়া যায় – সত্য।

গিরিশবাবুর আনুমানিক আর কাল্পনিক ‘‘আমমোক্তারি’’ নয়।

৭৩৮। **‘‘বিড়াল ছানার পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই’’**

ব্যষ্টি বিদ্বৎ – আপনা হতে হয়।

বিশ্বব্যাপিত্ব প্রকৃত বিদ্বৎ – একত্ব। মনুষ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ – সনাতন ধর্ম। বেদ মুক্তকণ্ঠ – ‘ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।’

৭৩৯। **‘‘মা মা করে’’**

ব্যষ্টি নিত্যসিদ্ধ।

৭৪০। **‘‘যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মারা যায়, তখন ‘অছি’ সেই নাবালকের ভার লয়।’’**

ব্যষ্টি জমিদার – আমি – অহং। নাবালক ছেলে – বালকবৎ – পরমহংস অবস্থা। এই স্থূল ‘আমি’ যখন ‘বালকবৎ’ আমিতে পরিবর্তিত হয়।

‘অছি’ – ভগবান। যত আমার আমি কমছে তত দেহেতে ‘‘তিনি’’ প্রকাশ পাচ্ছেন। দেখতে পাওয়া যায় – পুরাণ পুরুষ শিশুকে হাতে ধরে নিয়ে চলেছে।

৭৪১। **‘‘তুমি তো সারে-মাতে আছো।’’**

ব্যষ্টি এক আনা, দু আনা, চার আনা।

৭৪২। **‘‘অবশ্য হবে।’’**

ব্যষ্টি তিনি যতটুকু কৃপা করবেন ততটুকু।

৭৪৩। **‘‘তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীরে রোমাঞ্চ হবে, আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে পড়বে।’’**

ব্যষ্টি ‘রোমাঞ্চ’ আর ‘ধারা’ – যৌগিক বিভূতি। শ্রবণমাত্র দেহে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ। রোমাঞ্চ আর পুলক, অংশ মাত্র। ‘‘যখন একবার ওঁ বল্‌লে বা শুন্‌লে সমাধি হয়ে যাবে, তখন জানবি পাকা।’’

বিশ্বব্যাপিত্ব ‘‘পাকার’’ প্রমাণ – একত্ব।

তা নইলে এ ‘‘ফাঁকা’’ শঙ্খধ্বনি – দেহ মন্দিরে মাধব চাই। মাধব – এক – ‘‘স একঃ’’।

৭৪৪। **‘‘আর দেহবুদ্ধি কমে’’**

ব্যষ্টি কাম চলে যায়।

৭৪৫। **‘‘দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটু ঘষলেই দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে।’’**

ব্যষ্টি ব্রহ্মজ্ঞানের পর চৈতন্য সাক্ষাৎকার। চৈতন্য দপ্ করে সহস্রারে জ্বলে ওঠে, দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্য সাক্ষাৎকার হলে, তবে দেহ বিষয় রস শূন্য হয়।

৭৪৬। **"বিষয় রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।"**

ব্যষ্টি বিষয় রস শুকানোর তারতম্য আছে – এখানে চিত্তশুদ্ধি – দেহতত্ত্বে উদ্দীপনার লক্ষণ –"বায়ু গরগর করে উপর দিকে উঠতে থাকে।"

৭৪৭। **"আপনার মা"**

ব্যষ্টি তোমার দেহেতে আছেন – তাই আপনার।

৭৪৮। **"চাবি নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়।"**

ব্যষ্টি মহামায়া কৃপা করে দ্বার খুলে দিলে তবে সপ্তমভূমিতে প্রবেশ ও ব্রহ্মজ্ঞান। একজন ভক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন - "তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু তাঁকে একটা পয়সা দিচ্ছেন।"

৭৪৯। **"তিনি যে বড় আপনার লোক"**

ব্যষ্টি তুমি তাঁকে অন্তরে নিয়ে বেড়াচ্ছ – "ওহি রাম সব্‌সে নিয়ারা"।

৭৫০। **"এই অহংকার আড়াল আছে বলে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না।"**

ব্যষ্টি রেশমের পর্দার আড়ালে সূর্য – সপ্তমভূমির দ্বারে। এই প্রথম অবস্থা। পরে সহস্রারের পর্দা গুড়িয়ে (গুটিয়ে) গেলে - তবে পূর্ণ অহংকারের নাশ হয় আর পূর্ণ সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়। আত্মার সাধনের পর এই দর্শন। এই হলো ষোল আনা সচ্চিদানন্দ দর্শন।

৭৫১। **"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল"**

ব্যষ্টি ব্রহ্মজ্ঞানে 'স্থিত সমাধিতে' লয় হওয়া। তা নইলে 'জড়' সমাধির পর তত্ত্বজ্ঞানে ফিরে আসা। 'আমি' জঞ্জাল মরে গেছে। এখন শুধু 'তুমি, তুমি'।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বেই Universal Ego.

"অহং" – ক্ষুদ্র আমি (Piggish Ego - 'বজ্জাত আমি') – একত্বে নাশ।

'অহং ব্রহ্মাস্মি'র স্ফুরণ – "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" – "বিভু (পরমাত্মা) রূপে তিনি সর্বভূতে এক হয়ে আছেন" অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্যজাতিই "আমি"। কল্পনা নয় – মনুষ্যজাতি অন্তরে দেখে প্রমাণ দিচ্ছে।

নামরূপ বাইরের জিনিস – আত্মিক জগতে এক – একটি জীবন্ত মানুষের চিদ্-ঘন-কায় রূপ — "পরমব্রহ্ম" – "পরমাত্মা" –"পরমেশ্বর" – "সূর্যমন্ডলের সুবর্ণময় পুরুষ" – মনুষ্যজাতি অন্তরে দেখে এই বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

৭৫২। **"ভরত রাজা হরিণ হরিণ করে দেহত্যাগ করেছিল, হরিণ জন্ম হলো।"**

ব্যষ্টি ভরত রাজার মন বাইরে – জগতে – হরিণে।

"মনেই জগৎ" – ভরত রাজার মন হরিণে। মন হরিণের রূপ ধারণ করলো। ভরত রাজার দেহ টুটে গেলে – ভরত রাজার মন হরিণের রূপ ধারণ করলো – সূক্ষ্ম ভাবে। ভরত রাজার সূক্ষ্ম হরিণ জন্ম হলো। এর পর স্থূল হরিণ জন্ম হলো।

মা ঠাকুরকে দেখিয়ে দিলেন – ঠাকুরের শুদ্ধ সত্ত্বগুণী ভক্ত আছে। কুঠির ছাদে ঠাকুর চেঁচিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন – "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ – আয়।"

ভক্তদের ডাকছেন। অন্তরঙ্গ ভক্তরা কিন্তু এল কুড়ি একুশ বছর পরে। ঠাকুরের কান্নায় ও ডাকে ভক্তদের সূক্ষ্মভাবে জন্ম হলো – তারপর তাদের ঠাকুরের সঙ্গে মিলন – কুড়ি একুশ বছর পরে। সাধন অবস্থায় – আত্মিক স্ফুরণের সময় কেউ কেউ পূর্বজন্ম দেখতে পায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব "ভরত রাজার হরিণ জন্ম" অপূর্ব, অবাস্তব, পৌরাণিক কাহিনী ।

এই পূর্বজন্ম– প্রমাণহীন। পরজন্ম –এখনও প্রমাণের অভাব।

"ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি" – ঐতরেয় উপনিষদ। "তোমার নিজের অনুভূতির কথা বলবে তবেই সত্য বলা হবে।" – স্বামী বিবেকানন্দ।

এ পর্যন্ত কে পূর্বজন্মের কোন কথা বা সংবাদ মনুষ্যজাতিকে দিয়েছে? শুধু বিশ্বাস – ব্যস, খালাস! বিশ্বাসের মূল্য নেই। ধর্ম অনুভূতিমূলক। এই পূর্বজন্ম থেকে শ্রাদ্ধের উৎপত্তি।

"শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না" – ঠাকুর।

"কারোর কারোর শ্রাদ্ধ শেষে ইষ্টের পূজা হয়ে দাঁড়ায়" – ঠাকুর।

"বৈষ্ণবদের শ্রাদ্ধ নাই – তারা মহোৎসব করে" – ঠাকুর।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী "শ্রাদ্ধের" আদ্যশ্রাদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁর 'সত্যার্থ প্রকাশ' নামে বই-এ।

ঋগ্বেদে শ্রাদ্ধ নেই। শ্রাদ্ধ বৈদিক নয়।

স্বামীজীর জীবনে লাহোরে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে একটা কথা।

হিন্দুধর্মের বিজয়ী বীর স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে।

দুই দল – আর্য সমাজী ও সনাতনী – সমানভাবে দুই দলই আদর অভ্যর্থনা, সম্মান করলো স্বামীজীকে।

সনাতনীরা স্বামীজীকে বলল – "পাঞ্জাব থেকে আর্য সমাজীরা শ্রাদ্ধ উঠিয়ে দিয়েছে – আপনি শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

স্বামীজী উপরোধ না এড়াতে পেরে লাহোরের এক বক্তৃতায় বললেন

"অথর্ববেদে শ্রাদ্ধের কথা আছে, তোমরা যা হয় একটু কোরো।"

সহস্র সহস্র বৎসর এই প্রেতের পূজো করিয়ে – জগতের দরবারে ভারতবাসীকে প্রেত করে রেখেছে।

জন্ম হতে আরম্ভ করে আর মৃত্যুর পরেও চলেছে সগৌরবে তার নিজেরই শ্রাদ্ধ! ভারতবাসী যেন জগতে এসেছে তার একটি মাত্র কাজ নিয়ে – শ্রাদ্ধ! যা সর্বৈব মিথ্যা – শুধু ধাপ্পা। মানুষ হও – মিথ্যাকে উচ্ছেদ কর।

বেদ বলছে –

"ইহ চেদবেদীৎ অথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"।

যদি এ জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তবেই জীবনের সার্থকতা – তা নইলে "মহতী বিনষ্টিঃ" – চিরকালের তরে বিনাশ। পরজন্ম নেই, আছে Heredity – line of heritage.

এই Heredity জড়বাদ নয়, Reality – সত্যবাদ।

(এই Heredity -কে বাংলা ভাষায় অনুদিত স্বামীজীর Complete Works -এর দ্বিতীয় খন্ডে 'জড়বাদ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সত্যং বদিষ্যামি' হয়নি)

বেদেই এর প্রমাণ –

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

আত্মা – যে আত্মা সহস্রারে ত্রিপুটি অবস্থায় ব্রহ্মপুর হতে আগত অজানা লোক দেখিয়ে দেয় আর বলে দেয় – সেই আত্মা চিরকালই পূর্ণ। সৌকালীন গোত্রের সৃষ্টিকর্তা সৌকালীন ঋষির দেহেতে যে আত্মা – আজ হাজার হাজার বছর অতীত হয়ে গেছে – তবুও সেই একই আত্মা আমার দেহেতে – ওজন কম বেশী হবে না।

সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণই এসেছে – আর চিরকাল আসবে।

সেই একই আত্মা বিভিন্ন নাম, রূপ, ধারণ করে আমার বৃদ্ধ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধ প্রপিতামহের দেহেতে ছিল আর আমার দেহেতে সেই আত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে।

আত্মা এক। "স একঃ", আর আত্মার অমরত্বের প্রমাণ এতেই প্রতিষ্ঠিত।

স্বামীজী আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে লেকচার দিয়েছেন, "Immortality of the soul" – কিন্তু তিনি কিছুই প্রমাণ দিতে পারেন নি। অথচ আত্মার অমরত্বের প্রমাণ বেদের এই শ্লোকেই আছে।

আত্মাসাক্ষাৎকারের মন নিয়ে যোগদৃষ্টি সহায়ে এই শ্লোক পড়লেই আত্মার অমরত্বের স্বভাবসুন্দর গৌরবে চক্ষু অমিয় তৃপ্তি লাভ করে সুধাসিক্ত হয়।

একা স্বামীজী আত্মার অমরত্বের প্রমাণ দিতে পারেন নি যে তা নয়, অতীত ভারতের কোন আচার্য বা অবতার বা পরমহংসের দল কিম্বা ভাষ্যকারেরা এই শ্লোকের মর্মার্থ প্রকাশ করতে পারেন নি। Max Mueller প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও এ বিষয়ে নীরব। এদের কাছে – এটি একটি Hypothesis। হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামীজী বলছেন "All Religions are hypothesis"

জগতের দরবারে এই মহান সত্য পেশ করা হলো। জগৎ দেখুন, বুঝুন, আর বলুন "Religions are not hypothesis"। নিজের সহস্রারে যে আত্মার সাক্ষাৎকার হয় – সে ব্যষ্টির আত্মা – Individual Self–"পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য"। এই ব্যষ্টির আত্মা তোমার সাক্ষাৎকার হয়েছে – তার প্রমাণ দেবে – "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" – অসংখ্য নরনারী তোমায় তাদের দেহের ভিতর দেখবে আর বলবে, – এই হ'লো Universal Self।

ব্যষ্টিতে আত্মাসাক্ষাৎকারের মর্মার্থ প্রকাশ পায় না, বিশ্বব্যাপিত্বে এর প্রকাশ।

আত্মা এক – যা বৈদিক ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে সহস্র সহস্র বৎসর আগে অতীতের কোন এক শুভমুহূর্তে ঘোষণা ক'রে গেছে – আজ সেই বেদার্থের প্রমাণ সমেত উদ্ধার।

৭৫৩। "ঈশ্বর চিন্তা ক'রে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।"

ব্যষ্টি ঈশ্বর চিন্তা হয় সহস্রারে। মন সহস্রারে গেলে সমাধিস্থ হয়। সমাধি অবস্থায় দেহ টুটে গেলে আর জন্মাতে হয় না।

বিশ্বব্যাপিত্ব মৃত্যুকালে কিম্বা মৃত্যুর পর মুক্তি – এর চেয়ে বড় "ধাপ্পা" (Sophistry) – লোকঠকানো কথা আর কিছু হ'তে পারে না!

ধর্মের প্রমাণ আছে। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

বিশ্বব্যাপিত্বই এর প্রমাণ – আর হয় জীবদ্দশায়। মৃত্যুকালে কিংবা মৃত্যুর পরে নয়।

সংখ্যাতীত নরনারী আমায় না দেখে, আমার কথা না শুনে অর্থাৎ সম্পূর্ণ "অজ্ঞাত আমি"– তাদের অন্তরে ফুটে উঠেছি। আর আমার মা জননীরা আমার কাছে না এসে ঘরে বসে নিজেদের অন্তরে দেখে (সদ্যমুক্তি – স্বচ্ছন্দদর্শন – কাশ্মীরী শৈববাদ) – আমার ও তাদের উভয়েরই জীবন্মুক্তি বা বহুত্বে একত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত করছেন ও প্রমাণ দিচ্ছেন।

এই জীবনেই জীবন্মুক্ত – মৃত্যুর পর নয়। মৃত্যু – "মহতী বিনাশ"।

৭৫৪। "তবে হাতিকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, আর ধূলা

কাদা মাখতে পারে না।"

ব্যষ্টি মন সহস্রারে গিয়ে যদি অবস্থান করে তা হলে পতনের ভয় নেই। একুশ দিনের মধ্যে মহাকারণে লয় হয়।

বিশ্বব্যাপিত্ব এই মৃত্যুর – মহাকারণে লয় হওয়ার – বিভীষিকা সামনে রেখে – অর্থাৎ মরবার জন্য কেউ সাধন করে কি ?

শ্রীবুদ্ধের সেই আড়াই হাজার বছরের অতি পুরাতন বেফাঁস কথা – "নির্বাণ"।

মরবার জন্য – একুশ দিনের মধ্যে – কে সাধন করবে আর ধর্ম প্রার্থনা করবে ?

হ'ল Cerebral Thrombosis – চোখ লাল টকটক করছে, নাকের গোড়ায় রক্তের দাগ – বলে কিনা স্থিত সমাধি – ইচ্ছামৃত্যু !

তারা যে এ নিত্য দেখে (Experience) – প্রত্যহ সকালে বিকালে তাদের ঠাকুরদাদা মহাশয়দের হতো নিত্যনৈমিত্তিক !

সব ফাঁকিবাজ – শুধু মানুষ ঠকানোর কারবার।

ঋষিদের প্রার্থনা হলো – "মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

এই বিশ্বব্যাপী আত্মিক একত্বই মুক্তি বা ব্রহ্মত্ব বা অমরত্ব।

"তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী"। দ্বন্দ্বহীন – অতএব শান্তি।

৭৫৫। **" যেই তুমি গঙ্গাস্নান ক'রে তীরে উঠেছ অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে।"**

ব্যষ্টি ঠাকুরের ঘরে কেউ গিয়েছেন। ঠাকুরকে দর্শন ক'রে, ঠাকুরের অমৃতময়ী বাণী শুনে, তার মন শান্ত হ'লো, উদ্দীপনা এলো – তাঁর গঙ্গাস্নান হ'য়ে গেল। তিনি ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন – সংসারে। তাঁর আগেকার সংস্কার আবার জেগে উঠলো – "পাপগুলো ঘাড়ে চেপে বসলো।" কাঁচাবেলার মনের অবস্থা – "ওঠা নামা।"

৭৫৬। **"ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে।"**

ব্যষ্টি সারাজীবন তাঁকে ডেকে যেতে হবে – তবে শেষের দিনে মনে পড়া। মিছরির পানার আস্বাদন পেলে আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না। ভগবান – মিছরির পানা – একবার আস্বাদন পেলে আর ছাড়া যায় না। ব্রহ্মবিদ্যা একবার লাভ হ'লে ব্রহ্মবিদ্যা তাকে কখনও ত্যাগ করে না। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞানের পর – ভক্তি ও ভক্ত নিয়ে থাকে অর্থাৎ ভগবানের নাম করে সারাজীবন। যেমন, ঠাকুর আর মহাপ্রভু।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তিও থাকে না, ভক্তও থাকে না, – সোনার

পাথর বাটি হয় না রে বাবা।

থাকে "Life Divine" – এই আত্মিক একত্বই "Life Divine"। ফাঁকা আঁফসাল-ঝাঁপসাল ঝাড়লে কি হবে!

৭৫৭। **"কি এলোমেলো বকলুম।"**

ব্যষ্টি এ ধারাবাহিক ভাগবত কথা নয় – জ্ঞানভক্তির উপদেশ মাত্র। তোমাদের ধারাবাহিক বেদের পঞ্চকোষের সাধন হবে না। তাই ভগবান শুধু ভক্তি বিশ্বাসের কথা বললেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব নিজেকে ঠকাচ্ছেন – আবার জগৎকেও ঠকাচ্ছেন। একত্ব সকলকার জন্য।

৭৫৮। **"বিদ্যার পার হতে হবে।"**

ব্যষ্টি যতক্ষণ অনুভূতি – ততক্ষণ বিদ্যামায়ার অন্তর্গত। বিদ্যার পার – পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান – "অজ" – তাও বলবার যো নেই, – যা তাই।

বিশ্বব্যাপিত্ব "Supra-mental state"- Sophistry of the highest altitude – আর কোনও টুঁ শব্দ চলবে না! ফাঁকা আওয়াজ।

একত্বে বিদ্যা বা অবিদ্যা কিছুই নেই।

এমন কি "সমস্তই বিদ্যা" – এ কথাও বলবার জো নেই।

৭৫৯। **"সত্ত্বগুণী ভক্ত পায়স দেয়।"**

ব্যষ্টি সহস্রার।

৭৬০। **"রজোগুণী ভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়।"**

ব্যষ্টি অফুরন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট। আগমের লীলা।

৭৬১। **"তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।"**

ব্যষ্টি ছাগ – কাম – দেহ। দেহ ছাড়া আরও কিছু আছে ষষ্ঠভূমির অনুভূতি, – ইষ্ট সাক্ষাৎকার।

৭৬২। **"নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।"**

ব্যষ্টি জায়গা – সহস্রার। বৃষ্টি – কৃপাবৃষ্টি। সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় কুণ্ডলিনীর জাগরণ। হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ভেদ ক'রে কুণ্ডলিনী সহস্রারে এসে নৃত্য করেন।

"কমলে কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।"

নৃত্যে নীচু জায়গা সৃষ্টি হয় সহস্রারে। সেই নীচু জায়গায় আত্মা সংকলিত হয়।

জল – সচ্চিদানন্দ – আত্মা।

৭৬৩। **"গুরু, বাবা ও কর্তা এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে।**

ব্যষ্টি অহংকার হয় – গুরু, বাবা ও কর্তা এই তিন কথায়। তাই দেহেতে যন্ত্রণা হয়।

বাপে ধরেছে। কথায় মলিনতা স্পর্শ করে। পাছে এই অহংকারের কথায় কোনও রকম অহংকারের সৃষ্টি করে, তাই দেহের মধ্যে সজাগ ভগবান জানিয়ে দেন, কাঁটা বিঁধিয়ে, – না, না, ওসব নয়। দেহ, মন, আত্মা ওসব কথা গ্রহণ করে না, ঝেড়ে ফেলে দেয় – প্রত্যাহার। গ্রহণ করলে দেবত্বের হানি হয় – জীবত্বের প্রকাশ পায়। এই হলো প্রত্যাহারের যৌগিক বিভূতি। ঠাকুরের দেহে এই বিভূতি সর্বক্ষণ প্রকাশ পেত। মেয়েছেলের কাছে সমাধিস্থ, টাকা ছুঁলে হাত বাঁকা, ধাতু স্পর্শে যন্ত্রণা ইত্যাদি। গুরু, বাবা, কর্তা – দেহের তিনটি স্তর।

গুরু—নির্গুণ ব্রহ্ম—যিনি অলক্ষ্যে নির্লিপ্তভাবে দেহকে ধারণ ক'রে রেখেছেন। দেখবার যো নেই, ছোঁবার যো নেই – আর ধরবার যো নেই – অথচ তিনি আছেন। যখনই তিনি দেহ ছেড়ে দেবেন, তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দেহকে শুইয়ে দেবে – দেহ তাঁর অভাবে মরে গেল। তাই ভগবানই গুরু।

বাবা – আমি দেহ থেকে অন্যমূর্তি ধারণ করেছি – তার জীবন্ত প্রমাণ – আমি আর আমার ভেতরে নাই – আমি বাইরে। আমার সৃষ্টি আমার ছেলে, আমার আমিত্ব – আমার দেহ ভেদ ক'রে – বাইরে আমি, 'আমি আমি' – ' হাম্বা হাম্বা' । ঠিক এর বিপরীত হ'লো তত্ত্বজ্ঞান। কামের উল্টো রাম। রামের উল্টো কাম।

কর্তা – মায়ার খেলায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সাজা। আমি কর্তা এই অভিমান। আমি – এই ছেলে মেয়ে, বাড়ি ঘর, জগতে এই ভোগের ইন্ধন সব আহরণ করেছি – আমি শ্রেষ্ঠ।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বে গুরু, বাবা, কর্তার স্থান নেই।

৭৬৪। "এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই।"

ব্যষ্টি আত্মা যাঁকে বরণ করেন তাঁরই হয় – এটি ঋষিদের দান ও বাণী। আত্মা কোথায়?

অদ্বৈতবাদে 'তুমিই আত্মা'।

দ্বৈতবাদে – 'তুমি ও আত্মা।'

আগে 'তুমি ও আত্মা' না হ'লে 'তুমিই আত্মা' হয় না। তা হলে 'তুমি ও আত্মা'।

এই আত্মা তোমার ভেতরে না আকাশে?

আত্মাসাক্ষাৎকার হবে তারপর ঈশ্বরীয় মূর্তি দেহ থেকে বেরোবে, আবার দেহেতে প্রবেশ করবে – তুমি দেখবে তবে ঠিক বুঝবে – আত্মা দেহে, – ভগবান দেহে। এলো কোথা থেকে? আগে ত' দেখিনি, আর জানতুমও না। দেহ থেকে উঠেছে – এ যে দেখেছি। দেহেতে ছিল কোথায়? সেই যে একজন অজানা লোক দেহেতে

দেখেছিলাম – তিনি অষ্টাঙ্গ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন – তিনি স্বপ্নে, জাগ্রত অবস্থায় ও সুষুপ্তিতে কত রকম দেখিয়েছেন, শুনিয়েছেন, শিখিয়েছেন, ভগবান দর্শন করিয়েছেন আবার ভগবানে লীন হয়ে গিয়েছেন, – তিনি এলেন কোথা থেকে? তিনি সচ্চিদানন্দগুরু – নির্গুণ ব্রহ্ম ঐ রূপ ধারণ ক'রে দেহেতে প্রকাশ পেয়েছিলেন। তিনিই এ সমস্ত সাধন করেছেন – বিভিন্ন অবস্থায় – বিভিন্ন রকমের অনুভূতি – সে সমস্তই তিনি – গুরুদেহে সাধন – দ্রষ্টামাত্র, দেখেছি। এই হল আত্মার বরণ – তিনি মূর্তি ধারণ করেন – সেই মূর্তিকে বলে সচ্চিদানন্দগুরু। এখানে আভাস মাত্র। বার বছর চার মাসের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

বিশ্বব্যাপিত্ব মানুষের ব্রহ্মত্ব লাভ।

ব্রহ্ম কিসে প্রতিষ্ঠিত?

" স্বে মহিম্নি।"

মানুষের অন্তরে এই মহিমার – সেই ব্রহ্মত্বলাভকারীর রূপ প্রকাশ – অতুলনীয় সত্য।

৭৬৫। **"তিনি বিনা কোন উপায় নাই।"**

ব্যষ্টি এই সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হ'লে আত্মা সংকলিত হয় না – দর্শনের কথা ত' ওঠেই না – সাধনও কিছু হয় না। জগতে যেদিন থেকে 'মানুষ গুরু' সৃষ্টি হ'য়েছে সেদিন থেকেই ধর্মগ্লানি।

ঠাকুর এই সচ্চিদানন্দগুরু পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন – ধর্মগ্লানি দূর করেছেন – "মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না।"

বিশ্বব্যাপিত্ব অসংখ্য নরনারীর জীবনে এই ব্রহ্মপুর থেকে লোক এসেছে – সেটা আমার রূপ।

এটি বেদের কথা – বেদ অপৌরুষেয়–এই তার প্রমাণ। সহস্র সহস্র বৎসর আগে মানুষের জীবনে যা হ'য়েছিল আজও তাই হচ্ছে – সনাতন। বিশ্বব্যাপিত্বে কেউ কারোর গুরু নয় – কেউ কারোর শিষ্য নয়। "সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই" – এ হলো লয় যোগ (A civil form of committing suicide)।

এই লয় যোগই ভারতবর্ষে নির্বিকল্প সমাধি বলে প্রচলিত।

তোতাপুরী মহারাজ ঠাকুরকে এই লয় যোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন আর ঠাকুর জানতেন – এ-ই নির্বিকল্প সমাধি। অবশ্য নির্বিকল্প সমাধি – "তদাকারকারিত" – একথা বলেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যাতে বত্রিশ আনা ভুল –

"লবণ পুত্তলিকা সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল – আর খবর দিবেক কে?"

নির্বিকল্প সমাধিবান পুরুষকে সংখ্যাতীত নরনারী – "তদাকারে" – এই জীবন্ত মানুষটির চিন্ময়রূপে – নিজেদের দেহের ভিতর দেখবে – আত্মিক একত্ব – "তদাকারকারিত।"

সিস্টার নিবেদিতার বইয়ে পাওয়া যায় – স্বামীজী বলছেন, "আমাদের এই দুর্বল লোকগুলির ভিতর জোর ক'রে ঢুকতে হবে" – অবশ্য ঠাকুর কিম্বা স্বামীজীর জীবদ্দশায় এটি হয়নি।

জৈমিনী বলেছে, "বিশ হাজার লোক দেখলেও হবে না, সংখ্যাতীত নরনারীর হওয়া চাই।"

আমার নিজের জীবনে প্রত্যহ প্রভাত থেকে আরম্ভ ক'রে নিদ্রা পর্যন্ত – নিত্য তার প্রমাণ পাচ্ছি।

নির্বিকল্প সমাধি – তদাকারকারিত – একত্ব। লয় যোগ নয়।

আমার জীবন বাস্তব। আমার জীবনের ধর্ম – তথা বিশ্বব্যাপিত্ব – তথা আত্মিক একত্ব – বাস্তব।

আর একত্ব এই জীবনেই হওয়া চাই। তা নইলে – এ জীবনের মর্ম বা রহস্য (উপনিষদ) বা অমৃতত্ব উদ্‌ঘাটিত হলো না।

মৃত্যু ধ্রুব – আর মৃত্যু – "মহতী বিনষ্টিঃ" – চিরকালের তরে।

বেদ বলছেন – "অথ য এষ সম্প্রসাদো'স্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়, পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।"

– (ছান্দোগ্য-৮/৩/৪)

"From whose bourne no traveller has ever returned."

৮৪ লক্ষ জন্ম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতারণা আর পরিহাস।

৭৬৬। **"তিনিই একমাত্র এই ভব সাগরের কাণ্ডারী।"**

ব্যষ্টি এ দেখতে পাওয়া যায়। একজন ভক্ত স্বপ্নে দেখেছেন – তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু নৌকা ক'রে লগি মেরে তাঁকে নিয়ে চলেছেন। আর একজন ভক্ত স্বপ্নে দেখেছেন – তিনি অনেক ঘুরে বন, জঙ্গল, কয়লার খনি ইত্যাদি ইত্যাদি পার হয়ে শেষে সমুদ্রের ধারে এসে উপস্থিত। সমুদ্রে দেখলেন তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু নৌকা নিয়ে বসে আছেন। দ্রষ্টার ভারী আনন্দ। মাতোয়ারা হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি এখানে, আপনি এখানে?" জবাব পেলেন, " তোমার কষ্ট হচ্ছিল – আমি জানতে পেরেছিনু, তাই তোমার জন্যে বসে আছি।" স্বপ্ন ভেঙে গেল।

আবার কিছুদিন পরে ঐ ভক্তটি স্বপ্ন দেখেছিলেন – তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দগুরুর নৌকায় উঠেছেন – সচ্চিদানন্দগুরু নৌকার হাল ধ'রে বসে আছেন – আরও লোক আছেন। নৌকা চল্‌ল।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্যষ্টির এই অনুভূতি ক্রমে বিশ্বব্যাপিত্বে পরিণত হয়। দ্রষ্টার এইরূপ দর্শন – আবার নিজের বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভাই-বৌ, ভগ্নী, ভগ্নীপতি, ভাগ্নে ইত্যাদি – আবার অসংখ্য অন্য স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধের মারফৎ এই "দর্শনের" কথা শুনে – ব্রহ্মত্বের – একত্বের – ঘনীভূত বোধ স্ফুরিত হয়।

৭৬৭। **"চাঁদামামা সকলেরই মামা"**

ব্যষ্টি চাঁদামামা সকলকার মামা বটে তবে একটু ফারাক আছে – কেউ মামার কোলে বসে থাকে – আবার কারোর মামা হয়তো দূর ফিন্‌ল্যাণ্ডে বসে আছে।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বই চাঁদামামা – সকলকার।

৭৬৮। **"তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশি।"**

ব্যষ্টি "নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাত্‌ওয়ারী
মা – সগুণ ব্রহ্ম – লীলা – সমাধির বিলাস – 'আমি, তুমি' – দ্বৈতবাদ।
বাপ – নির্গুণ ব্রহ্ম – স্থিত সমাধি – অদ্বৈতবাদ।

বিশ্বব্যাপিত্ব মাও নেই আর বাপও নেই – No father, no mother, হংস হংসী – কিছুই নেই রে বাবা! আছে, জীবনের জীবত্ব (Life power- কুণ্ডলিনী)– জীবন্ত মানুষের ব্রহ্মত্ব – "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" – আর সেই মানুষটির আত্মিক বা চিন্ময় রূপে – মানুষের অন্তরে একত্ব। লেকচার দিয়ে নয়, আনুমানিক নয়, কাল্পনিক নয়, "ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা" বলে নয় – বাস্তব–Factual and actual।

৭৬৯। **"মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না।"**

ব্যষ্টি "মা, তোর বেদ, বেদান্তে, তন্ত্রে কি আছে আমায় দেখিয়ে দে মা। আর, মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন, জানিয়ে দিয়েছেন।" বাপ – নির্গুণ – 'আমি' নেই, কে জোর করবে?

বিশ্বব্যাপিত্ব জোরের দরকার নেই – একদম নেই! ঋষিবাক্য – বেদ – 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' – সনাতন সত্য (Natural truth in the human life, no variation yet)। এই সত্য ছিল, আছে, আর থাকবে চিরকাল।

জোর কর – তা হলেই উন্মাদ।

শ্রীঠাকুর ও শ্রীগৌরাঙ্গ দুজনেই উন্মাদ। ভক্তি উন্মাদ, প্রেমোন্মাদ, আবার জ্ঞানোন্মাদ – আর ঘটা করে চিকিৎসা! তাও সারে না – "মাঝে মাঝে এক একবার (উন্মাদও) হয়।"

ঠাকুরের জোরের চোটে, তাঁর মা তাঁকে শিখিয়েছিলেন – 'ব্রহ্মজ্ঞানকে কোটি নমস্কার'।

আর, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে "অষ্টমীতে একটি পাঁঠা" (অবশ্য কচি – তবে যোল টাং)।

অতীত ভারতের আর এই বর্তমান ভারতেরও, যদি মনুষ্যজাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের দান কিছু থাকে – সে হলো এই ব্রহ্মত্ব বা আত্মিক একত্ব।

এ পর্যন্ত জগতের কোন জাতি, বা কোন প্রচলিত ধর্ম এই একত্ব কল্পনা করতে পারেনি। অনুভূতি বা প্রমাণ – সে সব সুদূর কুয়াশা আবৃত অজানা রাজ্যের অশ্রুত বাণী!

ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞান মানে জানতেন – উন্মাদ (তাঁর যা হয়েছিল) আর জড় হয়ে থাকা, – তাই "ব্রহ্মজ্ঞানকে কোটি নমস্কার" করছেন।

৭৭০। **"কালী কি না যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন।"**

ব্যষ্টি মহাকাল ও মহাকালীর রমণ দেখতে পাওয়া যায় – সাকার মূর্তিতে। "মরাকে বাঁচানো" – অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা দান কি করে করা যায় সেই উপায় দেখাবার সময়। ব্রহ্মবিদ পুরুষ দেখতে পান কি করে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁর কাছে থেকে অপরের কাছে যায়।

তিনটি ভক্ত একত্রে ধ্যান করছে। দুজন গাঢ় ধ্যানে মগ্ন – আর একজনের ধ্যান ভেঙে গেছে। তিনি দেখলেন – ধ্যানমগ্ন দুজনের মধ্যে একজনের দেহ থেকে তাঁর মূর্তি বেরিয়ে অপর ধ্যানী ভক্তটির ভিতর ঢুকে গেল।

এটি একটি আংশিক অনুভূতি ব্রহ্মবিদ্যা দানের।

"মরাকে বাঁচানো" – এ কাহিনীটি বাইবেলে আছে।

ক্রাইস্ট ও ল্যাজারাস (মেরী ও মার্থা-র ভাই)। ল্যাজারাসের কবরের কাছে ক্রাইস্ট গিয়ে বললেন, – ল্যাজারাস উঠে এসো। আর অমনি ল্যাজারাস উঠে এলো!

এটি ব্রহ্মবিদ্যার একটি বিকৃত কাহিনী – ঠিক মহাপ্রভুর আমগাছের কাহিনী। সকলেই মৃত – মরা। যাঁর ভিতর জাগ্রত ভগবান – তিনিই জীবিত। ক্রাইস্ট জীবিত। মৃত ল্যাজারাসকে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা দান ক'রে জীবিত করলেন – ল্যাজারাসের সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হ'লো।

বিশ্বব্যাপিত্ব এটি হ'লো সঞ্জীবনী বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। মানুষের ব্রহ্মচৈতন্য সুপ্ত।

এই সুপ্ত চৈতন্যকে যিনি জাগ্রত করেন তাঁর রূপ ধারণ ক'রে ঐ চৈতন্য অন্তরে জেগে উঠে জগৎকে জানিয়ে দেয় – মানুষ ব্রহ্ম – অর্থাৎ বাইরে বহু কিন্তু অন্তরে এক – আর সে একত্ব এক জীবন্ত মানুষের সঙ্গে।

একত্বই চৈতন্য। ব্রহ্মবিদ্যা দানই দান – অর্থাৎ নিজের আত্মিক জীবন দান।

পাতঞ্জলের একটি উদাহরণ – আকাশে চন্দ্র – এক। সেই এক চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সংখ্যাতীত পুষ্করিণীতে। পুষ্করিণীর প্রতিবিম্ব চন্দ্রগুলি আকাশের চন্দ্রের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই একত্বই সেই দানের প্রমাণ – আর এ দান প্রতি নরনারীর জন্যে। বিস্ময়ের বিষয় – মুক্তকণ্ঠে তারা এই দান স্বীকার করে।

৭৭১। "একটা দৃঢ় ক'রে তাঁর চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন ?"

ব্যষ্টি তোমার চিন্তা কল্পনা মাত্র। তিনি যদি কৃপা ক'রে জানিয়ে দেন তাঁর স্বরূপ কি, তবে বুঝতে পারা যায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে – বিশ্বের মানব তোমায় জানিয়ে দেবে –

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।"
– অন্তরে তোমার ঐ "শিবো'হম্- " – ঐক্য স্থাপনের মূর্তি দেখে।

৭৭২। "শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলিপাড়াও জানতে পারবে।"

ব্যষ্টি সহস্রারে পৌঁছালে বুঝতে পারা যায় – সচ্চিদানন্দ অবস্থা কি, নির্বিকল্প সমাধি কি, জড়সমাধি কি ইত্যাদি।

৭৭৩। "এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে" ?

ব্যষ্টি মানুষের শরীরে পূর্ণ ঈশ্বরীয় শক্তির স্ফুরণ অসম্ভব। হয় ততটুকু যা তিনি ইচ্ছা করেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব একসের ঘটি নেই। ব্রহ্মত্ব – সর্বজনীন – সর্বকালীন।

৭৭৪। "আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম – "

ব্যষ্টি আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। দেহ থেকে আত্মিক স্ফুরণ আরম্ভ হয়ে নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণত হয়। সাধক দেখতে পায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব দেহতত্ত্বে ব্রহ্ম – "পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য" – আত্মা বা ভগবান্ বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার।

আবার এই আত্মা বা ভগবান বা ব্রহ্ম "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" না হ'লে (সংখ্যাতীত লোক তোমার চিদ্ঘনকায় মূর্তি অন্তরে দেখবে – সংখ্যাতীত না হ'লে হলো না – জৈমিনি) ব্রহ্মত্বের বা আত্মিক একত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

“পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য” – এর প্রমাণ – “স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।” আর, “ভূমৈব সুখম্”-

ভূমা – প্রচুর। সুখ – সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান।

বহুত্বে এই আত্মিক একত্বেই ব্রহ্মত্বের জ্ঞান সুপ্রমাণিত হয়।

ধন্য বেদ।

মানব জাতির এই অন্তর্নিহিত “আত্মা’স্য জন্তোর্নিহিত গুহায়াম্” – সনাতন সত্যের প্রতিষ্ঠা ক’রে গিয়েছে।

চিরস্মরণীয় বহুমানব, বিশ্বে বহু মহার্ঘ্য বস্তু দান করেছেন। মানব জাতি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের এই একত্ব দানের জন্য কাউকেই কারোর কাছে কৃতজ্ঞ হতে হবে না। সনাতন সত্য (আত্মিক একত্ব) স্বয়ং প্রকাশ।

৭৭৫। “শুদ্ধা ভক্তি” –

ব্যষ্টি শুদ্ধা ভক্তি পাকালো হ’লে দু’টি অবস্থা হয়। উর্জিতা ভক্তি – “হাসে কাঁদে নাচে গায়” – পরমহংস – নিত্যানন্দ – অবতারবাদের বর্হিলক্ষণ। আর পূর্ণ লক্ষণ – অন্তরে “মানুষরতন” হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন।

৭৭৬। “পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ”।

ব্যষ্টি পূর্ণজ্ঞানের পর তত্ত্বজ্ঞান – ‘আমি’ থাকে না – “তুমি”।

সময়ে সময়ে ভক্তের আমিও ‘তুমি’-র ভেতর। অথচ ‘তুমি’ ‘আমি’ একও নয়। আবার শুধু ‘তুমি’।

বিশ্বব্যাপিত্ব ‘অভেদ’ – আত্মিকে – বিশ্বব্যাপিত্বে। “তদাকারকারিত” – “চিৎস্বরূপভাবঃ” – নির্বিকল্প সমাধি।

জগতের মনুষ্যজাতির – “গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং” – অন্তঃস্থলে এই ব্রহ্মবিদের আত্মিক চিদ্ঘনকায় রূপ সমাহিত।

এই রূপ তারা দেখে – আর বলে। শুধু যে আমাকেই বলে তা নয়। তারা সমস্ত মনুষ্যজাতিকেই – “তদাকারকারিত” – এই কথা প্রমাণ সমেত বলে দিচ্ছে।

“লবণপুত্তলিকা সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল – কে আর খবর দিবেক?” – এ নির্বিকল্প সমাধি নয়।

আশ্চর্য! এই ভারতবর্ষে অবতার, পরমহংস, স্বামী, স্ত্রী কেউ এই “তদাকারকারিত” কথার মানে জানে না।

“তদাকারকারিত” কথার মানে অনুভূতি সাপেক্ষ। এ অনুভূতি তাঁদের হয়নি।

নরদেব অর্থাৎ মনুষ্যজাতি অন্তরে দেখে যদি এ অনুভূতি দান করে তবে পাওয়া যায়।

"তদাকারকারিত" হলো "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে"।

৭৭৭। **"যখন সমাধিভঙ্গের পর ওঁ ওঁ বলি, তখন আমি ১০০ হাত নেমে এসেছি।"**

ব্যষ্টি নির্গুণব্রহ্ম শূন্যতত্ত্ব থেকে শব্দতত্ত্বে নেমেছেন।

৭৭৮। **"কালী বা আদ্যাশক্তি"।**

ব্যষ্টি এই আদ্যাশক্তির চার অবস্থা। প্রথম – দেহ। দ্বিতীয় – কারণ শরীর। তৃতীয় – ইষ্টমূর্তি। চতুর্থ – আত্মা।

৭৭৯। **"চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে।"**

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরু লাভ চিত্তশুদ্ধির প্রমাণ।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মপুর থেকে এই চিদ্‌ঘনকায় মূর্তি দেহেতে উদয় হলেই – "স্বচ্ছন্দ দর্শন – সদ্যমুক্তি" – (কাশ্মিরী শৈববাদ।)।

৭৮০। **"ভক্তের 'আমি' রূপ আরশিতে সেই সগুণব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন করবে।"**

ব্যষ্টি সহস্রারে আত্মা সাক্ষাৎকার।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে বা ব্রহ্মত্বে তথা আত্মিক একত্বে জগতের লোক নিজের "আমি রূপ আরশিতে" আমার রূপ দেখে আর আমায় শিক্ষা দেয়, "তুমি, আমি এক"।

চারশ কোটি লোক – জগতে এরা এই একটি লোককেই দেখে কেন? আর কারোকে দেখে না কেন?

ধন্য যাদুকর – যিনি বহুত্বে এই একত্ব প্রকাশ করেছেন!

৭৮১। **"ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্যসূর্যের দিকে যাও।"**

ব্যষ্টি জীবাত্মা যদি কৃপা করে সাধন করেন তবে। এই সাধনে আত্মার স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। মায়ার রহস্যভেদ। আত্মা, আত্মার মধ্যে জগৎ – বিশ্বরূপ। সেই বিরাট বীজে পরিণত আবার বীজ স্বপ্নে পরিণত হয়। তারপর –।

ঠাকুরের 'ম', 'রা' – আগে আত্মা তারপর জগৎ।

ভগবান, দূর আকাশের কোলে নয়। ইউরোপের দার্শনিক পন্ডিতদের জগতের বাইরে ভগবান–নয়। তিনি এই দেহের ভিতর। আর সেই আত্মার মধ্যে জগৎ। বাইরে 'আমি' রূপ আরশিতে সেই জগতের প্রতিবিম্ব দেখছি।

৭৮২। **"কিন্তু শুদ্ধভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না।"**

ব্যষ্টি মহাকারণে লয় হতে চায় না – ভগবান দেহেতে শুদ্ধ ভক্তকে লীলা দেখাবেন বলে মহাকারণে লীন করেন না – তত্ত্বজ্ঞানে নেমে আসেন। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ সাগর দর্শন ও স্পর্শন – নেমে ডুব নয়।

বিশ্বব্যাপিত্ব ভক্তি – দ্রাবিড়ী – সেমিটিক ধর্ম। দ্বৈতবাদে – বহুত্বে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

দ্বৈতবাদ – বসানো শিব – পাতাল ফোঁড়া নয়, স্বকল্পিত – স্বয়ম্ভু নয়। স্বামীজীর কথায়, Based on falsehood।

৭৮৩। "ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রিষ্টান – এই বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা করো না!"

ব্যষ্টি হীনবুদ্ধি লোকে ধর্মে প্রভেদ দেখে।

বিশ্বব্যাপিত্ব সমন্বয়ের এই যে ঝাপসা কথা – "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" – একে বলে বিচারাত্মক (Intellectualism) – ফাঁকা কথা।

তবে Toleration – সহনশীলতা আছে। এ হলো দুর্বলের বল ---Law of self protection–Inferiority complex–Darwinism.

ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা আমার আত্মিক চিদ্‌ঘনকায় রূপ অন্তরে দেখে আর সমন্বয়ের জয় গান করে।

"তাঁকে দেখে হিন্দু, দেখে মুসলমান, দেখে খ্রিষ্টান, দেখে পারসী, দেখে ইহুদি (Jew), দেখে ভারতবাসী, আবার বিদেশী!"

"জল, Water, Aqua, পানি"– এতে সমন্বয় হয় না।

এই আত্মিক একত্বই "সমন্বয়" – "The Universal Catholic Church".

৭৮৪। "জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।"

ব্যষ্টি জ্ঞানদীপ দেখতে পাওয়া যায়। চতুর্থভূমিতে, ষষ্ঠভূমিতে, আর চৈতন্যস্বরূপ – এটি চৈতন্যসাক্ষাৎকারের অংশ – পূর্ণ চৈতন্য সাক্ষাৎকার না হ'য়ে – অংশ। ব্রহ্মময়ীর মুখ – ভগবানের স্বরূপ – আত্মার দেহমধ্যে লীলা।

বিশ্বব্যাপিত্ব বহুত্বে একত্বই জ্ঞান।

আমার চিদ্‌-ঘন-কায় রূপ – "জ্ঞানদীপ"।

জ্ঞানের কী অপূর্ব পরিচয়!

৭৮৫। "রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, গরু সব মাঠে গিয়ে এক হ'য়ে যায়"

ব্যষ্টি রাখাল – আমি। গরু – মন। মাঠ – সহস্রার। এক হ'য়ে যায় – আত্মার মধ্যে জগৎ। এক – মায়ায় বহুরূপ।

বিশ্বব্যাপিত্ব আমার চিদ্‌- ঘন- কায় রূপ।

এর প্রমাণ – একত্ব – "ONE AND ONENESS"

৭৮৬। "যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়" –

ব্যষ্টি যখন "অর্ঘ্যপুটে" প্রবেশ করে।

৭৮৭। "আবার পৃথক হয়ে যায়।"

ব্যষ্টি জগৎ যেমন তেমনি চলছে – সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ঠিক হচ্ছে – শুধু আমার 'আমি' যাচ্ছে।

৭৮৮। **"নিজের ঘরে আপনাতে আপনি থাকে"**

ব্যষ্টি দেহেতে মন আবদ্ধ – সমাধিস্থ হ'য়ে ব্রহ্মানন্দ, সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে যাওয়া, নির্গুণে লয় হওয়া – স্থিত সমাধি।

৭৮৯। **"আমার সঙ্গে কোন জিনিস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যেতে নাই।"**

ব্যষ্টি সন্ন্যাসীর ব্যবহারিক লক্ষণ – সঙ্গে পুঁটলি নেই।

"সঞ্চয় না করে কভু পঞ্ছী আউর দরবেশ।"

৭৯০। **"যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, – তারা মানুষ হ'য়েও মানুষ নয়।"**

ব্যষ্টি কৃপণের ধর্ম হয় না।

শ্রীমন্দির দক্ষিণেশ্বর

২৬-১০-১৮৮৪

৭৯১। **"নরেন্দ্র তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নাম গুণগান করেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইতে থাকে।"**

ব্যষ্টি পূজনীয় মাস্টার মহাশয় দৈবচালিত হয়ে এখানে ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষণ রেখে গিয়েছেন।

স্বামীজী ঈশ্বরীয় গান করেন। ঠাকুর শোনেন। শ্রবণে ঠাকুরের ভাব ও সমাধি হয়। শ্রবণমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা দেহেতে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মবিদের দেহেতে ঈশ্বর। সাধারণতঃ তিনি অভাব-চৈতন্য। নাম শ্রবণে ভাব-চৈতন্য। তাই চৈতন্যের লক্ষণ দেহেতে প্রকাশ পাচ্ছে – ভাব ও সমাধিতে।

৭৯২। **"সব রাম দেখছি"**!

ব্যষ্টি এক আত্মা – জ্ঞানীর অবস্থা।

বিশ্বব্যাপিত্ব নিছক কল্পনা। রাম কে?

৭৯৩। **"দেখছি রামই সব এক একটি হ'য়েছেন"**

ব্যষ্টি এক, আবার বহু – আত্মার মধ্যে জগৎ – বিজ্ঞানীর অবস্থা। ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ – সবই একসঙ্গে দেখছেন ঠাকুর।

বিশ্বব্যাপিত্ব নিছক কল্পনা। রাম কে?

দশরথের ব্যাটা।

"জাঙ্গিয়া পরা", বনের ধারে, নদীর পাশ দিয়ে চলেছে – হলধারী অধ্যাত্ম পড়ছে, ন্যাওটা শুনছেন আর ঠাকুর দেখছেন!

কোন হিন্দুস্থানী ছবির প্রতিবিম্ব মাথায় ছিল – তার প্রতিচ্ছবি !

ব্যস, – নির্জলা খাঁটি সত্য – ধর্ম জগতে হৈ চৈ রৈ রৈ – মনুষ্যজাতির ধর্ম – এবার তোমরা জীবনে ধারণা ক'রে জীবন সার্থক কর – একটি কাপড়ের ন্যাজ ক'রে গাছে চড়ে ব'স – তোমার ধর্ম হোক !

অযোধ্যায় কি জাঙ্গিয়ার ফ্যাক্টরি ছিল ?

সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর দশরথ – তার ব্যাটা – অতীত France এর Dauphin ইংলন্ডের Prince of Wales আর চলেছে কিনা জাঙ্গিয়া পরে ?

ধন্য কল্পনা ! এই কল্পনাকে সত্য ব'লে জগতে প্রচার !

উন্মাদের মাথা – কল্পনার প্রাবল্য। কল্পনা রূপ ধারণ ক'রে ফুটে ওঠে আর নিজে দেখে। সেই কল্পনাকে সত্য ব'লে প্রচার করে !

ব্রহ্মত্বে একত্ব। মনুষ্যজাতি – যে মানুষটির ব্রহ্মত্ব লাভ হয়েছে – তাঁর রূপ অন্তরে দেখে তাঁকে জানিয়ে দেয়।

সব রাম দেখছি নিজেকে ব'লতে হয় না – জগৎ বলে।

রাম – এক – আর, সে এক আমি – "অহং ব্রহ্মাস্মি।"

যদি কেউ বলে – আমি বললে, অহংকার হয় এই ভয়েই বলছেন না – তাহলে "ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয় !"

"আমার অতদূর হয়নে বাবু" !

সত্যই হয়নি।

'ব্রহ্মজ্ঞানকে কোটি নমস্কার', আর 'অষ্টমীতে একটি পাঁঠা' – এটা কিন্তু ঠিক হয়েছে !

৭৯৪। "যদি হঠাৎ বলে ফেলি "খাব না" তবে খিদে পেলেও আমার খাবার যো নাই। যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে – আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে।"

ব্যষ্টি সত্যকথার উদাহরণ ও সত্যপালনের আদর্শ। কথা ও কাজ এক।

বিশ্বব্যাপিত্ব Self hypnotism – অভ্যাসে পরিণত। নিছক কল্পিত অহংকার, কি অপূর্ব সত্য পালন করছি !

"সত্য মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে" – এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যায় মিথ্যাকে সারাজীবন সত্য বলে পালন ক'রে এসেছেন।

"প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল" – একথাটাও বলা উচিত !

কার প্রসাদ ? খাওয়া উঠে গেল !

প্রসাদ – মিথ্যা।

মানুষ – ব্রহ্ম।

সে কার প্রসাদ খাবে আর আসবেই বা কোথা থেকে? ঠাকুর সারা জীবন সকলকে প্রসাদ খাইয়ে এসেছেন – মিথ্যাচার।

৭৯৫। **"হাতে মাটি নিয়ে আসবার যো নাই!"**

ব্যষ্টি সঞ্চয়ের উদাহরণ ও আদর্শ।

বিশ্বব্যাপিত্ব Self hypnotism.

৭৯৬। **"এবার দেশে ধানটান কেমন হয়েছে?"**

ব্যষ্টি সাধারণ কথা সাধারণ লোকের কাছে।

অসুরের অন্নব্রহ্ম – হরিকথা নয়।

৭৯৭। **"আমি যখন পেটের ব্যারামে দু'খানা হাড় হ'য়ে গেছি – কিছু খেতে পারতুম না তখন আমায় বল্লে – এই দেখ আমি কেমন খাই,তোমার মনের গুণে খেতে পার না।"**

ব্যষ্টি ভগবান ঠাকুরের দেহে অবতীর্ণ। ঠাকুর ভগবান। এই মায়ার জগৎ তাঁকেও তিরস্কার করে। যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হন। মানুষ ত' ঠিক মানুষ।

বিশ্বব্যাপিত্ব পরাবিদ্যার সঙ্গে জাগতিক কোন বস্তুর সম্পর্ক নেই। শ্রীবুদ্ধের colic,সক্রেটিসের বিষপান, ক্রাইষ্টের crucifixion, শঙ্করের fistula, শ্রীচৈতন্যের পদস্ফূট, ঠাকুরের চিররুগ্ন দেহ, স্বামীজীর Diabetis, Asthma, Dropsy ইত্যাদি – জগৎকে জানিয়ে দিচ্ছে, – পরাবিদ্যা – বিদ্যা – সর্বসিদ্ধিদায়ী মাদুলি নয়।

৭৯৮। **"শ্রীমতীর মহাভাব হতো।"**

ব্যষ্টি ভাব ও মহাভাব। ভাব – কুণ্ডলিনী জাগরণ – গতি মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে। মহাভাব – মহাবায়ুর জাগরণ – গতি তলপেট দিয়ে – সামনের দিকে। মহাভাব ভাবের অপেক্ষা ১৯ গুণ বেশী ক্ষমতা ধরে– শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে। আর যাঁর হয় তিনি বোঝেন।

৭৯৯। **"কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ ছুঁসনি-এঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন।"**

ব্যষ্টি শ্রীমতীর দেহে কৃষ্ণ। মহাবায়ু দেহকে মন্থন করে কৃষ্ণরূপ ধারণ করেছেন। আদ্যাশক্তি – মহাবায়ু – শ্রীকৃষ্ণ – এই পরিবর্তন ব্রহ্মবিদ্যা।

৮০০। **"ঈশ্বর অনুভব না হ'লে ভাব ও মহাভাব হয় না।"**

ব্যষ্টি দেহেতে ঈশ্বরের প্রকাশে – ভাব ও মহাভাব হয়। অল্প প্রকাশে ভাব, বেশি প্রকাশে মহাভাব।

৮০১। **"গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে – তেমন মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে।"**

ব্যষ্টি দেহের লক্ষণ – দেখতে পাওয়া যায়। দেহটাকে তোলপাড় করছে – দুমড়ে ভেঙে দিতে চায় – শুয়ে যদি হয়, তা হ'লে কাত্‌লা মাছের মতন চিৎ হয়ে আছাড় খায় – এও এক রকম দেহ ও আত্মার রমণ।

৮০২। **"অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না।"**

ব্যষ্টি দেহের সাধারণ অবস্থা পরিবর্তিত হ'য়ে ভাব হয়। এই পরিবর্তনের অবস্থা দেহ বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না।

৮০৩। **"আয়নার কাছে বসে কেবল মুখ দেখলে লোকে পাগল মনে করবে।"**

ব্যষ্টি আয়না – 'আমি'রূপ আয়না। মুখ – স্বস্বরূপ।

পাগল মনে করবে – অঙ্গবিকার দেখবে আর ভাববে মুখ খিঁচিয়ে রয়েছে।

৮০৪। **"কর্ম চাই তবে দর্শন হয়।"**

ব্যষ্টি এঁরা নিত্যসিদ্ধ নন তাই সাধন করতে বলছেন। "তবে হাজার চেষ্টা কর তার কৃপা না হ'লে কিছু হয় না।"

বিশ্বব্যাপিত্ব বিদ্বৎ – বিবিদিষা নয়। আপনা হ'তে হ'লে হবে – তা নইলে নয়।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" – এই স্বভাবসিদ্ধ সত্য অপৌরুষেয়, কখনও ব্যতিক্রম হয় না!

৮০৫। **"একদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখলুম।"**

ব্যষ্টি সহস্রার দর্শন।

৮০৬। **"মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাত্‌তে হয়।"**

ব্যষ্টি মাখন – আত্মা। আত্মার দর্শন ও দেহেতে ধারণা করতে যদি চাও – দেহ মন প্রাণ চিত্ত যাতে সমতাগুণ প্রাপ্ত হয়, স্থির হয় – তাই করতে হয়।

৮০৭। **"তারপর নির্জনে রাখতে হয়।"**

ব্যষ্টি কামিনী কাঞ্চন থেকে দূরে, বহুদূরে থাকতে হয়। দেহ ও আত্মা আলাদা হবে, সন্ন্যাসী হবে – "সন্ন্যাসী নারীর ছবি হেরবে না।" এসব চেষ্টা ক'রে করতে হয় না, আপনা হ'তে যোগাযোগ হয়। আর ২৪/২৫ বছরের মধ্যে যদি হলো – আর তা না হ'লে হলো না।

৮০৮। **"তারপর দই বসলে পরিশ্রম ক'রে মন্থন করতে হয়।"**

ব্যষ্টি দই বসলে – দেহ, প্রাণ, মন, চিত্ত সব স্থির হ'লে। মন্থনদণ্ড – কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনী দেহকে মন্থন করে।

৮০৯। **"তবে মাখন তোলা হয়।"**

ব্যষ্টি তবে আত্মার ধারণা ও দর্শন পাওয়া যায়।

৮১০। **"শাস্ত্র কত প'ড়বে" ?**

ব্যষ্টি শাস্ত্র পড়ে কিছু হয় না – ভগবান দর্শন হয় না।

৮১১। **"শুধু বিচার করলে কি হবে ?"**

ব্যষ্টি শাস্ত্র পড়ে, তর্ক ক'রে–কিছু হয় না। ভগবানের কৃপায় ভগবান দর্শন।

৮১২। **"গুরু বাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম কর।"**

ব্যষ্টি যদি মানুষ গুরু হয়ে থাকে, তাঁর কথা অনুসারে ভগবানকে ডাক। ভাবগ্রাহী জনার্দন–তোমার অন্তরের ভাব বোঝেন। তিনি কৃপা করবেন।

৮১৩। **"গুরু না থাকলে তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, – তিনি কেমন – তিনিই জানিয়ে দেবেন।"**

ব্যষ্টি মানুষগুরুর দরকার নেই। তাঁকে ডাক। তিনি তোমার ভিতরে। সচ্চিদানন্দগুরুরূপে তিনি আসবেন, তোমায় শিক্ষা দেবেন।

৮১৪। **"বই পড়ে কি জানবে ?"**

ব্যষ্টি "গ্রন্থ নয় গ্রন্থি"। বই পড়ে ভগবানকে জানা যায় না।

৮১৫। **"যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ।"**

ব্যষ্টি হাট – সহস্রার। হো হো শব্দ – জ্যোতি দর্শন, লণ্ঠনের ভিতর আলো, বালবের (Bulb) ভিতর আলো, রেশমের পর্দার আড়ালে সূর্য।

৮১৬। **"হাটে পঁহুছিলে আর এক রকম"**

ব্যষ্টি সহস্রারে প্রবেশ করলে তখন সংশয় যায়।

৮১৭। **"স্পষ্ট দেখতে পাবে,"**

ব্যষ্টি আত্মা সাক্ষাৎকার, বিশ্বরূপ দর্শন – অফুরন্ত দর্শন।

৮১৮। **"শুনতে পাবে,"**

ব্যষ্টি আকাশবাণী "ভয় নাই" – আরও কত কি।

৮১৯। **"সমুদ্র দূর হ'তে হো হো শব্দ ক'রছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখি উড়ছে, ঢেউ হচ্ছে – দেখতে পাবে।"**

ব্যষ্টি সমুদ্র – সচ্চিদানন্দ সাগর। হো হো শব্দ – নাদ।

জাহাজ – সচ্চিদানন্দগুরু। পাখী – আত্মা – আত্মাপক্ষী। ঢেউ–অবতার। "রাম ও কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ সাগরের দু'টি ঢেউ।" এসব দেখতে পাওয়া যায় যদি কারোর পূর্ণাঙ্গ সাধন হয়।

৮২০। **"তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স (Science) সব খড়কুটো বোধ হয়।"**

ব্যষ্টি এ সমস্ত মিথ্যা হয়ে যায়। ঠাকুরের 'ম', 'রা'। 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ।

আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ। আগে আত্মা-সাক্ষাৎকার, তারপর আত্মার মধ্যে বিশ্ব সংসার। ইউরোপের ও সাধারণ মানুষের, দার্শনিক পণ্ডিতদের, বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টা চলেছে জগৎ ভেদ ক'রে – জগতের বাইরে ভগবান – তাঁকে ধরবে। ঠাকুর 'ম', 'রা' বলে সমস্ত উল্টে দিয়ে গেছেন।

৮২১। "বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার।"

ব্যষ্টি 'বড়বাবু' – ঈশ্বর। বড়বাবু দেখতে পাওয়া যায়। 'আলাপ' – দর্শন। দর্শন হয় – তিনি কৃপা ক'রে যতটা দেখান।

৮২২। "তাঁর ক'খানা বাড়ি, ক'টা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ,"

ব্যষ্টি ঐশ্বর্য – এ জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য – এটি বিন্দুমাত্র। তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা নেই।

চিদাকাশে "কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয়"।

ঠাকুর দেখেছেন – ব'লে গেছেন।

৮২৩। "চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না।"

ব্যষ্টি চাকর – ইন্দ্রিয়গণ। জ্ঞানপথ – বিচার পথ – ইন্দ্রিয় জয় – এ হয় না।

৮২৪। "ধাক্কা খেয়েই হোক,"

ব্যষ্টি কৃপা – ধাক্কা। এক 'ধাক্কায়' আমি নাশ।

সচ্চিদানন্দগুরু লাভ – নানারকম সাধন – শেষে স্বস্বরূপ দেহ থেকে বেরিয়ে বলে "তোর ওপর ভগবানের কৃপা আছে।"

বিশ্বব্যাপিত্ব জগতের নরনারী শিশু বৃদ্ধ – তোমাকে নিজেদের অন্তরে দেখে – এই ধাক্কা দেবে, "বিভুরূপে সর্বভূতে এক।" "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।"

৮২৫। "বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক।"

ব্যষ্টি ধ্যানসিদ্ধ – দেখতে পাওয়া যায় – সচ্চিদানন্দগুরু ভিন্নরূপ ধারণ করে বলেন – "তুমি ত' ধ্যানসিদ্ধ"।

নিত্যসিদ্ধ না হলে ধ্যানসিদ্ধ হয় না।

বিশ্বব্যাপিত্ব 'ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার ঠাঁই।' ধ্যানসিদ্ধের প্রমাণ বিশ্বব্যাপিত্বে। তা নইলে ফাঁকা আওয়াজ – আর নিজেকে ঠকানো, আবার জগৎকে ঠকানো।

শুধু নিজের মুক্তির কথা নয়। তাঁর কাছে যারা আসবে তারা "ধ্যানসিদ্ধের" রূপ অন্তরে দেখবে – স্বচ্ছন্দ দর্শন ও সদ্যমুক্তি।

বিশ হাজার লোকের দর্শনে হবে না – সংখ্যাতীত হওয়া চাই।

৮২৬। "দ্বারবান সব সেলাম করবে।"

ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়গণ দাস হয়ে যায়।

৮২৭। **"হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে।"**

ব্যষ্টি দেহেতে ভগবান আছেন।

৮২৮। **"চার করো, চারা ফেলো।"**

ব্যষ্টি সাধন ভজন কর, সাধুসঙ্গ কর।

বিশ্বব্যাপিত্ব "চার" ও নেই, "আচার" ও নেই।

স্বয়ম্ভুর স্বয়ং প্রকাশ।

ঘুষঘাস চলে না – পাঁঠাও নয়, সন্দেশও নয়!

৮২৯। **"গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে।"**

ব্যষ্টি দেহের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হবে – দেহে নানারকম যোগৈশ্বর্য প্রকাশ পাবে। দেহ ঘট্ ঘট্ করে নড়ে। দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা।

৮৩০। **"হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল, মাছটা ধপাং করে উঠ্‌লো।"**

ব্যষ্টি আংশিক দর্শন।

৮৩১। **"মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো।"**

ব্যষ্টি মাখন যদি আপনা থেকে উঠলো তবেই উঠলো – তা নইলে নয়। আত্মার সংকলন, অবতার ও খন্ড অবতারদের হয় – তা নইলে হয় না। "জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি আর হয়? সে দু'এক জনার।"

৮৩২। **"মাছ ধরে হাতে দাও।"**

ব্যষ্টি এটি হলো মাছের প্রতীকে আত্মাসাক্ষাৎকার – নিম্নস্তরের আত্মার অনুভূতি। এ দেখতে পাওয়া যায় – সচ্চিদানন্দগুরু ভক্তের হাতে গোটা মাছ দিচ্ছেন।

৮৩৩। **"রাজা আছেন সাত দেউড়ীর পারে।"**

ব্যষ্টি রাজা – ভগবান। সাত দেউড়ী – সপ্তভূমি – লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কন্ঠ, ভ্রূমধ্য, সহস্রার।

৮৩৪। **"তাঁর কৃপার উপর নির্ভর।"**

ব্যষ্টি আত্মা যাকে বরণ করে তারই হয়। কৃপা, ভক্তের কথা – দাসভাব। বরণ করা – আপনা আপনি হয় – কেন হয় তার কারণ জানা নেই। "ক" দেখে প্রহ্লাদের কৃষ্ণস্ফুরণ – কেন এই স্ফুরণ তার কারণ প্রহ্লাদ জানতেন না। ১২/১৩ বছরে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ। সে মূর্তি আগে কখনও দেখেননি। তিনি পর পর দু'রাত্রি এলেন, কথা কইলেন, আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু কি যে হচ্ছে – যার হচ্ছে সে কিছুই বুঝছে না, বা জানছে না – তবে, একটা কি হচ্ছে।

৮৩৫। **"ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়।"**

ব্যষ্টি ব্যাকুলতা – হৃদয়গ্রন্থি যখন ছিন্ন হয়, তখন বুঝতে পারা যায় – যোগের একটি ঐশ্বর্য ও লক্ষণ। ব্যাকুল হয়ে মানুষ এ, ও, তা, সে করতে পারে, ভুল ক'রে। জনার্দন ভাবগ্রাহী। তিনি মন বোঝেন। কৃপা করে সব ঠিক করে দেন – সচ্চিদানন্দগুরু রূপে শিক্ষা দেন।

৮৩৬। **"একটা সুযোগ হওয়া চাই"।**

ব্যষ্টি পূর্বজন্মের সুকৃতির বলে এই সুযোগ ঘটে। দক্ষিণেশ্বরে – ঠাকুরের শ্রীমন্দিরে বসে একটি লোক বলল, "আমার কেহ নাই।" ঠাকুর ছোট খাটে বসেছিলেন, তড়াং করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর, নাচতে নাচতে বললেন, "এ্যাঁ, তোমার কেউ নেই, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, তোমার ভগবান আছেন।"

৮৩৭। **"সাধুসঙ্গ"**

ব্যষ্টি সাধু তিনি যাঁর মন, প্রাণ, আত্মা ভগবানে লীন হয়।

যাঁর মুহুর্মুহু সমাধি হয়। সাধুর এই সংজ্ঞা ঠাকুর দিয়েছেন। সাধুর ব্যবহারিক লক্ষণ –

১ম। তিনি অপরে টাকা দিতে এলেও নেবেন না।

"আমি কারুর কিছু লইনা", "ও যদি সাধু হয়েছে ত' অপরের টাকা নেয় কেন?"

২য়। সাধুর কাছে কখনও মেয়েছেলে থাকবে না।

"সন্ন্যাসী নারীর ছবি হেরবে না।"

সঙ্গ – সর্বদা – সর্বক্ষণ।

৮৩৮। **"বিবেক"**

ব্যষ্টি শুদ্ধবুদ্ধি না হলে ঠিক বিবেক হয় না – "সাধা লোকের বেতালে পা পড়ে না।"

৮৩৯। **"সদ্‌গুরু লাভ"**

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরু লাভ। তিনি শিক্ষা দেবেন, কারণ শরীরে অবস্থান করবেন – মনে হবে সচ্চিদানন্দগুরু সঙ্গে র'য়েছেন। সেই কারণ শরীরে সাধনের অনুভূতি সমূহ প্রকাশ পায় – ভক্ত দেখে। এও আত্মিক স্ফুরণ।

৮৪০। **"কি বিবাহ আদপেই হলো না, সংসারে বদ্ধ হতে হলো না"।**

ব্যষ্টি নিত্যসিদ্ধের যোগাযোগ। কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। "মহামায়ার রাজ্যে ভারি হিজিবিজি।" ঠিক বুঝবার জো নেই।

৮৪১। **"ভারী অসুখ"**

ব্যষ্টি 'আমি' রূপ ভবব্যাধি। 'অহং' জ্ঞান ব্যাধি বিশেষ।

৮৪২। **"কেউ ব'ল্লে"**

ব্যষ্টি "পহলে শুনিনু অপরূপ ধ্বনি কদম্ব কানন হতে" – আকাশবাণী।

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" – আপনা হতে শুনেছে।

৮৪৩। **"স্বাতী নক্ষত্র"**

ব্যষ্টি "দেখতে পাওয়া যায় না" – নির্গুণ ব্রহ্ম।

৮৪৪। **"বৃষ্টি পড়বে"**

ব্যষ্টি কৃপাবারি বরিষণ – স্বপ্নে দেখা যায়। ভাগ্যবান লোক দেখতে পায় – অনেক ভক্ত দেখেছে। আবার কেউ দেখে বৃষ্টি হয়ে সব ভেসে যাচ্ছে।

৮৪৫। **"বৃষ্টির জল"**

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরু।

৮৪৬। **"মরার মাথার খুলিতে থাকবে"**

ব্যষ্টি দেহেতে কারণশরীরে সচ্চিদানন্দগুরু থাকবেন। তখন দেহ – শব। মরা – শবসাধন।

৮৪৭। **"সাপ"**

ব্যষ্টি কুণ্ডলিনী।

৮৪৮। **"ব্যাঙকে"**

ব্যষ্টি 'অহং'রূপ ব্যাঙ।

৮৪৯। **"ব্যাঙকে ছোবল মারবার সময় ব্যাঙটা যাই লাফ দিয়ে পালাবে"**

ব্যষ্টি অহং নাশের সময়।

৮৫০। **"সাপের বিষ"**

ব্যষ্টি কুণ্ডলিনীর সারাংশের আত্মায় পরিণত হওয়া।

৮৫১। **"বিষের ঔষধ তৈয়ার"**

ব্যষ্টি আত্মার সাধন – বেদান্তের অনুভূতি সমূহ।

৮৫২। **"তবে বাঁচে"**

ব্যষ্টি জীবন্মুক্ত হয় – 'আমি'রূপ ভবব্যাধির নাশ –"আমি- না।"

বিশ্বব্যাপিত্ব "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" – হলে তবে "বাঁচে"। জীবন্মুক্তের প্রমাণ বিশ্বব্যাপী একত্বে।

৮৫৩। **"মন থেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না।"**

ব্যষ্টি ত্যাগ হয়েছে তার লক্ষণ – কুণ্ডলিনী জাগরণ। এই কুণ্ডলিনী জাগরণের ক্রম আছে। দেহ ভেদ করে জাগরণ হলে তবে ষোল আনা–ঈশ্বরদর্শন ও ক্রমে ঈশ্বর লাভ।

বিশ্বব্যাপিত্ব "সর্বত্যাগ" ও "ঈশ্বর লাভ"- এর প্রমাণ একত্বে।

একত্ব – নিরদ্বন্দ্ব – "দশদিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা।"

ঈশ্বর – "স একঃ" – বেদ।

(২৬-১০-১৮৮৪)
শ্রীমন্দির দক্ষিণেশ্বর

৮৫৪। **"সাধু সঞ্চয় করতে পারে না।"**

ব্যষ্টি সাধুর জীবন এরকম সেখানে সঞ্চয় হতে পারে না। "রোজগার পেটচলা পর্যন্ত।"

৮৫৫। **"হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে পারি না।"**

ব্যষ্টি ত্যাগীর ব্যবহারিক লক্ষণ।

বিশ্বব্যাপিত্ব এই ব্যষ্টি – Self-hypnotism.

৮৫৬। **"তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ, অও রাখ"**

ব্যষ্টি তোমাদের জীবনে যোগাযোগের অভাব, তোমাদের দেহ আর আত্মা পৃথক হবে না। তোমরা সন্ন্যাসী হতে পারবে না। তোমরা ভগবানকে ডাক।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মত্বে তথা একত্বে – প্রতি নরনারীর সমান অধিকার। "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" – সনাতন সত্য – মনুষ্যজাতির জন্মগত অমৃতত্বের বা একত্বের মাধুর্য। "একত্ব" ভারি কড়া মেজাজের লোক। ধার ধারে না – অবতারের। পরমহংসকে রেখে এসেছে – মানস সরোবরে – চৌকি দিচ্ছে বেয়নেট (Bayonet) হাতে চীনে সেপাই – পাছে উড়ে আর কোথাও যায়!

মোহান্ত বা 'মোহান্ধ' বা President মহারাজকে – প্যারিসে হোটেলের ম্যানেজার করেছে।

সন্ন্যাসীর Income tax বসিয়েছে!

একত্বের একমাত্র সম্বল – মনুষ্যজাতি – কেউ বাদ পড়ে না।

নিজেকে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী বলে পরিচিত কোন ব্যক্তির এই বিশ্বব্যাপিত্ব প্রচার করবার অধিকার নেই।

একত্ব কোন তথাকথিত ধর্মের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। সর্বজনীন – সর্বকালীন – মনুষ্যজাতির অন্তর্নিহিত সনাতন সত্য।

প্রমাণ দেয়, এই একত্বের, সংখ্যাতীত নরনারী – "বিভু"কে (জীবন্ত মানুষ) অন্তরে দেখে, আর তারই সঙ্গে, ঊর্ধ্বে তুলে ধরে – "একত্বের" – সত্যের জয়যাত্রার পতাকা।

৮৫৭। **“মা তুমি যেন হৃদয়ে থেকো।”**

ব্যষ্টি মা, তুমি এইটুকু কৃপা কর, যেন খেতে পাই।

অন্নগত প্রাণ – খেতে না পেলে ব্রহ্মবিদ্যার স্ফুরণ হয় না।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বে — ‘God the order supplier’ –প্রার্থনা নেই।

পরাবিদ্যা – নিষ্কাম করে।

৮৫৮। **“এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা”**

ব্যষ্টি আত্মার মধ্যে জগৎ।

বিশ্বব্যাপিত্ব রাম – এক। এই একত্বের মহিমা প্রকাশ – “একো’হং বহুস্যামি”

বেদ তারস্বরে একত্বের গৌরবের গুণ গরিমা প্রকাশ করছে –

“একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যে’নুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।” (কঠ - ২/২/১২)

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যে’নুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।” (কঠ - ২/২/১৩)

১। “বশী” – সূর্যমন্ডলস্থ পুরুষ, জীবন্ত মানুষের রূপ – পরমপুরুষ, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর।

২। “একং রূপং বহুধা” –

আমার এই রূপ – দেখেন সংখ্যাতীত নরনারী – আত্মিক রূপ – চিদ্‌ঘনকায় – Real Man in apparent form।

৩। “সুখ” – সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান – একত্ব।

৪। “শান্তি” – একত্বে সর্ব প্রশ্নের সমাধা।

৮৫৯। **“অন্নের জন্য সাত জায়গায় ঘোরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল।”**

ব্যষ্টি ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িতে ৩১/৩২ বছর ছিলেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব অন্ন – ব্রহ্ম।

ব্রহ্মত্ব বা একত্ব – ঘোরাঘুরির ধার ধারে না। আপনা হতে হয় – ঘরে বসেই হয়। Maginot Line–যুদ্ধ ক্ষেত্রে – আমার অস্তিত্বের সংবাদ জানে না – সে Commander মানুষ – সেও দেখে, আবার দীর্ঘ দশ বৎসর পরে আমার ঘরে এসে

বলে।

(Paul Adam : ইনি বৌদ্ধ ভিক্ষু, ‘আর্যদেব’ নামে পরিচিত – পরে চিঠিতে আমাকে “স্বপ্নেশ্বরনাথ” নামের সঙ্গে যুক্ত করেন।)

৮৬০। “ঝড়ের এঁটোপাতা হয়ে”

ব্যষ্টি তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করে – “তুমি, তুমি”।

৮৬১। “সবই রামের ইচ্ছা”

ব্যষ্টি তত্ত্বজ্ঞানীর সাধন কাহিনী ও দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁত – দেহ, অসংখ্য তন্তুতে (Fibres of flesh) দেহ তৈরী। হাটে – জগৎ সংসারে। কাপড় বিক্রী করে – সৎপথে থেকে খেটে খায় – সাধারণ জীবন যাপন করে।

লোকটি ভারি ভক্ত – সহজাত সংস্কারবান।

ডাকাত – ইন্দ্রিয়গণ – “পঞ্চভূত আর ছয়টা রিপু।”

গৃহস্থের বাড়ি – এক অর্থে দেহ, অপর অর্থে জগৎ সংসার।

কতকগুলি জিনিস তাঁতীর মাথায় দিল – কর্মফল।

পুলিশ – কর্মফলের পরিণতি। মাথায় মোট – নিজের কর্ম নিজে জানে। মোটের মতন স্তূপাকার কর্মফল নিজের ভিতরে।

ধরা পড়লো – আমি জানি আমি কি। না বলবার জো নেই।

সে রাত্রি – অজ্ঞান অন্ধকার – যতক্ষণ আমি এই দেহ ততক্ষণ অজ্ঞান অন্ধকার। ষষ্ঠ ভূমির শেষপ্রান্তে রেশমের পর্দার আড়ালে সূর্য। সেই সূর্য দেখলে তবে “অরুণোদয়”।।

হাজতে – দেহেতে আবদ্ধ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব – ভগবান। ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন – জীবন্মুক্ত। রামের ইচ্ছা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে – ভগবানের ইচ্ছায় দেহেতে আবদ্ধ হয়েছিলাম – আবার ভগবানের ইচ্ছায় দেহ থেকে মুক্ত হয়েছি – জীবন্মুক্ত – তত্ত্বজ্ঞান।

৮৬২। “একজন কেরাণী জেলে গিছিল।”

ব্যষ্টি কেরাণী – অহং।

জেলে গিছিল – দেহেতে আবদ্ধ হওয়া।

৮৬৩। “জেল খাটা শেষ হলে।”

ব্যষ্টি জীবন্মুক্ত হলে।

৮৬৪। “সে কি কেবল ধেই ধেই করে নাচবে, না কেরাণীগিরি করবে”?

ব্যষ্টি অপর সাধারণে যেমন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সেই রকম করবে। ঠাকুরের যুগে এই নূতন প্রথা। অপরে খেটে খায় সেও খেটে খাবে। তার যদি কাম ত্যাগ হয়ে

থাকে–সে ভগবানের কৃপায় হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব কিছুই নেই। শ্রীভগবানের কৃপায় লাভ হয়েছে তাঁর ব্রহ্মবিদ্যা। সে হলো ব্রহ্মবিদ্যা–ভেল্কি (Magic) নয় – তার ভোগের বস্তু সংগ্রহের যন্ত্র নয়।

৮৬৫। **"যার জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার এখানে সেখানে নাই।"**

ব্যষ্টি যাঁর আত্মা সাক্ষাৎকার হয়েছে, দেহমন্দিরে শ্রীভগবান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবন-মৃত্যু রহস্য ভেদ হয়েছে – তিনি কুটিচক।

৮৬৬। **"যার সেখানে আছে তার এখানে আছে।"**

ব্যষ্টি যা হবার তা হয়ে আছে (Predestined)। ত্রিকাল – অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এক হয়ে যাচ্ছে। এটি ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট। কুরুক্ষেত্রে ঠাকুর অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন – ওরা সব মরে রয়েছে।

৮৬৭। **"আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাকতে পারে।"**

ব্যষ্টি সংসারে থাকা – মায়ার খেলা খেলবার জন্য নয়। ভগবান রেখে দিয়েছেন তাই আছে – ভগবানকে ডাকে আর থাকে – "ভক্তি ভক্ত নিয়ে।"

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে "ভক্তি ভক্ত" নেই।

আছে, মানুষের অন্তর্নিহিত "অনুরেষঃ ধর্মঃ" তথা, "গূঢ়মনুপ্রবিষ্টঃ" তথা "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" – বহুত্বে একত্ব।

কেন বহু?

"ভূমৈবসুখম্।" ভূমা – প্রচুর। সুখ – জ্ঞান।

"একা আমি, হই বহু, দেখিতে আপন রূপ"। – (স্বামী বিবেকানন্দ)

With the Great Swami it was but an intellctualism–a far distant reverberatory echo of the Vedic teaching. Whereas it is a 'Factualism* with me.

অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে আমার আত্মিক একত্বের রূপ ফুটে ওঠে। তারা তাই দ্যাখে আর মুক্ত কণ্ঠে বেদের শাশ্বত সত্য "ভূমৈব সুখং" প্রচার করে।

৮৬৮। **"দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুললে, দেখলাম – গৌরবর্ণ, তার উপর সিঁদুর ছড়ান।"**

ব্যষ্টি অনুরাগ – দেহ লাল – রক্ত ঊর্ধ্বমুখী। সাধকের অবস্থা। সাধন অবস্থায় রক্ত ঊর্ধ্বমুখী হয় – দেহ লাল হয়ে থাকে, অর্থাৎ সাধক মাত্র।

৮৬৯। **"যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তাঁর কি "আমি পন্ডিত" 'আমি জ্ঞানী' 'আমি ধনী' বলে অভিমান থাকতে পারে?"**

---

* দার্শনিক মত বিশেষ - এই মতে বাস্তব সত্য বা তথ্যাদি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক।

ব্যষ্টি ব্রহ্মজ্ঞান – স্থিত সমাধি হয়ে মহাকারণে লয় হওয়া। স্থিত সমাধি হয়নি। জড় সমাধি। তাই তত্ত্বজ্ঞান – "আমি না"। অহংকার থাকে না। সুতোয় যদি একটি রোঁয়া থাকে তাহলে আর ছুঁচের ভেতর যায় না। যার 'আমি' নেই তার কোন বিশেষণও নেই।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মজ্ঞান – আত্মিক একত্ব। ব্যষ্টির ব্রহ্মজ্ঞান – লয় হওয়া – মৃগী রোগীর অজ্ঞান হওয়া। Socrates ৬ ঘন্টা, বছরে একবার, দুবার, অজ্ঞান বা সমাধিস্থ হয়ে থাকতেন – গ্রীকরা বলত – Cataleptic fit.

"সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" – এই বইয়ে ঠাকুরের সমাধিকে Epileptic fit বলা হয়েছে।

চিরপূজ্য সারদানন্দ স্বামী তাঁর পুস্তকে ঠাকুরের ছয় মাস নির্বিকল্প সমাধির কথা উল্লেখ করে জগতে Hydrogen Bomb নিক্ষেপ করেছেন – সেটি যেমন আছে তেমনিই রেখে দেওয়া ভাল – নাড়লে চাড়লে আবার ফাটতে পারে – আবার জগতের সর্বনাশ – দরকার নেই!

৮৭০। **"সেই অবস্থাটি হলে, কে কিরূপ লোক দেখতে পাই।"**

ঠাকুরের ভিতর আত্মা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রূপ ধরে ফুটে উঠছেন। ঠাকুর মহর্ষির অবস্থা দেখতে পেলেন। এটি ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট। চলিত কথায় আছে – সাধুরা অপরের বিষয় জানতে পারে – এই সেই অবস্থা। তবে ইচ্ছা করে হবে না – আপনা হতে যদি হয়, তা হলে, নইলে নয়।

বিশ্বব্যাপিত্ব ঠাকুরের এই অবস্থার ব্যাখ্যা আমার নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কি করে হতো কিছু বলে যাননি। একে বলে 'সর্বভূতানি চ আত্মনি'।

৮৭১। **"তখন দেখি যে শকুনি যেন উঁচুতে উঠেছে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।"**

ব্যষ্টি ঠাকুর এই ছবিটি দেখতে পেতেন। মনের বাস – কপালে – ষষ্ঠভূমিতে – কিন্তু দৃষ্টি লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে।

৮৭২। **"তবেই হলো, অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়।"**

ব্যষ্টি জ্ঞানী মিথ্যার খেলা খেলতে পারে না। সংসার নিয়ে থাকা – মিথ্যার, অবিদ্যার খেলা। তিনি জ্ঞানী নন। তাঁর দেহ আর আত্মা আলাদা হয়নি, তা হলে ছেলেপুলে হতো না। "সিধানো ধান পুঁতলে গাছ হয় না।"

৮৭৩। **"তুমি কলির জনক,"**

ব্যষ্টি ত্রেতায় জনক হয়েছিল – কলিতে জনক হয় না। কলি – মিথ্যা। কলির

জনক – মিথ্যার জনক। সত্যের জনক নও। মিথ্যার জনক।

৮৭৪। **"আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম, ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম।"**

ব্যষ্টি ঠাকুরের দেহের ভিতর আত্মা। আত্মা বেদস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ হয়ে ফুটে উঠেছেন – ঠাকুর দেখছেন সচ্চিদানন্দগুরু শিক্ষা দিচ্ছেন।

৮৭৫। **"ঈশ্বর মানুষ করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য।"**

ব্যষ্টি "মানুষেই ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ।" নির্গুণ নিত্য – সগুণও নিত্য – সবই নিত্য- বিচ্ছেদহীন অবস্থায় রয়েছে। সগুণ অবস্থায় ভগবান যতখানি প্রকাশ পান – সেটা মানুষের দেহেতেই হয় – আর কোথাও নয়। শুধু সগুণ অবস্থাই মানুষের দেহে, তা নয়, – নির্গুণ অবস্থাও মানুষের দেহে। অবতার তত্ত্বে এর পূর্ণ মীমাংসা – শুধু বিষ্ণু অবতার – সগুণ ও নির্গুণ – কিছু বাইরে নেই। যা কিছু বিশ্ব সংসারে আছে সমস্তই বিষ্ণু অবতারের দেহে।

৮৭৬। **"ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।"**

ব্যষ্টি নিজেতেই নিজের প্রকাশ – অবতারের মধ্যে সমস্ত।

বিশ্বব্যাপিত্ব মানুষ ঈশ্বর।

আত্মিক একত্ব – প্রমাণ ও মহিমা।

এই সীমাহীন বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার মধ্যে এই আত্মিক একত্ব। মানবজাতি তার প্রমাণ দেয় – প্রমাণিত করে।

৮৭৭। **"আর পূজা করতে করতে আসনে বসে স্তব করে তখন আর একটি মানুষ।"**

ব্যষ্টি দেহের ভিতর ঈশ্বরীয় ভাব ফুটে ওঠে – পূজা ঠিক ঠিক হয় – দেহের ভিতর থেকে ভগবান সাড়া দেন।

৮৭৮। **"বেদান্ত বিচারে।"**

ব্যষ্টি আত্মার সাধন। "আত্মা যদি কৃপা করে সাধন করে।" আত্মা সাক্ষাৎকারের পর এই সাধন। আপনা আপনি হয়। ১২ বছর ৪ মাসে সচ্চিদানন্দগুরু লাভের পর আত্মাসাক্ষাৎকার হয়। আবার ১২ বছর ৪ মাস – আত্মাসাক্ষাৎকারের পর বিশ্বরূপ দর্শন হয়। এই বিরাট বিশ্ব – আত্মার মধ্যে। আবার এই বিরাট বিশ্ব বীজে পরিণত হয়। বীজ স্বপ্নে পরিণত হয়। স্বপ্ন জড় সমাধিতে পরিণত হয়। শেষের এই তিনটি অবস্থা শীঘ্র হয়। বীজে পরিণত হওয়ার অবস্থা শঙ্করে নেই – উপনিষদে আছে – আর, ঠাকুরের "সৃষ্টিনাশের সময় মা সমস্ত জিনিসের বীজ কুড়িয়ে রাখেন – গিন্নীদের ন্যাতা ক্যাতার হাঁড়ি।"

৮৭৯। **"সংসার মায়াময়।"**

ব্যষ্টি জগৎ নেই – আমি নেই – এরপর স্থিত সমাধিতে লয় হয় – এতে কিন্তু মায়ার পূর্ণরহস্য ভেদ হয় না। স্থিত সমাধি লাভের পর দেহ টুটে যায়। "প্রাণ গেল, কিন্তু দেহ রইল" – এই দেহের রহস্য ভেদ হয়– তত্ত্বজ্ঞানে ও অবতারতত্ত্বে।

আগমে বেদান্ত বিচারে – 'আমির' নাশ ও লয় – ঠাকুরের জ্ঞান ব্যাটাছেলে – বারবাড়ি পর্যন্ত গতি। নিগমে তত্ত্বজ্ঞান – অবতারতত্ত্ব – ঠাকুরের "ভক্তি মেয়েছেলে – অন্দরমহলে যায়"। এই অন্দরমহল দেখতে পাওয়া যায়।।

৮৮০। **"যিনি পরমাত্মা।"**

ব্যষ্টি সগুণ ব্রহ্ম – দেখতেও পাওয়া যায় – মহাযোগীরা পরমাত্মা সাক্ষাৎকার করেন। চেষ্টা করে নয়। মহাবায়ুর গতি –' যখন বন্যে আসে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল' এর মতন হয় – তখন দেখতে পাওয়া যায়- স্বল্প শুভ্র কুয়াশার মধ্যে ফিকে জ্যোৎস্নার ন্যায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমপুরুষ, বা পরমেশ্বর – এর পরিচয় ও প্রমাণ – বিশ্বব্যাপিত্বে।

১৯৫১ হতে ১৯৬২ পর্যন্ত ১৬টি নরনারী স্বপ্নে সূর্যমন্ডলে আমার এই রূপ দেখেছে।

আবার এরকম লোকও আছেন – যিনি আমার কথা আগে কখনও শোনেননি, বা আগে কখনও আমাকে দেখেননি – সূর্যমন্ডলে আড়াই বছর আগে দেখেছেন তারপর এসে বলেছেন।

বেদ বলছেঃ

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যো'সাবসৌ পুরুষঃ সো'হমস্মি।। – (ঈশ ১৬)

এই সূর্যমন্ডলের পুরুষের স্থানে আমার সুবর্ণময় রূপ দেখেছে।

সূর্যমন্ডলস্থ পুরুষকেই বেদে পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমপুরুষ, বা পরমেশ্বর বলেছে।

আমার রূপ অন্তরে যা দেখে – তাকে বলে হিরন্ময়কোষস্থ ব্রহ্ম। একেই বলে "সো'হং" – একত্ব

স – সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ।

অহং – আমি – আমার হিরন্ময় কোষস্থ ঐ পুরুষের রূপ।

দুই-ই – এক। আমি ঐ পুরুষ।

"Religion is Oneness"–Swami Vivekananda.

একত্বের পরিচয় ও প্রমাণ।

৮৮১। **“তিনি সাক্ষীস্বরূপ” –**

ব্যষ্টি নিষ্ক্রিয় – নির্গুণে নয়, – সগুণে নিষ্ক্রিয় – ক্রিয়া মাত্র দেখা।

৮৮২। **“জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি”**

ব্যষ্টি মনুষ্যদেহের এই তিনটি অবস্থা।

৮৮৩। **“স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য”।**

ব্যষ্টি স্বপ্ন ও জাগরণে কোন ফারাক নেই। শুদ্ধ মন হ'লে তবে বুঝতে পারা যায়।

৮৮৪। **“চাষা জ্ঞানী, তাই দেখ্ছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা”।**

ব্যষ্টি নেতি নেতি বিচার – জাগরণ নেই, স্বপ্ন নেই।

৮৮৫। **“এক নিত্যবস্তু, সেই আত্মা”**

ব্যষ্টি ব্রহ্মজ্ঞানেও একথা বলবার জো নেই – তত্ত্বজ্ঞানে এই কথা।

৮৮৬। **“তুরীয়।”**

ব্যষ্টি পরমাত্মা – চারিদিকে আনন্দের কুয়াশা– আর ফিকে জ্যোৎস্না।

৮৮৭। **“ব্রহ্ম”**

ব্যষ্টি তুরীয়।

৮৮৮। **“মায়া,”**

ব্যষ্টি সুষুপ্তি – আছেও বটে– নেইও বটে – বোধমাত্র।

৮৮৯। **“জীব,”**

ব্যষ্টি স্বপ্ন – দেহের ভিতর লীলা।

৮৯০। **“জগৎ”**

ব্যষ্টি জাগ্রত – যা বাইরে দেখছি।

৮৯১। **“অহংবুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হয়েছেন।”**

ব্যষ্টি এ হলো তত্ত্বজ্ঞান – “তুমি, তুমি, তুমিই সব” – শুধু ‘তুমি’ বলবার জন্য আমার “আমি” আছে। “আমি”র আর কিছু নেই – তাও তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য– এই ‘আমি’ তিনিই রেখে দেন।

৮৯২। **“যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।”**

ব্যষ্টি অবতারতত্ত্বের পর এই নিত্য ও লীলা বুঝতে পারা যায়। নিত্যও শাশ্বত – লীলাও শাশ্বত – সব সময়েই আছে, থাকবে ও ছিল – অবিচ্ছিন্ন ‘আছে।’

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বে – ‘নিত্য’ – জীবন্ত মানুষের রূপ।

ঈশোপনিষদের সূর্যমন্ডলস্থ পুরুষ।

“Absolute equality”– Plato

"লীলা"– সংখ্যাতীত নরনারী আমার যে রূপ দেখে আর বলে – সো'হং। "Abstract equality"–Plato

৮৯৩। **"জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক ছিড়িক করে।"**

ব্যষ্টি জ্ঞানীর পূর্ণাঙ্গ অনুভূতি হয় না – যেমন তোতাপুরী মহারাজ। পুরী মহারাজ আদ্যাশক্তি বা লীলা মানতেন না।

ঠাকুরের কৃপায় শেষে বুঝেছিলেন, মেনেছিলেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বে গয়লার কারবার – দুধ ঘি নেই।

৮৯৪। **"উত্তম ভক্ত হুড় হুড় করে দুধ দেয়।"**

ব্যষ্টি উত্তম ভক্তের ব্রহ্মজ্ঞানের পর পরাভক্তির অনুভূতি হয়। পরাভক্তি – তত্ত্বজ্ঞান, অবতারতত্ত্ব, "মানুষরতন", নিত্য-লীলা, লীলা- নিত্য। যেমন ঠাকুরের।

৮৯৫। **"একটু আগুনে আউটে নিতে হয়।"**

ব্যষ্টি ব্যবহারিক জীবনে একটু নিষ্ঠা কাষ্ঠা – "কামিনী-কাঞ্চনের" বিষয়ে।

৮৯৬। **"ট-অ-অ-ম-ম্।"**

ব্যষ্টি নাদ – শব্দ মাত্র। সে ওঁকার নয়। নাদের অর্থ – সংস্কৃতভাষীর পক্ষে অ-উ-ম – সৃষ্টি -স্থিতি-প্রলয়। যাদের ভাষা সংস্কৃত নয়, তারা কি শুনবে? তারা শব্দ শুনবে মাত্র। তাই নাদ – ধ্বনি। ঠাকুর এই ধ্বনি শুনেছিলেন। এইটি বিশ্বজনীন।

৮৯৭। **"স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়"।**

ব্যষ্টি আগম। লীলা থেকে নিত্য।

৮৯৮। **"মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ"**

ব্যষ্টি নিগম। নিত্য থেকে লীলা।

৮৯৯। **"চিৎসমুদ্র অন্ত নাই"**

ব্যষ্টি সগুণ অনন্ত – ভগবানের মায়িকরূপ – ষষ্ঠভূমির দর্শন। বিজ্ঞানীর অবস্থায় এই অনুভূতি হয়।

৯০০। **"চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আবার ঐতেই লয়।"**

ব্যষ্টি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই অনুভূতির কথা আছে। এটিও ষষ্ঠভূমির অনুভূতি – বিজ্ঞানীর হয়। এও মায়ার রহস্যভেদ।

"শ্যামা মা কি কল করেছে"! এই কল মানুষের দেহ – কি অপূর্ব অচিন্তনীয় বস্তু তাই দেখায়।

৯০১। **"তাঁদের কাছে শুনে অন্য লোক লিখেছে।"**

ব্যষ্টি এটি মহিমবাবুর কথা। ঠাকুর একথার জবাব দেননি। বিকারে রোগীর কথা – প্রলাপ বকছেন।

৯০২। **"যাঁর নিয়ম তিনি ইচ্ছা করলেই বদলাতে পারেন।"**
ব্যষ্টি 'ভগবানে সবই সম্ভবে'।
৯০৩। **"শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশান আছে, বালি ফেলে চিনি নিতে হয়।"**
ব্যষ্টি তাই তিনি চাপরাস দিয়ে, আদেশ দিয়ে লেখান! যে লিখবে শুধু তাকে আদেশ দেবেন, তা নয়। অপর কয়েকজন ভক্তকেও এই লেখার বিষয় জানিয়ে দেবেন। মধু–বিতরণ – শব্দার্থ আর মর্মার্থ – ভক্তিচন্দ্র গলে পৃথিবীতে পড়ছে – ঠাকুরের যুগ – নূতন প্রথা।(প্রথমভাগ, পৃষ্ঠা ১৩-১৪ দ্রষ্টব্য)।

"ঘুম থেকে উঠে দেখবো আমরা বাবু হয়ে গেছি" – স্বপ্নে ভগবান দর্শন হয়েছে।

৯০৪। **"যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা হলে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করতে বা অর্থ, মান সম্ভ্রমের জন্য আর মন দৌড়ায় না।"**
ব্যষ্টি মন – শুদ্ধমনে পরিবর্তিত। "শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধআত্মা – একই জিনিস।"

ব্রহ্মানন্দে মন মাতোয়ারা – সে তখন অপর কিছু চায় না।

৯০৫। **"বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে তা হলে আর অন্ধকারে যায় না"।**
ব্যষ্টি বাদুলে পোকা – মন।আলো দেখে – জ্যোতিদর্শন।

ষষ্ঠভূমিতে জ্যোতি দর্শন হয়। মন ষষ্ঠভূমিতে থাকলে আর পতনের আশঙ্কা নাই।

৯০৬। **"যখন রামকে চিন্তা করি"**
ব্যষ্টি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করি।
৯০৭। **"পশুভাব চলে যাবে, দেব ভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে"।**
ব্যষ্টি দেহেতে ভগবানের পূর্ণবিকাশে – শুধু তিনি – আর সব চুপ।
৯০৮। **"তখন সংসারে যদিও থাকে, জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে।"**
ব্যষ্টি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর যদি তিনি তোমার দেহ রেখে দেন তাহলে তুমি জীবন্মুক্ত। তুমি যে জীবন্মুক্ত তা তিনি দেখিয়ে দেবেন। এমন কি অপরকেও জানিয়ে দেবেন – তিনি বলে দেন, দেখিয়ে দেন, অবশ্য যাঁকে তিনি কৃপা করেন তাঁকে।
বিশ্বব্যাপিত্ব জীবন্মুক্ত একত্বে – চিন্তায় নয়, বিচারে নয় – নিজে ধ্যানে দেখে নয়, কল্পনায় নয়, অনুমানে নয় – বাস্তবে।

তা নইলে জীবন্মুক্তি দুঃস্বপ্ন মাত্র।

ছবিতে একটি অতি মনোরম আম এঁকে চেটে খাওয়া!

চণ্ডীদাস আর রামপ্রসাদ দুজনেই এই উপমা দিয়ে দুঃখ করেছেন –
"চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে র'ল।"

৯০৯। **"যে ঠিক ভক্ত, তাঁর কাছে হাজার বেদান্ত বিচার করো, আর স্বপ্নবৎ বল তাঁর ভক্তি যাবার নয়।"**

ব্যষ্টি ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানে লয় হন না। তাঁর দেহ থাকে। তিনি ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকেন। যেমন ঠাকুর।

৯১০। **"শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়।"**

ব্যষ্টি শুদ্ধাত্মা – পরমাত্মা। নিষ্ক্রিয় – নির্গুণ। তাঁতে তিন গুণই আছে – তবে তিনি নির্লিপ্ত।

বিশ্বব্যাপিত্ব "শুদ্ধাত্মা" – ব্যষ্টিতে নেই।

বেদ বলছে,
"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।"
–(কঠ- ২/২/১১)

ইনিই – শুদ্ধাত্মা।

আমার চিদ্‌ঘনকায়রূপ – সর্বজনীন – চোর, ছ্যাঁচোর, নেশাখোর, সাধু, অসাধু, গুন্ডা ইত্যাদি ইত্যাদি।

"The moral life thus becomes Universal. To live in perfect goodness is to realise Oneself in the all.
Pantheism– Dr. Urquhart.

"Be Perfect as your Father in heaven is perfect"–Bible.

৯১১। **"বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়।"**

ব্যষ্টি 'জগন্নাথ দর্শনে বেরিয়ে ভুলপথে চলেছে। রাস্তায় কেউ তাকে পথ বলে দেয় – সে তখন পুরীধামে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করে।' বিশ্বাস যাই হোক না কেন, যদি ঠিক আন্তরিক হয় – দেহ, মন, প্রাণ, চিত্ত দিয়ে বিশ্বাস হয় – তবে ভগবান কৃপা করেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বাস – কল্পনা মাত্র। প্রতীকে – প্রতীকাপন্ন।

প্রতীকে ষষ্ঠভূমির রূপ দর্শন – আলিপুর জেলে "বাসুদেব" দর্শন। বিশ্বাসে আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না।

আপনা হতে বেদমতে 'ষোলটাং' সাধন হলে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, আর –
"স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" – তার প্রমাণ দেয়।
আবার এটি "স উত্তমঃ পুরুষঃ" অর্থাৎ পুরুষোত্তমেরও প্রমাণ।

৯১২। **"যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই সব কর্ম**

করিয়ে লন।”

ব্যষ্টি চিত্তশুদ্ধি হয়।

৯১৩। **“যেমন প্রহ্লাদের”**

ব্যষ্টি প্রহ্লাদ নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধের রাগভক্তি হয়। বৈধী কর্ম করতে হয় না।

৯১৪। **“পাতাল ফোঁড়া শিব”**

ব্যষ্টি আপনা হতে উঠেছে – দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বই – শিবত্ব।

“শিবো’হং” মানে,

“ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

ত্বং জীর্ণো দন্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।”

রবীন্দ্রনাথ “শিব” মানে লিখেছেন –“ ঐক্যবন্ধনে।”

বন্ধন আর কাটে না – সবেতেই বন্ধন দেখছেন!

শিব ঐক্যস্থাপনে।

“এই দুর্বল লোকগুলোর ভিতর আমাদের জোর করে ঢুকতে হবে।’

– স্বামী বিবেকানন্দ

জোর করতে হয় না।

“মধুবিদ্যার” দ্বারা আপনা হতে হয়।

ঠাকুর বা স্বামীজী কখনও মধুবিদ্যার কথা উল্লেখ করেন নি।

মেধানাড়ী – জাতিস্মরতা – মধুবিদ্যা নয়।

১১-৩-১৮৮৫

বসু বলরাম মন্দিরে

৯১৫। **“ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার জো নাই।”**

ব্যষ্টি ঠাকুরের ত্যাগও হলো “পাতাল ফোঁড়া” – আপনা হতে হয়েছে।

কোন রকম চেষ্টা এতে নেই। ধাতুর জিনিসে হাত ঠেকাতে পারেন না। হাত ঠেকালে যন্ত্রণা হয়। ভীষণ যন্ত্রণা।

জগতের ইতিহাসে ব্যবহারিক জীবনের এরূপ ত্যাগের কথা আর কোথাও শুনতে পাওয়া যায় না। তাঁর মনে ইচ্ছা হচ্ছে – আমি বাটিটায় হাত দিই, হাতও দিলেন। আরম্ভ হলো অমনি ভীষণ যন্ত্রণা। দেহ সহ্য করবে না – কোনও রকম ত্যাগের ব্যতিক্রম। মহাপ্রভুও ছিলেন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। তাঁর ত্যাগ ছিল প্রতিষ্ঠিত – বিবিদিষার উপর। তিনি ত্যাগ করেছিলেন ইচ্ছা করে। তিনি বস্ত্র ত্যাগ করে কৌপীন

পরলেন। ঠাকুরের ইচ্ছা কাপড় পরে থাকেন। কিন্তু কখন যে কাপড় খসে পড়ে গেছে – তা টের পাননি। মহাপ্রভু পাতায় শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ খাচ্ছেন, কলার বাসনায় তরকারী খাচ্ছেন – ইচ্ছা ক'রে, বিবিদিষা, থালা কিম্বা বাটি ব্যবহার করলে তাঁর দৈহিক কষ্ট হচ্ছে এমন কথা, মহাপ্রভুর জীবনে কোথাও পাওয়া যায় না। ঠাকুরের জীবনে দেখতে পাওয়া যায় মহাপ্রভুর জীবনের বিপরীত ভাব। ঠাকুরের ইচ্ছা গাড়ুটা ব্যবহার করেন। গামছাখানি পাট করে গাড়ুর মুখে ঢাকা দিলেন। তারপর গাড়ুটায় হাত দিলেন – অমনি ঝন্‌ঝন্‌ কন্‌কন্‌। বেদনায় ব্যাকুল হয়ে মাকে বলছেন – "মা আর অমন কর্ম করবো না, মা এবার মাপ করো"। এই দেহ থেকে ত্যাগ তুলনাবিহীন এমন কিছু, যার দ্বিতীয় উদাহরণ জগতের ইতিহাসে নেই। এই হলো 'ষোল টাং'।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্যষ্টির নিছক Self hypnotism-এর কল্পনার তীব্রতা। বিশ্বব্যাপিত্বে এই Self hypnotism-এর স্থান নেই।

মানুষ এরকম ছল করে অনুকরণ করতে পারে। একত্ব – সত্য – অননুকরণীয়।

৯১৬। "খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।"

ব্যষ্টি জীবনে মেয়ে সঙ্গ না হলে তবে খুব শুদ্ধ। দেহেতে পশুভাব একবারও প্রকাশ পায়নি।

"মহামায়ার কি আশ্চর্য কৃপা, জীবনে কখনও স্বপ্নদুষ্ট পর্যন্ত হলুম না" – ঠাকুর

মনুষ্যজাতির ইতিহাসে একথা কেউ বলেনি।

বিশ্বব্যাপিত্ব "কামিনী -কাঞ্চন" ত্যাগ – জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম, অনার্য ধর্ম (Non-Aryan, Semitic Religions) থেকে উদ্ভুত। আর্য ধর্ম – সনাতন ধর্ম – একত্বের ধর্ম – সর্বজনীন – সর্বকালীন – Natural truth in the human race। চিরকাল আছে – চিরকাল থাকবে। ফতোয়া জারি করলেন ঠাকুর "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না।" করলো কে?

ন্যায়ের ফাঁকিতে – অর্থ সংগ্রহ – আশ্রম, মঠ ইত্যাদির সৃষ্টি মায় Maternity Home পর্যন্ত সৃষ্টি – "সন্ন্যাসী নারীর ছবি হেরবে না"! হিন্দুর সন্ন্যাসধর্ম ভারত মহাসাগরের অতল জলে!

"Wilful Poverty" নয়!

Easy life and cosy comforts in the name of religion chalked out as "Renunciation of women and wealth."

ভারতবর্ষের যেদিকে চাইবে এই ছবিটি দেখতে পাবে – ন্যায়ের ফাঁকির

আশ্রম মঠ ইত্যাদি।

ঠাকুরের আর এক ফতোয়া –

"সন্ন্যাসী নারীর ছবি হেরবে না"।

"গোরা নারীর ছবি হেরবে না,
নইলে, জীবের দুঃখ ঘুচবে না !"

৮০ লক্ষ সাধু, কে পালন করছে এই নিয়ম ?

চারটি বিবাহ – উকীল বাবু তিনিও আমায় দেখেন – একত্বের অধিকারী। তিনটি বিবাহ – স্কুলের নামজাদা হেডমাস্টার মহাশয় – তিনিও আমাকে দেখেন – একত্বের অধিকারী।

৯১৭। "আবার বলে যে, ঈশ্বরীয় কথা একবার শুনলে আমার মনে থাকে।"

ব্যষ্টি 'ঠিক ঠিক ভক্তের একবার শুনলে ধারণা হয়'। ঠাকুর বলছেন – ছোট নরেন ঠিক ঠিক ভক্ত। একজন ভক্ত শুনেছিল ব্রহ্মবিদ্যা দান করা যায়। রাত্রে সচ্চিদানন্দগুরু স্বপ্নে সেই ভক্তটিকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করলেন। স্বয়ম্ভু আত্মা ব্রহ্মবিদ্যা রূপে ভক্তের দেহেতে স্ফুরিত হলেন। ভক্তটি যাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা দানের কথা শুনেছিলেন তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যার বিবরণ বললেন। শ্রোতা বললেন – 'পৃথিবীতে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা দানের বিবরণ শুনলাম।'

বিশ্বব্যাপিত্ব প্রখর ধারণাশক্তি – Due to heredity –বংশজ।

৯১৮। "ছেলেবেলায় আমি কাঁদতুম – ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না বলে।"

ব্যষ্টি নিত্যসিদ্ধ।

বিশ্বব্যাপিত্ব নিত্যসিদ্ধ – জন্মসিদ্ধ – পরিচয় বিশ্বব্যাপিত্বে – "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।" সংখ্যাতীত স্থানে ঠাকুর ক্ষুদ্রকে বৃহৎ বলে সংজ্ঞা দিয়েছেন।

৯১৯। "নরেন্দ্র বলে ঈশ্বর অনন্ত।"

ব্যষ্টি এ অনন্ত – স্থান (Space) ব্যেপে। অনন্তের অতি সাধারণ কল্পনা। অনন্ত কোন স্থান ব্যেপে নেই। ভ্রূমধ্যে যখন মন গুটিয়ে আসে তখন মন বিন্দু হয়ে যায়। জ্যোতির একটি বিন্দু দেখতে পাওয়া যায়। আবার মনের – বোধের ত্রিগুণাতীত অবস্থায় অর্ঘ্যপুটে প্রবেশের আগে – মাত্র বিন্দু – জ্যোতিহীন – এই বিন্দুর পারে অনন্ত। তবে, সেখানে বোধও থাকে না। ইউরোপের পণ্ডিতদের অনন্ত (Space after space and continuity of space as far as human imagination can hold the chase) নয়–এ ঠিক তার বিপরীত। ইউক্লিডের জ্যামিতির বিন্দু – ঠিক তার পরেই অনন্ত।

বিশ্বব্যাপিত্ব বহুত্বে একত্বই অনন্ত — সংখ্যাহীন।

বহুত্বে একত্বই এই অনন্তের রূপ।

৯২০। **"Infinity (অনন্ত আকাশ) তার আবার অংশ কি? অংশ হয় না।"**

ব্যষ্টি এতে "অজ" কথার ভাব আছে — এই হলো পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

বিশ্বব্যাপিত্ব ধর্ম ঐ 'আকাশ' নিয়ে নয়!

ধর্ম জীবন্ত মানুষে। মনুষ্যজাতি শাশ্বত।

মানুষের দেহে — আত্মা শাশ্বত। আত্মার প্রসন্নতা — বিকাশ — বহুত্বে একত্ব — ধর্ম, এক ধারণ করে আছে।

৯২১। **"ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন" —**

ব্যষ্টি ঈশ্বর কি তা আমরা সম্পূর্ণ জানি না। তিনি কৃপা করে যতটুকু জানান — ততটুকু।

৯২২। **"তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে।"**

ব্যষ্টি অবতারতত্ত্ব।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মত্ব — বহুত্বে একত্ব — এর প্রমাণ দেয় জগৎবাসী।

অবতারত্ব — ব্যষ্টিতে আবদ্ধ। প্রমাণ — 'লম্ফ, ঝম্ফ' — 'হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।'

অবতারের বাহ্য প্রমাণ কিছুই নেই। গীতার — "স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে" — প্রত্যেক লোকই বলতে পারে — আমি অবতার — "Beware of the false prophets."

৯২৩। **"তিনি অবতার হয়ে থাকেন।"**

ব্যষ্টি তিনি মানুষের শরীরে অবতীর্ণ হন — সাক্ষাৎকার হয়ে বলেন — আবার ঈশ্বর দেহের মধ্যে অবতীর্ণ হচ্ছেন দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া অপর ভক্তদেরও জানিয়ে দেন — স্বপ্নে ও ধ্যানে — আকাশবাণীতে ও কথা কয়ে — এই অবতীর্ণ হবার কথা।

৯২৪। **"অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।"**

ব্যষ্টি স্বপ্নে দেখছে — আকাশ থেকে ঋষি নেমে এলেন। ঋষির বপু বিরাট। দেখলেই বোধহয় তিনি অতি প্রাচীন। তিনিই প্রাচীন পুরুষ। তিনিই আদি পুরুষ। আকাশ থেকে নেমে আসছেন — নির্গুণ থেকে আসছেন। তিনি বলেন—"চৈতন্য শীঘ্র অবতার হয়ে আসছে।" শ্রোতা ভাবে, মহাপ্রভু পুনরায় অবতার হয়েছেন কি হবেন। দ্রষ্টা জানে

না – অবতার কি ! অবতার সম্বন্ধে ধারণা – পুরাণ বর্ণিত অবতার। পরে সহস্রারে যখন চৈতন্য সাক্ষাৎকার হয়, তখন ভাবে, এই ত' চৈতন্য। তারপর দেখে চৈতন্যের অবতরণ – সহস্রার থেকে কন্ঠদেশ পর্যন্ত। আবার দেখলে অবতরণ – চৈতন্যের, সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত। শেযে দেখলে – দেহের মধ্যে 'মানুষ-রতন' হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন। ষোল আনা বুঝতে পারা যায় – ইনি অবতার।

বিশ্বব্যাপিত্ব অবতার যে কি (Definition বা সংজ্ঞা) – কোথাও পাওয়া যায় না – মুখেই বলে অবতার। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করলে সহজে বোঝা যায় – অবতার সম্বন্ধে – কিছুই জানি না।

অবতারের যৌগিক বা দেহতত্ত্বের রূপ – এই প্রথম জগতে প্রকাশিত।

আরে বাবা, বৈকুণ্ঠ নেই, সেখান থেকে কেউ কখনও নেমে আসেনি আর আসবেও না।

৯২৫। **"তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না।"**

ব্যষ্টি "যে অবধি যার উপলব্ধি হয় সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়" – তিনি কৃপা করে দেহেতে যতটুকু প্রকাশ হন – ততটুকু।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে "বড় ভাবটা"ও নেই আর "ছোট ভাবটা"ও নেই। আছে নির্মম – একত্ব। "পিরীতি সখিরে ধরেছে যাঁহারে, মরণ তাঁহারি সই।"

পাতঞ্জলের কৈবল্যপাদে এই একত্বের উপমা আছে। চন্দ্র এক – আকাশে। সংখ্যাতীত পুষ্করিণী। প্রতিবিম্বিত চন্দ্র – প্রতি পুষ্করিণীতে। সে চাঁদকে লোকে চাঁদই বলে। চাঁদ – এক।

আকাশেও যেই চাঁদ, – মানব জাতির হৃদয়েও সেই চাঁদ। বহুত্বে একত্ব।

৯২৬। **"আর সব ধারণা করা কি দরকার ?"**

ব্যষ্টি যে সময়ে যতটা দরকার অবতারের দেহে, ব্যবহারিক জীবনে, ততটা প্রকাশ পায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে "সব"ও নেই "অংশ"ও নেই – আছে আত্মিক একত্ব।

৯২৭। **"তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হলো।"**

ব্যষ্টি ইষ্ট সাক্ষাৎকার – আত্মাসাক্ষাৎকার। আধার ভেদে প্রত্যক্ষের অনেক ফারাক – আর এই প্রত্যক্ষের শেযও নেই। নিকষা বেঁচে থাকতে চায় আরও ভগবানের লীলা দেখবে বলে।

বিশ্বব্যাপিত্ব "প্রত্যক্ষই" বিশ্বব্যাপিত্ব।

আমি নিজে দেখে বললে হবে না – জগৎ আমাকে দেখে বলবে।

"স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে" তে হবে না।

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বেদে –

"সর্বভূতস্তম্ আত্মানং সর্বভূতানি চ আত্মনি সম্পশ্যন"।

৯২৮। "তাঁর অবতারকে দেখা হলে তাঁকে দেখা হলো।"

ব্যষ্টি এরকম চোখে দেখা নয়। অবতারকে যদি কেউ নিজের দেহের মধ্যে দেখতে পায় – তবে তার ভগবান দর্শন হলো। অন্তরে, দেহেতে – সচ্চিদানন্দ। তিনি অবতারের মূর্তি ধরে প্রকাশ পান। ভক্তকে দেখিয়ে দেন – এই রূপে সচ্চিদানন্দ জীবন্ত বিগ্রহ হয়েছেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব উপরের ব্যাখ্যা আমার নিজস্ব অনুভূতি। একত্বের আবরণে – ঠাকুরের কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৯২৯। "অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে তবে কাঠে বেশি।"

ব্যষ্টি 'অগ্নিতত্ত্ব' – আত্মা – চৈতন্য।

'কাঠে বেশি' – মানুষে সকলকার চেয়ে বেশি প্রকাশ। বিভুরূপে তিনি সর্বত্র আছেন কিন্তু মানুষের দেহে প্রকাশ পেয়ে লীলা করেন – যাঁর হয় তিনি লীলা দেখেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব পরাবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা (অগ্নিতত্ত্ব) – এক।

আত্মিক একত্বই এর প্রমাণ। সর্বত্রই আগুন "এক।"

৯৩০। "ঈশ্বর তত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে।"

ব্যষ্টি "তুমি বাজীকরে চিনলে নাকো, সে যে ঘটের ভিতর বিরাজ করে।"

ভগবান মানুষের শরীরে প্রকাশ পান। তিনি তাঁর তত্ত্ব মানুষকে জানাবেন বলে – এইরকম কৃপা করেন।

আবার যাঁর শরীরে ভগবান এইরকম লীলা করেন – তিনি এই তত্ত্বকথা অপরকে বলেন। যেমন শুক, ঠাকুর ইত্যাদি।

বিশ্বব্যাপিত্ব "একত্বই ঈশ্বরত্ব, বা ভগবানত্ব, বা ব্রহ্মত্ব।"

ঈশ্বর, ভগবান, বা ব্রহ্ম – "স একঃ"।

বাকী প্রশ্নটা, শুধু ষড়ৈশ্বর্যের ?

ঠাকুর বলতেন "আমি অবতার" – অর্থাৎ ভগবান !

এঁদের কাছে "অবতার"ও যা "ভগবান"ও তা।

হাজরা মহাশয় – "ষড়ৈশ্বর্য কোথায় ?"

এই ষড়ৈশ্বর্যের অভাব ঠাকুরকে চঞ্চল করে তুলেছিল।

কথামৃতে পাওয়া যায় ঠাকুর বলছেন মাস্টার মহাশয়কে – "ষড়ভুজ !" – অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য।

হায়রে অবতার আর হায়রে পুরাণের ষড়ৈশ্বর্য। ধন্য, ধন্য শ্রীচৈতন্য – আর তাঁর ষড়ভুজ!

৯৩১। "মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ হন।"

ব্যষ্টি মানুষে – অবতারে, কখনও কখনও পূর্ণ প্রকাশ।

বিশ্বব্যাপিত্ব "পূর্ণ প্রকাশ" –একত্বে।

অবতারে "পূর্ণ প্রকাশ" – Cosmic Man – এটি ব্যষ্টি।

৯৩২। "তিনি তো আছেনই।"

ব্যষ্টি নির্গুণ – অলক্ষ্যে ও নির্লিপ্তভাবে।

৯৩৩। "শক্তিরই অবতার।"

ব্যষ্টি চৈতন্য অবতীর্ণ হন – মানুষের দেহে। যাঁর হয় তিনি দেখেন। এই চৈতন্যশক্তি লীলা করেন – এঁর লীলা হলো অপরের চৈতন্যশক্তি জাগ্রত করে দেওয়া। এই জাগ্রত করে দেবার দুটি উপায় – শাক্তী ও সাম্ভবী।

শাক্তী – অবতারের নিকট কেউ গেল – অবতারের দেহে ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশ পেল – অবতার অন্তরের জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা চালিত হয়ে তাঁকে ছুঁয়ে দিলেন। সেই লোকটির দেহে – আধার বিশেষে – চৈতন্যের অনুভূতি হল। ঠাকুর ছুঁয়ে দেওয়াতে স্বামীজির চেতন সমাধি হয়েছিল। শাক্তী আস্বাদন দেয়। স্থায়ী হয় না।

আবার অনেক ক্ষেত্রে শাক্তী প্রবেশ করতে পারে না – যেমন পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য (বেদান্তবাগীশ)। ঠাকুর ভাবে পণ্ডিত মহাশয়ের বুকে পা দিয়েছিলেন, কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কিছু হয়নি।

সাম্ভবী – মহানির্বাণ তন্ত্র বলেছেন – ব্রহ্মবিদ পুরুষ যদি মনে করেন আর এক জনের ব্রহ্মজ্ঞান হোক, তাহলে তার (সেই অপর ব্যক্তির) ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

– এ হয় না।

ব্রহ্মবিদের মনে কামনা ওঠে না। ব্রহ্মবিদ্ বেঁচে থাকে – তত্ত্বজ্ঞানে। ব্রহ্মবিদ্ অকর্তা, ভগবান কর্তা –"তুমি তুমি" – তত্ত্বজ্ঞান। ব্রহ্মবিদের দেহেতে ভগবান অবতীর্ণ হয়ে লীলা করেন – ব্রহ্মবিদ্ দেখেন। তাই ঠাকুর বলছেন – "আমি মন্ত্র দিই না।" এই ব্রহ্মবিদ্, তত্ত্বজ্ঞানী কখনও মন্ত্র দেন না – দিতে পারেন না। এই ব্রহ্মবিদ্ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের যদি কেউ সঙ্গ পায়, তাহলে তার আত্মিক স্ফুরণ আপনা হতে হয়। এই হলো প্রকৃত সাম্ভবীর রূপ। ঠাকুরের যুগের অদ্ভুতত্ব!

এই আত্মিক স্ফুরণ প্রধানত স্বপ্নে হয়। স্বপ্ন মানুষের অন্তরে হয়। অন্তরে অন্তর্যামী নারায়ণ। তিনি অন্তরে স্ফুরিত হচ্ছেন – স্বপ্নে। ঠাকুরের "স্বপ্নসিদ্ধ"। "জাগ্রতও যেমন সত্য – স্বপ্নও তেমনি সত্য।"

স্বপ্নে অনুভূতি হচ্ছে – যার হচ্ছে, তার সন্দেহ হয় না। প্রথম প্রথম একটু গোলমাল ঠেকে, কিন্তু পরে আর কিছু সন্দেহ থাকে না।

৯৩৪। "ঋষি - মুনিরা"

ব্যষ্টি "ঋষি ও মুনি দেখতে পাওয়া যায়। না দেখলে ফারাক বুঝতে পারা যায় না। মুনিকে ব্রহ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করলে বলেন "আমি জানি না"। ঋষি চৈতন্যের কথা বলেন। মুনি পৃথিবীর – ঋষি আকাশের – আগম – আর নিগম।

৯৩৫। "তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্য সাক্ষাৎকার করেছিলেন।"

ব্যষ্টি "আমি" তখন চৈতন্যে পরিণত।

৯৩৬। "ইনি গম্ভীরাত্মা।"

ব্যষ্টি মাস্টার মহাশয়ের অন্তরে প্রকাশ। একজন ভক্ত ছেলে বয়সে (১৪ বছর) স্বপ্ন দেখেছিল। পাঁচতলা সোজা ঘুরানো সিঁড়ি (Spiral Stair case)। মাস্টার মহাশয়ের হাত ধরে ঐ ছেলেটি পাঁচতলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনে বৃহৎ বারান্দায় পৌঁছল। মাস্টার মহাশয় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ঐ ছেলেটি বারান্দা দিয়ে একটি বৃহৎ ঘরে প্রবেশ করল। ঘরের শেষ ভাগে ঠাকুর বসে আছেন। ছেলেটি ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসল।

স্বপ্ন ভেঙে গেল।

পাঁচতলা সিঁড়ি – পঞ্চমভূমি। বৃহৎ বারান্দা – ষষ্ঠভূমি। বৃহৎ ঘর – সহস্রার। ঠাকুর – ভগবান। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসা – এক হয়ে যাওয়া। মাস্টার মহাশয় – শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত। এই স্বপ্নে কথামৃত পড়ার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। স্বপ্নের আরও অনেক অর্থ আছে – কথামৃতের রূপ তার মধ্যে একটি মাত্র।

এই স্বপ্নটি অন্তরে প্রকাশের দৃষ্টান্ত।

৯৩৭। "বই শাস্ত্র এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়।"

ব্যষ্টি বই শাস্ত্রে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানের কৃপায় ভগবান দর্শন ও ভগবান লাভ। "ঈশ্বর যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন তবে মুক্তি।"

৯৩৮। "তখন নিজে কাজ করতে হয়।"

ব্যষ্টি তুমি হাজার চেষ্টা কর "তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না।" চুপ করে বসে থাকার চেয়ে কিছু করা ভাল। ভগবানকে ডাক – তিনি কি করবেন আর না করবেন – সে বিচার দরকার নেই।

৯৩৯। "একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল।"

ব্যষ্টি চিঠি – সংবাদ। ভগবান অবতীর্ণ হবেন – এ সংবাদ পাওয়া যায়। ঠাকুরের

বাবা গয়াধামে স্বপ্ন দেখেছিলেন। রঘুবীর (ঠাকুরের বাড়ির গৃহদেবতা– শালগ্রাম শিলা) বলছেন, "আমি তোর ছেলে হয়ে জন্মাবো।"

শ্রীকৃষ্ণ, যীশু ও শ্রীচৈতন্যের জীবনে এ কাহিনী পাওয়া যায়।

৯৪০। **"কুটুম্ব বাড়ি।"**

ব্যষ্টি মায়ার রাজ্য – জগৎ সংসার – আর, দেহও বোঝায়।

৯৪১। **"তত্ত্ব"**

ব্যষ্টি ঈশ্বরলীলা – লীলাকাহিনী।

৯৪২। **"কি কি জিনিস লেখা ছিল।"**

ব্যষ্টি যা লীলা হবে তার বিবরণ – হয়েই আছে (Predestined).

৯৪৩। **"কর্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠি খোঁজা আরম্ভ করলেন।"**

ব্যষ্টি আত্মিক স্ফুরণ – সাধনের অনুভূতিসমূহ।

৯৪৪। **"অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজলে"**

ব্যষ্টি দেহের মধ্যে অনেকজন আছেন – খুঁজতে গিয়ে সকলে মিলে এক হলো।

৯৪৫। **"শেষে পাওয়া গেল"**

ব্যষ্টি ভগবান দর্শন।

৯৪৬। **"তখন আর আনন্দের সীমা নেই।"**

ব্যষ্টি ব্রহ্মানন্দ।

৯৪৭। **"কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন"**

ব্যষ্টি দেহের মধ্যে ভগবান অবতীর্ণ হলেন – চিঠি দেখতে পাওয়া যায়। পিয়ন চিঠি নিয়ে এসেছে – চৈতন্যের নামে চিঠি – শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নন – অখন্ড চৈতন্য। একজন ভক্ত এরকম দেখেছেন। ইনি অপর ব্যক্তি যাঁকে যন্ত্র করে ঠাকুর লিখছেন – সে (স্বপ্ন-দ্রষ্টা) যন্ত্র নয়। অপরে তোমার বিষয় দেখলে বেশি জোর ধরে। এইটি ঠাকুরের নূতন দান। তাই ঠাকুর বলে গেছেন – "তোমার কথা শুনবে কে?" তিনি অপরকে তাঁর নিজের ভেতর থেকে সাক্ষাৎকার হয়ে জানিয়ে দেবেন, তবে সে নেবে।

৯৪৮। **"আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে।"**

ব্যষ্টি ভগবানের লীলা দেখছেন – নিজের দেহেতে।

৯৪৯। **"পাঁচ সের সন্দেশ"**

ব্যষ্টি আত্মিক স্ফুরণ – ভাগবত।

৯৫০। **"কাপড়"**

ব্যষ্টি দেহ – অবতারের দেহ – "মানুষ-রতন"।

৯৫১। "তবে তো বস্তুলাভ!"

ব্যষ্টি ঈশ্বর বস্তু – আত্মা। হবে কবে? এজন্মে না বহুজন্মের পর?

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বেই প্রকৃত "বস্তুলাভ।" ব্যষ্টির "বস্তুলাভ" – আত্মা-সাক্ষাৎকার ব্যষ্টিতে আবদ্ধ। "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" না হলে কিছুই হলো না – ঠিক মরুপথে অর্ধেক এসে নদী শুকিয়ে গেল।

৯৫২। পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।"

ব্যষ্টি পাঁজিতে – দেহেতে। বিশ আড়া জল – আত্মা, ভগবান, সগুণ, নির্গুণ ইত্যাদি। দেহেতে ভগবান আছেন বোঝবার জো নেই, জানবার যো নেই। দেহকে কাটা যাক – ভগবান বেরোবে না। তিনি কৃপা করে যে দেহে প্রকাশ পান – সেই জানে, দেখে, কথা কয়, আরও কত কি!

৯৫৩। "এক ফোঁটাও পড় – কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না।"

ব্যষ্টি হাজার হাউ চাউ কর, দেহে ভগবান, দেহে ভগবান ব'লে কিন্তু যতক্ষণ না দেহ থেকে আত্মা সংকলিত হয়ে আত্মাসাক্ষাৎকার হয় – ততক্ষণ ওসব কথার কোন মূল্য নেই। "আত্মাসাক্ষাৎকার হলে তবে সব সন্দেহ যায়।"

৯৫৪। "শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে।"

ব্যষ্টি শকুনি – বিষয়াসক্ত মন। মনের বাস কপালে কিন্তু দৃষ্টি, লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে।

৯৫৫। "দেখ ওর (গিরীশের) খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।"

ব্যষ্টি জন্মান্তরীন সংস্কার – প্রারব্ধ – অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ – ভৈরব – ঠাকুর দেখেছিলেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে প্রারব্ধের স্থান নেই। বাস্তব – Heredity. আছে – ঋতং বা অনুভূতি। একের হলে হবে না – সর্বজনীন হওয়া চাই।

১১-০৩-১৮৮৫

রাজপথ

৯৫৬। "এই একটি (দেহী?) ও একটি (জগৎ?)।"

ব্যষ্টি দ্বৈতবাদ – আমি আর ভগবান – বিলাস। দুই থাকলে তবে ভক্তি, ভাব, মহাভাব – প্রেম – রসাত্মক।

১১-০৩-১৮৮৫

গিরীশ মন্দির

৯৫৭। "সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো; গণেশগর্জি;"

ব্যষ্টি দৃষ্টি অন্তরে আবদ্ধ – তার বাহ্য প্রকাশ। জড় ভরত আর দত্তাত্রেয়ের মতন।

এদের অবতরণ হয়নি।

বিশ্বব্যাপিত্ব "সিদ্ধি" – একত্ব। প্রমাণ দেবে জগতের নরনারী সিদ্ধ পুরুষকে, তাঁর চিদ্‌ঘনকায় রূপ, অন্তরে দেখে। বিশ হাজার হলেও হবে না – সংখ্যাতীত হওয়া চাই।

৯৫৮। **"মানুষে অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে ?"**

ব্যষ্টি সকলকে ভাগবত কাহিনী – অবতার বুঝিয়ে দেন।

তাঁকে দেখে, তাঁর ভাগবত কথা অপরে বুঝতে পারে। যুগের আদর্শ পুরুষ – অবতার।

বিশ্বব্যাপিত্ব অবতারের আবশ্যক নেই – স্বামীজীর কথাই ঠাকুর স্বীকার করছেন।

৯৫৯। **"হাঁ হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বোঝাবেন।"**

ব্যষ্টি যাকে অন্তর্যামীরূপে বোঝান – তবে সে হল "কোটিতে গুটি"। এই হলো পূর্ণ। এর আংশিক বিকাশ আছে। এখানে সচ্চিদানন্দগুরু ও স্বপ্নসিদ্ধের কথা। ঠাকুরের যুগ। যুগের নতুন প্রথা (সন্দেশ) – গুরু সচ্চিদানন্দ – তিনি স্বপ্নে দেখা দিয়ে শিক্ষা দেন।

৯৬০। **"দেখ এগুলো আমার ভাল লাগছে না।"**

ব্যষ্টি বিকারে রোগীর প্রলাপ – আমি এক জালা জল খাব রে। পাঁচ সের চালের ভাত খাব রে।

৯৬১। **"বিচার আর কি করবো ?"**

ব্যষ্টি অনুভূতি না হলে বুঝতে পারা যায় না।

৯৬২। **"তাও বটে – আবার তাও বটে।"**

ব্যষ্টি অস্তি – নাস্তি – সগুণ – নির্গুণ–সাকার,আকার, নিরাকার – তাছাড়া আরো কত কি।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বই একমাত্র ধর্ম – সত্য –

"ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি"

এ, ও, তা, সে, রফা নেই।

৯৬৩। **"নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়।"**

ব্যষ্টি ভক্তকে দেখে ভক্তির উদ্দীপন – শেষে নির্গুণে লয়।

স্বামীজীর অখণ্ডের ঘর তাও দেখাচ্ছে – আবার আদ্যশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ তাও দেখাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপিত্ব Self-creation

প্রত্যেকেই "রাম"—তা হলে প্রত্যেক মানুষের বেলায় হওয়া উচিত – শুধু একা নরেন্দ্রকে দেখে কেন?

৯৬৪। **"তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন।"**

ব্যষ্টি আত্মার মধ্যেই জগৎ।

বিশ্বব্যাপিত্ব আমিই সমস্ত মনুষ্যজাতি। মনুষ্যজাতিই প্রমাণ দেয়। প্রমাণের সার্থকতা বেদে – "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।"

৯৬৫। **"তবে চৈতন্য লাভ না করলে চৈতন্যকে জানা যায় না।"**

ব্যষ্টি বেদান্ত বা আত্মার সাধন ও অনুভূতির কথা।

চৈতন্য – আত্মা। এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের পর তত্ত্বজ্ঞান, আবার তত্ত্বজ্ঞানের পর 'অন্ধকারে চীনে দেশলাইয়ের লাল আলো' নয় – এ' অদ্বৈত', 'চৈতন্য' নয়।

চৈতন্যকে জানা যায় না – বিজ্ঞানীর অবস্থা – আত্মা, আত্মার মধ্যে জগৎ – বিশ্বরূপ, বীজবৎ – সেই বিরাট বিশ্ব বীজে পরিণত, স্বপ্নবৎ – 'জড়' সমাধি।

আত্মা কি? এই জানা।

বিশ্বব্যাপিত্ব আত্মা – এক।

প্রমাণ? –

এ পর্যন্ত মনুষ্যজাতির দরবারে – প্রমাণ নেই।

বেদের "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" -- Academical Intellectualism. – বাস্তব উদাহরণের অভাবে।

আমি – এক।

সংখ্যাতীত নরনারী আমার চিদ্‌ঘনকায় রূপ অন্তরে দেখে – আত্মিক একের বাস্তব প্রমাণ – concrete example। আত্মা এক – এর প্রমাণ আর এই চৈতন্য – বাইরে বহু – অন্তরে এক।

৯৬৬। **"চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়।"**

ব্যষ্টি মন – সপ্তমভূমিতে।

৯৬৭। **"কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না।"**

ব্যষ্টি মন – ষষ্ঠভূমিতে, হরিপাদপদ্মে।

৯৬৮। **"ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয় কথা শুনলে কষ্ট হয়।"**

ব্যষ্টি মন পঞ্চমভূমিতে।

৯৬৯। **"দেখেছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়।"**

ব্যষ্টি আলোচনা, যুক্তি, তর্ক, কল্পনা ইত্যাদির দ্বারা জানা – অর্থাৎ এসবের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। মানুষ কল্পনায় মনে করে ভগবান এই রকম "সে কিন্তু নিছক

কল্পনা”।

“ঈশ্বর বস্তু” – সাক্ষাৎকার করা যায় – সচ্চিদানন্দগুরু দেখিয়ে দেন।

৯৭০। **“তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়।”**

ব্যষ্টি ধ্যানে কোষ মুক্ত হয় না। মন শুধু লয়ের দিকে যায় – “জড়” সমাধি। দেহেতে ভগবানের লীলা কিছু বোঝা যায় না – মায়ার পূর্ণ রহস্য ভেদ হয় না। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, পুরী মহারাজ। পুরী মহারাজ জানতেন না – আদ্যাশক্তি কি, সচ্চিদানন্দগুরু কি, ভগবান দর্শন কি – তবে, তাঁর ‘জড়’ সমাধি হতো, অর্থাৎ মন অখণ্ডে লীন হয়ে যেত।

তা বলে এ সহজিয়া বা ব্রহ্মবিদ্যা নয়। বসতে হবে ধ্যানে, তবে মন অখণ্ডে লীন হবে! স্মরণ, মনন মাত্রই দেহেতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ – এ তা নয় । ঠাকুরের, চৈতন্যদেবের, মুহুর্মুহু সমাধির ন্যায় নয়।

৯৭১। **“আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন – সে এক।”**

ব্যষ্টি তিনি যদি দেখিয়ে দেন – আপনা আপনি দেহেতে আত্মিক স্ফুরণ হয় – যার হয় সে দেখে মাত্র।

আত্মিক স্ফুরণ – পঞ্চকোষ আর নানারকম অনুভূতি – সচ্চিদানন্দগুরু লাভ – আত্মা সাক্ষাৎকার – আত্মার সাধন – পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান – তত্ত্বজ্ঞান – অবতারতত্ত্ব।

বিশ্বব্যাপিত্ব জগতের মনুষ্যজাতি “তোমায়” অন্তরে দেখে বলবে,– “এই হলো দেখিয়ে দেওয়া।” ষষ্ঠভূমি – আজ্ঞাচক্র থেকে কথা – “মহামায়ার জগৎ বড় হিজিবিজি” – Self Illusion.

মানুষই – আত্মা (The Universal Self in the shape of a living person), ভগবান, ব্রহ্ম।

ঠাকুরের “তিনি” – যেন দূরের লোক।

স্বামীজীর, – “বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।” অবশ্য এই বহুরূপের মধ্যে স্বামীজী নিজেও আছেন আর “আমি”ও আছি। আর আছে একটা সুদূর “একত্বের” মিহি সুর। কিন্তু প্রমাণের অভাব–Academical and Intellectual।

আমার “আমি” – মনুষ্যজাতি প্রমাণ দিচ্ছে – “আত্মা, ভগবান, ব্রহ্ম।”

Thesis – ঠাকুর।

Antithesis – স্বামীজী।

Synthesis – আমি।

চিদ্-ঘন-কায় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ – সর্বভূতের অন্তরে – "বিভুরূপে এক", আর ইনিই হলেন – "স উত্তমঃ পুরুষঃ।"

৯৭২। "এর নাম অবতার।"

ব্যষ্টি অবতারতত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানের পর দেখতে পাওয়া যায় – বাইরে নয়, দেহের মধ্যে। আকাশ থেকে ঋষি পুরুষ নেমে এসে বলেন "চৈতন্য শীঘ্র অবতার হয়ে আসছেন।" তারপর চৈতন্য-সাক্ষাৎকার – সহস্রারে দপ্ করে দীপকের লাল আলো জ্বলে ওঠে। তারপর চৈতন্যের অবতরণ। ১ম – সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত – দপ্ করে আলো – জ্যোতি। ২য় – সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত – জ্যোতি –এও দপ্ করে। দেখতে পাওয়া যায়। এরপর দেহেতে মানুষের মধ্যে "মানুষ-রতন" – পরম বৈষ্ণব হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন। যিনি দেখছেন তাঁর হাতের চেটোগুলি কর্ কর্ করছে।

বিশ্বব্যাপিত্ব ওপরের অবতারতত্ত্ব – আমার নিজস্ব অনুভূতির কথা – জগৎ জানে না – অবতার কি, আর কাকে বলে।

ধর্ম মানে যোগজ অনুভূতি – "ঋতং"।

এই হলো অবতারের যোগজ অনুভূতি।

ঠাকুর ব্যষ্টির "মানুষ রতন" দেখা ছাড়া আর কিছুই বলেননি।

স্বামীজীর অবতার – আমেরিকার লেকচার – "শাক্তী" করা। "শাক্তী" স্থায়ী ফল দেয় না – A kind of temporary mesmerism।

আমার জীবনে আমি শাক্তীর বহু উদাহরণ দেখেছি। রাস্তার রাহীকে ডেকে শাক্তীর দ্বারা সমাধিস্থ করেছি – দুঘন্টা পরে তার চৈতন্য হয়। বছর তিনেক পরে সে বিবাহ করে সংসারী হয়েছে। অবশ্য বিবাহের দিন আমাকে প্রণাম করে বিবাহ করতে গিয়েছিল। এ ছোকরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, শিক্ষিত, আর 'সন্তদাস' বাবাজীর শিষ্য। এ ছাড়া আমি শাক্তী করে বহু উদাহরণ নিজের জীবনে দেখেছি – শাক্তী temporary, not everlasting।

৯৭৩। "তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন।"

ব্যষ্টি দেহের মধ্যে তিনি এই লীলা করেন- যাঁর দেহে হয় তিনি দেখেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব "মানুষলীলা" – বিশ্বব্যাপিত্বেই এর প্রকৃত (Real) রূপ। আমার মানুষ রূপ আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তরে ফুটে উঠছে। তারা সেই লীলা দেখছে আর জগৎকে জানাচ্ছে।

৯৭৪। "যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী"

ব্যষ্টি নির্গুণ আর সগুণ।

৯৭৫। "কালী আদ্যাশক্তি।"

ব্যষ্টি দেহ।

৯৭৬। "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।"

ব্যষ্টি নির্গুণ ব্রহ্ম ও মায়া এক সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে। নিত্য ও লীলা দুই-ই অনাদি – শাশ্বত।

৯৭৭। "ওকেই শক্তি, ওকেই কালী, আমি বলি।"

ব্যষ্টি ঠাকুর ব্রহ্ম ও শক্তি দুই জড়িয়ে – এক ক'রে, কালী বলেন।

৯৭৮। "না, ইদিক উদিক – দুদিক রাখতে হবে,"

ব্যষ্টি তোমাদের এসব হবে না। ত্যাগ – জোর করে ছাড়া নয়, আপনা হতে ছাড়া – আপনা হতে ছাড়বে তবে।

৯৭৯। "মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)!"

ব্যষ্টি ভগবানের উপর ভক্তের রাগ – এও লীলা। ঠাকুর বাঁশ কাঁধে করে দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরের সামনে বারান্দায় – এদিক যাচ্ছেন ওদিক যাচ্ছেন – ভাব এই, ভগবানকে মারবেন।

ভগবান অতি আপনার, অতি প্রিয়, তাঁর উপর রাগ হয়েছে, তাই তাঁকে মারা হবে।

ঠাকুর রামলালাকে মেরেছিলেন – এ উপমা বিহীন ভগবানে প্রেম – ভক্ত ভগবানের লীলা।

৯৮০। "যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই।"

ব্যষ্টি ভগবানকে পেলে সব চুপ।

৯৮১। "নিমন্ত্রণ বাড়ি"

ব্যষ্টি জগৎ।

৯৮২। "যতক্ষণ লোক খেতে না বসে"

ব্যষ্টি যতক্ষণ মন দেহেতে আবদ্ধ না হয়।

৯৮৩। "লুচি তরকারী"

ব্যষ্টি সাধনের অনুভূতিসমূহ।

৯৮৪। "অন্য খাবার"

ব্যষ্টি আত্মা সাক্ষাৎকার।

৯৮৫। "দই"

ব্যষ্টি সহস্রার।

৯৮৬। **"সুপ্ সাপ্"**

ব্যষ্টি বিলাস – নানাপ্রকার সমাধি।

৯৮৭। **"নিদ্রা"**

ব্যষ্টি স্থিত সমাধি।

৯৮৮। **"ঐ একটা আলো আসছে দেখতে পাচ্ছি, – কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আলোটা আসছে এখনও বুঝতে পারছি না।"**

ব্যষ্টি ভবিষ্যৎ বাণী। চৈতন্য আবার মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হবে – "পাঁচসের সন্দেশের" কথা শোনাতে – ভাগবত কাহিনী প্রকাশ করতে।

ঠাকুরের – "অসংখ্য অবতার", আর এই অবতারলীলা নিত্য।

বিশ্বব্যাপিত্ব "আলো"– বিশ্বব্যাপিত্ব – Oneness – "মহাযোগে সমুদয় একাকার হইল দেশ কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল।" ঋষিদের সেই সনাতন সত্য – "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।" স্বামীজীর – "One and Oneness", "The Universal Religion of Mankind."

শ্যামপুকুর

২২-১০-১৮৮৫

৯৮৯। **"যেমন পাঁকাল মাছ – পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নেই।"**

ব্যষ্টি পাঁকাল মাছ – আত্মা–দেখতেও কতকটা বটে। পাঁকে থাকে – দেহেতে। কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই – দেহ ও আত্মা আলাদা।

বিশ্বব্যাপিত্ব প্রকৃত পাঁকাল মাছ – বিশ্বব্যাপিত্বে। বেদ তারস্বরে জগৎকে জানিয়ে দিচ্ছে –

"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।।"

একত্বই নির্লিপ্ততা – দ্বন্দ্বহীন।

৯৯০। **"পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে"**

ব্যষ্টি আত্মা দেহেতে মিশে আছে – দেহের সাধারণ অবস্থা।

৯৯১। **"কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই"**

ব্যষ্টি কপিবৎ মহাবায়ু তড়াং ক'রে সহস্রারে উঠে গেল।

৯৯২। **"আর গায়ে জল থাকে না।"**

ব্যষ্টি দেহ আর আত্মা আলাদা হ'য়ে গেল।

এসব অবস্থা হওয়া আর এই অবস্থায় থাকা – নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি

অবতারাদির হয় – যেমন ঠাকুরের। এই হলো ব্যষ্টিতে ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণ বিকাশ।

৯৯৩। "ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়"

ব্যষ্টি ভক্তিলাভ – দেহের মধ্যে "মানুষ-রতন"-কে দেখলে, তবে বুঝতে পারা যায় – পূর্ণ ভক্তি লাভ হয়েছে।

এ ত' নিজের কথা। অপরে কি ক'রে জানবে?

"যারে দেখি কৃষ্ণকথা মনে উদয় হয়।
কৃষ্ণভক্ত সেই জন জানিবে নিশ্চয়।।"

যদি ঠিক ঠিক ভক্তিলাভ হ'য়ে থাকে, অপরে তাঁকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে পাবে।

ভক্তিলাভের যোগৈশ্বর্য – একবার ভগবানের নাম শুনলে তার সমাধি হবে আর শ্রীমুখে সচ্চিদানন্দ অবস্থা প্রকাশ পাবে। তাই ঠাকুর বলছেন, "বাবু, সচ্চিদানন্দ লাভ না হ'লে কিছুই হ'লো না।"

সংসার করা যায় – বেঁচে থাকা – লীলা দেখবার জন্য – নিকষা।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে "ভক্তির" স্থান সংকুলান হয় না।

আছে একত্ব –
এই একত্বকে জবাবদিহি করতে হয় না।
মানুষ-রতনের প্রমাণ অবতারতত্ত্বে নয়।
মানুষ-রতনের প্রমাণ – "স উত্তমঃ পুরুষঃ" – পুরুষোত্তম্।
– প্রমাণ দেয় – মনুষ্যজাতি অন্তরে দেখে – বাস্তব – "ঋতং"।
গীতাকার "পুরুষোত্তমের" প্রমাণ দিতে পারেন নি!
স্বামীজী বলছেন " সেই শ্রীধরই ধন্য যিনি বলতে পেরেছেন –
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"।

শ্রীধরস্বামী তাঁর ভাগবতের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণ যে ভগবান, এর বেদোক্ত প্রমাণ দেননি।

অথচ ঋষিরা কোন অতীত যুগে এই প্রমাণের উল্লেখ ক'রে গেছেন- " স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ।"

আজ, সংখ্যাতীত নরনারী আমায় শোনাচ্ছে – ঋষিবাক্য কী অপূর্ব সত্য!
আমি অবাক হ'য়ে আমার জীবনের প্রতিমুহূর্তে শুনছি –
"তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।"

৯৯৪। " তেল মেখে"

ব্যষ্টি চৈতন্য লাভ ক'রে। তেল চৈতন্যের প্রতীক। চৈতন্য পূর্ণ। মধু প্রথম প্রতীক। তেল দ্বিতীয় প্রতীক।

৯৯৫। "তাই 'নির্জনস্থানে' দই পাত্‌তে হয়"

ব্যষ্টি নির্জনস্থান – ইন্দ্রিয়সমূহ স্থির হ'লে তবে দেহে নির্জন স্থান হয়। ভগবানকে ডাকলে আপনা হ'তে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয়। দই পাত্‌তে হয় – যোগে দেহ সমতাগুণযুক্ত হয়, – বায়ু স্থির হয় – কুম্ভক হয়।এসব যার হবার আপনা হ'তে হয়।

৯৯৬। "মাখন তুলতে হয়-"

ব্যষ্টি মাখন – আত্মা। তুলতে হয় – আপনা হ'তে হয়। সচ্চিদানন্দগুরু দেখিয়ে দেন তা নইলে চিনবে কি ক'রে? " কেউ এসে বলবে, এই – এই –"

৯৯৭। "মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তাহলে জলে মিশবে না, নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসতে থাকবে।"

ব্যষ্টি আত্মা সাক্ষাৎকারের পর যদি মহাকারণে লয় না হ'য়ে দেহ থাকে – তাহ'লে দেহ ও আত্মা পৃথক হয়ে থাকে।

৯৯৮। "নির্জনে জ্ঞানলাভ ভক্তিলাভ ক'রে"

ব্যষ্টি জ্ঞানলাভের পর ভক্তিলাভ। জ্ঞানলাভ – পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর। ভক্তিলাভ – পরাভক্তি – পাকাভক্তি – দেহেতে মানুষ-রতনকে দেখা।

বিশ্বব্যাপিত্ব এই "জ্ঞানলাভ ভক্তিলাভ" মনকে প্রবোধ দেওয়া।

বিশ্বব্যাপিত্বেই – জ্ঞান। মনুষ্যজাতি এর প্রমাণ সমেত এই জ্ঞান দান করে – নিজেকে – জগৎকে আর যাঁকে দেখে (Absolute equality – সূর্যমন্ডলস্থ সুবর্ণময় পুরুষ, আবার জীবন্ত মানুষ) তাঁকেও। এই জীবন্ত মানুষটির অভাবমুখ চৈতন্য – কেউ অন্তরে দেখে বললে তবে জানতে পারে।

ভক্তিলাভ – কল্পনার জীবন – শেষে পাগলামি।

পূজনীয় মাস্টার মশাইয়ের স্বামীজীর সঙ্গে কথা (Argument)- "যখন যে যেটা দেখে, তখন সেটা তার পক্ষে সত্য।"

"পক্ষ" – যথা দ্বিতীয়পক্ষ, তৃতীয়পক্ষ, চতুর্থপক্ষ ইত্যাদি।

জগতের নরনারী অনেকে পক্ষ দেখেছে।

কথামৃতে মাস্টার মশাই অনেকের "দ্বিতীয় পক্ষ" দেখিয়ে গেছেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের একটি পক্ষ – উদাহরণ,

মথুর বাবু দক্ষিণেশ্বর থেকে জুড়ি ক'রে ঠাকুরকে নিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাচ্ছেন। গাড়ি চিৎপুর রোডে। Wellar জুড়ি বোল্ট (Bolt) করেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে

ঘোড়া এলোমেলো ভাবে ছুটেছে। গ্যাস পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেই গাড়ি চুরমার।

রাস্তার লোক হৈ হৈ করছে। মথুর বাবুর চেষ্টা – কি ক'রে ঠাকুরকে বুকে নিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বেন।

আর ঠাকুর ?

ঠাকুর কি করছেন ?

ঠাকুর চোখবুজে দেখছিলেন – তিনি সীতা, মথুরবাবু রাবণ। রাবণ সীতা হরণ ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে। জটায়ু এসে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করছে !

রাস্তার লোক গাড়ি ধ'রে থামিয়ে দিয়েছিল।

ঠাকুর দেখছিলেন – রাবণ-জটায়ু যুদ্ধ – আর তিনি সীতা !

তার কোনটা পক্ষ আর কোনটা সত্য ?

নয় সহস্র বৎসর আগে (স্বামীজীর মতে ন'হাজার, European Scholar-দের মতে আট হাজার) ঋগ্বেদে ঘোষিত হয়েছে, –

"একং সৎ"। আর সেই সত্য হলো – বহুত্বে একত্ব –

আজ প্রমাণ সমেত জগতে দেখতে পাচ্ছি।

"জ্ঞানও নয় আর ভক্তিও নয়।"

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" – "আনা-উল্ হক্" –"অহং ব্রহ্মাস্মি"।

৯৯৯। " **দেহে দেহবুদ্ধি নাই।"**

ব্যষ্টি কাম নেই।

১০০০। **"সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন"**

ব্যষ্টি "রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।" ঠাকুর আট মাস একঘরে মা- ঠাকরুনের সঙ্গে শুয়েছিলেন, এ শুধু ঠাকুরে সম্ভব। এ পরীক্ষা পৃথিবীতে অপর কারোর জন্য নয়।

সন্ন্যাসী – নারীর ছবি পর্যন্ত দেখবে না।

নারী সামনে এলে সমাধিস্থ হ'য়ে যাবে।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বই – জীবন্মুক্তের প্রমাণ।

এই প্রমাণ জগতে এই প্রথম।

১০০১। **"কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা।"**

ব্যষ্টি সহস্রারে পর্দা উঠে গেলে, তবে সম্পূর্ণ দেহবুদ্ধি যায়। পর্দা ওঠা দেখতে পাওয়া যায়।

১০০২। **"কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সেয়ানাই হওনা কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।"**

ব্যষ্টি আধার ছোট হ'য়ে যেতে পারে।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মত্ব বা একত্ব

– সর্বজনীন ও সর্বকালীন। বিশ্বব্যাপিত্বে কাজলও নেই আর কাজলের ঘরও নেই।

১০০৩। "স্ত্রীলোক দেখে জনক রাজা হেঁটমুখ হ'য়ে চোখ নীচু করেছিলেন।"

ব্যষ্টি জনক রাজা ঠিক করেছিলেন।

১০০৪। " হে জনক ! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয় !"

ব্যষ্টি ভৈরবী ভুল বলছেন।

১০০৫। "পূর্ণ জ্ঞান হ'লে পাঁচবছরের ছেলের স্বভাব হয়।"

ব্যষ্টি এ শুধু ঠাকুরের হয়েছিল। মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলছেন, – " গোবিন্দ, তুমি আজ আমার জীবন রক্ষা করেছ, তা নইলে নারীস্পর্শে আমার দেহ থাকতো না।"

বিশ্বব্যাপিত্ব পূর্ণজ্ঞান – একত্ব – নর-নারী অভেদ।

ব্যষ্টির পঞ্চমভূমিতে অনুভূতি – অর্ধনারীশ্বর মূর্তি – নিজেকে অর্ধনারীশ্বর রূপে – নিম্নার্ধ নারী – ঊর্ধ্বার্ধ পুরুষ দেখা – " তাই সচ্চিদানন্দ প্রথমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করলেন" – অভেদ জ্ঞানের সূত্রপাত।

সংখ্যাতীত নারী আমায় না দেখে – এমন কি আমার কথা না শুনে – আমার কাছে না এসে – ঘরে বসে আমায় দেখে এই আত্মিক অভেদের কথা আমাকে ও জগৎকে জানিয়ে দিচ্ছে।

জগতে – রাজযোগ – তথা মধুবিদ্যার মহিমা প্রকাশ করছে।

১০০৬। "Steam Boat-এর মত।"

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরু – Steam Boat – স্বপ্নে দেখতে পাওয়া যায়।

১০০৭। " আবার কেউ কেউ একটি আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।"

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরুকে এইরকম অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্ব প্রতীকে নয় – বাস্তবে।

১০০৮। "ভক্তি মেয়ে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে।"

ব্যষ্টি অবতারতত্ত্ব।

ভ্রূ'র মধ্য দিয়ে মন সহস্রারে গিয়ে ব্রহ্মতালু থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত অন্তঃপুরে জ্যোতিদর্শন। পুনরায় ব্রহ্মতালু থেকে কটিদেশ পর্যন্ত অন্তঃপুরে জ্যোতিসমুদ্র। পরে অন্তঃপুরে মানুষ -রতন দর্শন।

১০০৯। "জ্ঞান বার বাড়ি পর্যন্ত যায়।"

ব্যষ্টি আত্মাসাক্ষাৎকারের পর মহাকারণে লয় হয়। অন্তঃপুরে প্রবেশ করে না।

নিগমে নামে না।

বিশ্বব্যাপিত্ব "বারবাড়ি" – বিশ্বব্যাপিত্ব – "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" – একত্ব।

"অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়,
পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য।" – এই আত্মার সাক্ষাৎকার। বিশ্বব্যাপী একত্বই – "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" – আত্মা-সাক্ষাৎকারের প্রমাণ।

"দু'তিন বছর আগে মা বাপে পরামর্শ ক'রে হিস্যে ফেলে" দিতে পারে – "আটাশে ছেলে" হয়ে যায় (Defective realisation) – একত্ব হয় না।

স্বামীজী – "Is Vedanta the Future Religion" শীর্ষক লেকচারে বলছেন –

"The hour comes when great men shall arise and cast off these kindergartens of religions and shall make vivid and powerful the true religion."

Vivid–They see my form within them.
Powerful–Irrespectively – having no opposition to bar me.
The true religion – "Religion is Oneness."

১০১০। "দেখ, না জানলেও কেউ না কেউ ব'লে দেয়।"

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরু শিক্ষা দেন – পথ দেখিয়ে দেন।

১০১১। "তিনি সাকার আবার নিরাকার।"

ব্যষ্টি 'সাকার' – সচ্চিদানন্দগুরু – ভাগবতীতনু – ইষ্ট – আবার উঁচু সাকার, বহু দেব- দেবী দর্শন।

'নিরাকার' – আত্মা – দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু বলবার জো নেই সঠিক আকার – শেষে লীন।

ভাগবতীতনু আত্মায় পরিবর্তিত হয় – ষোল আনা বুঝতে পারা যায়।

১০১২। " একবার এধার থেকে ওধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না – দ্যাখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই।"

ব্যষ্টি 'দণ্ড' – কুণ্ডলিনী। 'এধার থেকে ওধার' – মূলাধার থেকে সহস্রার।

আগমে দেহ ভেদ ক'রে কুণ্ডলিনীর সহস্রারে লয় হওয়া।

১০১৩। "আবার দণ্ড ওধার থেকে এধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল।"

ব্যষ্টি নিগমে সহস্রার থেকে নেমে মানুষ-রতন দর্শন।

১০১৪। "কিন্তু এটি ধারণা করা বড় শক্ত।"

ব্যষ্টি এরকম অনুভূতি সাধারণ মানুষের হয় না।

১০১৫। "সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন।"

ব্যষ্টি ভাগবতীতনু সাধকের ইষ্টমূর্তি ধারণ ক'রে দেখা দেন। যার যা ইষ্ট সে তাই দেখে। আবার কেউ বা বহু দেব- দেবীর মূর্তি দেখে – সেই এক ভাগবতী তনুই বহু মূর্তি ধারণ করছে।

১০১৬। "তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।"

ব্যষ্টি তুমি – আমি; আমি – তুমি।

১০১৭। "আবার কখনও দেখি কোন রঙই নাই।"

ব্যষ্টি নির্গুণ।

১০১৮। "ভক্তি – চন্দ্র; জ্ঞান – সূর্য।"

ব্যষ্টি ধ্যান সমাধিতে দুই–চন্দ্র ও সূর্য–দেখা যায়

১০১৯। "ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়।"

ব্যষ্টি "হ্যাঁ তা যায় বটে।" ঠাকুরের বেদান্তসাধন।

সাধন কুটিরে ঠাকুর ধ্যানে মগ্ন। সহস্রারে মন লয় হবে। ষষ্ঠভূমিতে – মায়ের মূর্তি। সে মূর্তি অতিক্রম করে মন আর যেতে চাইছে না।

১০২০। "কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন।"

ব্যষ্টি সমাধি হয় না – কোটিতে গুটি।

১০২১। "ধুনুরির হাতে প'ড়ে যখন তুঁহুতুঁহু (তুমি তুমি) করে, তখন নিস্তার।"

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা ক'রে ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে জীবন্মুক্ত করেন – তবে নিস্তার–'হাম্বা হাম্বা' – 'আমি আমি' থেকে।

১০২২। "যদি একান্ত 'আমি' না যাস্, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।"

ব্যষ্টি স্থিত সমাধি না হয়ে, জড় সমাধি হয়ে যে 'আমি' থাকে – সে আমি 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি', – পাকাভক্তি।

বিশ্বব্যাপিত্ব "দাস আমি"–একত্ব হয়নি।

একত্বে তথা ব্রহ্মত্বে – মনিব আর দাসের স্থান নেই।

এই "দাস আমি" – দ্বৈতবাদ – False hood.

১০২৩। "দাস আমি" –

ব্যষ্টি দাস্যভাব। হনুমানের দাস্যভাব। হনুমানকে দেখতে পাওয়া যায় – পূর্ণ দাস্যভাবে সিদ্ধ হ'লে।

১০২৪। "বিদ্যার আমি।"

ব্যষ্টি বিদ্যামায়া যখন ধারণ করে তখন 'বিদ্যার আমি'। বিদ্যামায়া ধারণ করেছে, – জানবে কি করে? দেখিয়ে দেন – দেখতে পাওয়া যায়। কমনীয় নারী মূর্তি। অপূর্ব শ্রী।

তুমি ধ্যানে মগ্ন। সেই নারী পিছন দিক থেকে তোমার বাহুতে নিজের বাহু দিয়ে তোমায় ধারণ করবে। নারীস্পর্শে তোমার হৃদয়ে কোনরকম চাঞ্চল্যভাব আসবে না। শুধু তৃপ্তি ও শান্তি। তুমি বুঝতে পারবে 'বিদ্যা' তোমায় আশ্রয় করলো।

১০২৫। "ভক্তের আমি।"

ব্যষ্টি মানুষ-রতনকে ভিতরে দেখলে তবে 'ভক্তের আমি'। শ্রীভগবানের ভক্তমূর্তি দেখলে তবে আমাতে ভক্তি বর্তাবে।

১০২৬। "পাকা আমি,"

ব্যষ্টি টকটকে লাল, খুব বড়, বাছা বোম্বাই লিচুর প্রকাণ্ড থোলো – দু'শো আড়াইশো হবে – তোমার হাতে এল – তুমি তাই নিয়ে চলেছ। তুমি এই লিচুর মতন পেকেছ – আর তাই নিয়ে চলেছ। তোমার 'আমি', বাছা বড় টক্টকে বোম্বাই লিচু।

১০২৭। "ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়।"

ব্যষ্টি তোমার এই বালকের অবস্থা হ'লে – অপরকে দেখিয়ে দেবে। যাঁর কাছে থাকেন, তাঁরাও জানতে পারেন।

বিশ্বব্যাপিত্ব প্রমাণ – ঈশ্বরলাভের – বিশ্বব্যাপিত্ব – একত্ব।

বেদ – " স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে"।

১০২৮। "তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না।"

ব্যষ্টি চেষ্টা ক'রে ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। ভগবানকে ডাকো। দেহে ভগবানের প্রকাশ হবে। রিপু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। দেহ পুড়ে ছাই হয়েছে – দেখতে পাওয়া যায়।

আত্মাসাক্ষাৎকার হ'লে দেহের ভিতরের অবস্থার পরিবর্তন হয়। নিম্নগামী বহির্মুখী মন ঊর্ধ্বগামী হ'য়ে রয়েছে – ঠাকুরের কথা, 'শুক সঙ্গীন চড়িয়ে চলেছে।'

১০২৯। "কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।"

ব্যষ্টি 'আত্মা যাকে বরণ করে তারই হয়।'

যোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হ'লে – তাঁরা ঊর্ধ্বরেতা হন। এই ঊর্ধ্বরেতা অবস্থা দেহেতে দেখতে পাওয়া যায়।

'সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হলো, ত' তাকিয়া পেল – ঠেসান দিয়ে বসবার জন্য।'

১০৩০। "তাদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয়।"

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরুর দেহে সাধন হয় – যার হয় সে দ্রষ্টা মাত্র।

১০৩১। "ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।"

ব্যষ্টি কবে পাওয়া যাবে – তার কিছু ঠিক নেই।

বিশ্বব্যাপিত্ব জীবদ্দশায় – এই একত্ব – ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরলাভ – তা নইলে –

'ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।”

“মহতী বিনষ্টিঃ” – পুনর্জন্ম নেই।

১০৩২। “বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হ’লে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?”

ব্যষ্টি ষষ্ঠভূমি – জ্যোতিদর্শন।

১০৩৩। “কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল,”

ব্যষ্টি যিনি ভগবান দর্শন করেছেন, তাঁর কাছ থেকে ভাগবত – দেহেতে ঈশ্বরের প্রকাশ কাহিনী – শুনতে হয়। এই শোনাতে দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হয়। পরীক্ষিৎ শুকের কাছ থেকে ভাগবত শুনেছিলেন। তাই পরীক্ষিতের মুক্তি।

১০৩৪। “শুনার চেয়ে দেখা ভাল,”

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা ক’রে যদি ভগবান্ দর্শন করিয়ে দেন, তা হ’লে তো আর কথাই নেই।

আত্মাকে দেহেতে দেখা – ষোল আনা সাধন – ভারি কঠিন – এও ‘কোটিতে গুটি’। “ঈশ্বর বস্তু সব আধারে ধারণা হয় না।”

সব আধারে – যুগে একটি আধারে।

১০৩৫। “ঘুম যায়!”

ব্যষ্টি এ অবস্থায় কিছুদিনের জন্য আদপে ঘুম হয় না।

দেহের অবস্থা – বিদেহ – তাই কষ্ট হয় না।

১০৩৬। “রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার ব’লে মানে নাই।”

ব্যষ্টি রামচন্দ্র – মানুষ–অবতার – চৈতন্য মানুষ-রতন হয়ে অবতীর্ণ। যাঁর ভিতর অবতীর্ণ হন্, তিনি এই অবতারলীলা দেখেন। তিনিই জানেন অবতার কি। “কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, কেউ ডাক্তারি করে, তারা আমায় অবতার বলবে – তবে আমি অবতার! তারা অবতারের জানে কি?”

মানুষের মধ্যেই – তিনি সগুণ অনন্ত, তিনি নির্গুণ অনন্ত, আবার চৈতন্যশক্তির অবতরণ। তাঁর পূর্ণ প্রকাশ – কোন কোন অবতারে। মানুষেই তাঁর প্রকাশ – আর কোন স্থানে এরূপ প্রকাশ নয়। অবতার দেখেন, দেহ সমেত তিনিই আছেন, আর কিছু নেই। অবতারের চারিদিকে – ঊর্ধ্বে, নিম্নে কিছু নেই – নড়বার স্থান নেই – খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভগবান তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য সমেত, ঐ অবতারের মধ্যে। একা অবতার স্থির হয়ে আছেন – আর কিছু নেই। ঠিক ছবির বিষ্ণু অবতার – আর দাঁড়িয়ে ঠাকুরের সমাধি।

১০৩৭। "শেষে যখন চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাশ ভ্রমণ করে দেখলে যে রামের হাত থেকে কোন রূপেই নিস্তার নাই – ভিতরে রাম, বাইরেও রাম।"

ব্যষ্টি ঠাকুরের – সচ্চিদানন্দ সাগরে 'আমি' রূপ লাঠি বা ঘট – অধঃ ঊর্ধ্ব জলে জল।

১০৩৮। "তখন নিজে ধরা দিলে, রামের শরণাগত হলো।"

ব্যষ্টি অহংকার চূর্ণ হলো। 'আমি' নাশ হলো।

১০৩৯। "রাম তখন তাকে ধরে, মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেল্লেন।"

ব্যষ্টি নিত্যে লয় হয়ে গেল – নিত্য।

১০৪০। "ভূষণ্ডি তখন দেখে যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে।"

ব্যষ্টি লীলায় প্রকাশ হল – লীলা।

১০৪১। "ঐটুকু বোঝা শক্ত, তিনিই স্বরাট, তিনিই বিরাট।"

ব্যষ্টি চৌদ্দ পোয়া মানুষের ভিতর এই বিরাট বিশ্বসংসার, ভগবান, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, নিত্য, লীলা, সব – তিনি যাকে বোঝাবেন সেই বুঝবে, জানবে, দেখবে।

বিশ্বব্যাপিত্ব মানুষ মাত্রই – এই রাম – Cosmic Man – অন্তরে। বাইরে – বহুত্বে একত্ব (১০৩৬ - ১০৪১)।

১০৪২। "যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।"

ব্যষ্টি নিত্যলীলা – অবিচ্ছিন্ন – দুই-ই সমানে আছে, থাকবে, আর ছিল।

বিশ্বব্যাপিত্ব "নিত্য" – আমার জীবন্ত রূপ।

– সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ – পরম ব্রহ্ম – Absolute equality (Plato)।

"লীলা" – আমার আত্মিক রূপ।

– সংখ্যাতীত নরনারী নিজেদের দেহের ভিতর দেখে – হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্ম – Abstract equality (Plato)।

১০৪৩। "এ কথা যে ওঁর Science-এ (ইংরাজী বিজ্ঞান শাস্ত্রে) নাই।"

ব্যষ্টি ইউরোপের কোনও মানুষের দেহে ভগবান অবতীর্ণ হননি। ভাষার মধ্যে 'আপ্ত' বাক্যের অভাবই যথেষ্ট প্রমাণ – ইউরোপের লোকেরা অবতারতত্ত্ব জানে না। মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে, যে ভাষার দ্বারা তিনি তাঁর নিজের পরিচয় দেন, তাকে 'আপ্ত' বাক্য বলে।

১০৪৪। "বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে।"

ব্যষ্টি ঈশ্বরীয় ধারণা যত বাড়ে, অনুভূতিও সেই পরিমাণ হয়।

বিশ্বব্যাপিত্ব "জ্ঞান" – এক জ্ঞান।

— বহুত্বে একত্ব — "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ"।

১০৪৫। **"সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়।"**

ব্যষ্টি এর একটু অনুভূতি, ওর একটু অনুভূতি — সব আংশিক — এতে সংশয় যায় না।

১০৪৬। **"যে গরু হুড় হুড় করে দুধ দেয়।"**

ব্যষ্টি পূর্ণাঙ্গ অনুভূতি — ষোল টাং — হলে, তবে সব সংশয় যায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব "ষোল টাং" — বিশ্বব্যাপী একত্ব।

— একত্বের প্রমাণ দেয় মনুষ্যজাতি — অন্তরে বাইরে দেখে। নিত্য আমরা প্রমাণ পাই।

১০৪৭। **"রোগ লেগেই আছে।"**

ব্যষ্টি 'আমি' রূপ ভবব্যাধি — সঙ্গেই আছে।

১০৪৮। **"সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ করতে হয়।"**

ব্যষ্টি এদের দেহে আপনা হতে সাধন হয় না। পাতাল ফোঁড়া শিব নয় — বসানো শিব — তাই বিবিদিষা।

১০৪৯। **"ঔষধ খেতে হবে।"**

ব্যষ্টি ধারণা করতে হবে।

১০৫০। **"আবার আহারের কট্ কেনা করতে হবে।"**

ব্যষ্টি পুরুষকার।

১০৫১। **"পথ্যের দরকার।"**

ব্যষ্টি সাধুসঙ্গ, সচ্চিদানন্দগুরু লাভ আর অনুভূতি।

১০৫২। **"বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।"**

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরু ভিতর ফুঁড়ে বেরোন — কোনরকম বাধা চলে না। জীবত্ব একপাশে সরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

১০৫৩। **"স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না।"**

ব্যষ্টি নারীদর্শনে দেহ অজ্ঞাতসারে যোগভ্রষ্ট হয়। মহাপ্রভু বলেছিলেন — "নারীস্পর্শে আমার দেহ থাকতো না"।

১০৫৪। **" যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল।"**

ব্যষ্টি ভগবান লাভ হলে নিষ্ক্রিয় অবস্থা হয়।

অজ্ঞাতসারে ডাক্তার স্বীকার করছেন, — ঠাকুর ভগবান।

বিশ্বব্যাপিত্ব "পরমহংস" — বহুত্বে একত্ব — প্রমাণ দেবে জগৎ —

তা নইলে gander — আবার চারিদিকে goose গজিয়ে উঠেছে।

পরম – সংখ্যায় বহু।

১০৫৫। "অহৈতুকী ভক্তি।"

ব্যষ্টি পাতাল ফোঁড়া শিব – নিত্যসিদ্ধ ব্যতীত অহৈতুকী ভক্তি হয় না।

১০৫৬। "তবে আমি যখন আসবো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।"

ব্যষ্টি একে বলে প্রেম – অবশ্য লক্ষণ মাত্র – তুমি আমার।

১০৫৭। "তিনি ত' অন্তর্যামী – সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন।"

ব্যষ্টি তিনি সচ্চিদানন্দগুরুরূপে দেখা দেবেন আর হাত ধরে নিয়ে যাবেন।

১০৫৮। "চাঁদামামা সকলেরই মামা।"

ব্যষ্টি ঈশ্বর সকলকার।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বে – Neither uncle nor aunt–আছি আমি – Oneness.

"Vedanta does not formulate universal brotherhood but Universal Oneness."

– Swami Vivekananda.

শ্যাম পুকুরের বাড়ীতে

২৫-১০-১৮৮৫

১০৫৯। "ও ইংরাজী পড়েছে, ওকে বলবার যো নাই আমাকে চিন্তা কর; তা আপনিই করছে।"

ব্যষ্টি চিত্তশুদ্ধি, ধ্যান, ধারণা – আপনা হ'তে হচ্ছে।

১০৬০। "অবতারকে দেখাও যা ভগবানকে দেখাও তা।"

ব্যষ্টি অবতারের চিন্তা – ভগবানের চিন্তা – ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের দরুণ আপনা হ'তে হচ্ছে। 'আসতে যেতে উদ্দীপনা।'

বিশ্বব্যাপিত্ব অবতার – ভগবান নন – প্রমাণের অভাব।

ভগবানের প্রমাণ – বহুত্বে আত্মিক একত্ব – "স একঃ"।

১০৬১। " যেখানে এখন ব'সে আছি, এইখানেই সব"।

ব্যষ্টি ঠাকুরের ভিতর ষোল আনা ভগবানের প্রকাশ। ঠাকুরই স্বরাট আর ঠাকুরই বিরাট।

এযুগে ঠাকুরের ভিতর আত্মা সংকলিত হয়েছে, আত্মার বিকাশ হয়েছে – আর কোথাও নেই। এক আত্মা – একস্থানে প্রকাশ পেয়েছে।

কেশববাবুও ঠিক এই কথা বলেছেন – "পৃথিবীতে পরমহংস মশায়ের মতন বড় লোক আর কেহ নাই।"

বিশ্বব্যাপিত্ব নিছক কল্পিত মন্তব্য – প্রমাণের অভাব। এই সব অমূলক কল্পনা – মানুষকে সত্যভ্রষ্ট করে।

"গুরুগিরি বেশ্যাগিরি" – ঠাকুরের শিক্ষা।

সকলেই উত্তরকালে গুরুগিরি ক'রে জীবন কাটিয়েছেন।

১০৬২। "কেদার বললে – অন্য জায়গায় খেতে পাই না এখানে এসে পেটভরা পেলুম!"

ব্যষ্টি প্রশংসায় সংকোচ নেই। অষ্টপাশের বন্ধন খুলে গেছে।

১০৬৩। "যদি তা হয়ে থাকে, ত' তাই।"

ব্যষ্টি ঠাকুর নিজেকে ধরা দিলেন। ভক্তের কাছে ভগবান ধরা পড়লো।

বিশ্বব্যাপিত্ব "হয়ে থাকার" প্রমাণ – বহুত্বে একত্ব – জগৎ বলবে – নিজেকে বলতে হয় না।

– গীতাকারের "স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে" – নয়।

১০৬৪। "শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।"

ব্যষ্টি ভক্তের স্পর্শে ঠাকুরের দেহে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে।

১০৬৫। "কি একটা হয় আবেশে"–

ব্যষ্টি ঈশ্বরীয় আবেশ। দেহের ভিতর দেখতে পাওয়া যায়। ঘোলাটে ঝড়ের মতন বেরিয়ে আমার 'আমি' বোধকে ঢেকে ফেলে।

১০৬৬। "'আমি' আর 'আমি' থাকি না।"

ব্যষ্টি 'আমি' থাকে না।

১০৬৭। "এক দু'য়ের পার!"

ব্যষ্টি এক – অদ্বৈত। দুই – দ্বৈত। কোন বোধ নেই – বোধাতীত।

১০৬৮। "বই"

ব্যষ্টি রজোগুণের চিহ্ন।

১০৬৯। "ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না।"

ব্যষ্টি ঠাকুর।

১০৭০। "পাঁচসের সন্দেশ ও একখানা কাপড়।"

ব্যষ্টি কাপড় – দেহ।

দেহের মধ্যে ভগবান – ভগবানের লীলা – ভাগবত – সন্দেশ।

১০৭১। "আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ রকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়।"

ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দগুরু আত্মাকে দেখিয়ে দেন।

১০৭২। "তুমি গম্ভীরাত্মা"

ব্যষ্টি তোমার অন্তরে অনুভূতি – দেহফুঁড়ে অনুভূতির চিহ্ন বেরোবে না। অর্থাৎ অনুভূতি – সামান্য মাত্র – এ খুব প্রশংসা নয়। "কলির জনক"-এর মতন কথা।

১০৭৩। "রূপ সনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না।"

ব্যষ্টি মহাপ্রভুর ভাব সকলে টের পেতো।

রূপ সনাতন শ্রেষ্ঠ না মহাপ্রভু শ্রেষ্ঠ ?

১০৭৪। " তোর হৃদয়ে বিরহ অগ্নি সদা জ্বলছে; চক্ষে জল উঠছে, আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে !"

ব্যষ্টি জল – ভাব জলরূপে বেরিয়ে যাওয়া ভাল নয়। বহিরঙ্গ ভক্তি। ভাব বায়ুরূপে সহস্রারে উঠে গেলে – সমাধির বিলাস – ব্রহ্মানন্দ।

১০৭৫। "ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি !"

ব্যষ্টি জটিয়াবাবা কারণশরীর দর্শন করেছেন। কারণশরীর ঠাকুরের রূপ ধারণ করেছেন। আত্মা জানিয়ে দিচ্ছেন – জীবন্ত বিগ্রহ হয়ে এই মূর্তি ধারণ করে আছি। সচ্চিদানন্দগুরু কারণশরীরে থাকেন।

১০৭৬। "আমিও এঁকে নিজ অনেকবার দেখেছি !"

ব্যষ্টি স্বামীজীরও কারণশরীর দর্শন – সচ্চিদানন্দগুরু দর্শন।

২৬-১০-১৮৮৫

শ্যামপুকুর

১০৭৭। "যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে।"

ব্যষ্টি বিবেক– সহস্রারে মন না গেলে ষোল আনা বিবেক হয় না।

বিবেক – জ্ঞান – ঈশ্বর সৎ আর সমস্ত অসৎ। ঈশ্বর আছেন, অর কিছু নেই – অস্তিমাত্র – ব্রহ্মজ্ঞান – এই হল প্রকৃত বিবেক।

ঠাকুর, ভাই ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–'তুমি কি চাও ?' ভাই ভূপতি – 'আমি বিবেক চাই।' ঠাকুর – 'সপ্তমভূমিতে বিবেক–আচ্ছা, তোমার মন সপ্তমভূমিতে থাকবে।'

বৈরাগ্য – বিদেহ অবস্থা। এটিও ব্রহ্মজ্ঞানে হয়।

আমি দেহ নই – নেতি, নেতি শুদ্ধাত্মা।

'ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ।'

সংসার কোথায় তলিয়ে যায়, তার পাত্তা থাকে না।

ঈশ্বরে অনুরাগ ক্রমশঃ প্রেমে পরিণত হয়।

মহাবায়ু জাগ্রত হয়েছে – সামনে দিয়ে উঠছে—দেহটা ভাঙ্গা পেঁটরার মতন ঢপর ঢপর করে – যখন মহাবায়ু সহস্রারে ওঠে – 'প্রেম হলো ত' ঈশ্বরকে বাঁধবার রজ্জু হলো' – এই হলো প্রেমের দৈহিক লক্ষণ।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণে প্রেম হয়েছিল – দেহ ভুল হয়ে যায়। ঠাকুর ন্যাঙটো হয়ে যেতেন – যখন দেহে প্রেম সঞ্চার হতো। দেহজ্ঞান বিবর্জিত হয়ে যেতেন। এই হচ্ছে প্রকৃত বৈরাগ্য।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বে – বিবেক বৈরাগ্যের রাগিনী নেই।

মানুষের জন্মগত অধিকার।

আপনা হতে হয় – একত্ব।

এই একত্বেই—

"তেষাং সুখং শাশ্বতং"

"তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী।"

সুখং – অন্তরে দেখে সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান।

শান্তি – নিরদ্বন্দ্ব (নির্দ্বন্দ্ব) – এক।

১০৭৮। "ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটি অবস্থা হয়।"

ব্যষ্টি ঈশ্বরের পাদপদ্ম – ষষ্ঠভূমিতে। কিন্তু মন ষষ্ঠভূমিতে থাকছে না – সপ্তমভূমিতে প্রবেশ করছে।

১০৭৯। "পরনের কাপড় পড়ে যায়, শিড়্, শিড়্ ক'রে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি একটা উঠে"।

ব্যষ্টি প্রাণশক্তি পা থেকে উঠতে আরম্ভ করে—প্রত্যেক ভূমিতে পরিবর্তিত হয়ে, সহস্রারে 'জড়' হয় – দেহ ক্ষীণ হয়ে যায় – আর পরনের কাপড় খসে পড়ে।

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপিত্বে – বহুত্বে একত্বে – ন্যাংটো হয়ে পায়চারী করতে হয় না। ন্যাংটো হওয়া – ইচ্ছাকৃত অভ্যাস।

"ন্যাংটা"(তোতাপুরী)-র সঙ্গে থেকে ন্যাংটো হওয়ার ইচ্ছা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হয়েছিল – কালে কাপড় খসে যেত।

পরমহংস বা অবতার মানে কাপড় বগলে ক'রে, ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ানো নয়!

১০৮০। "তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়"।

ব্যষ্টি কিছু নেই ব'লে বোধ হয়।

১০৮১। "তাঁকে তর্ক ক'রে কি বুঝবে!"

ব্যষ্টি তর্কে বহু দূর – ভগবান তর্কের বস্তু নন।

ঈশ্বর বস্তু দেহে ধারণা হয় – সহস্রারে দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন ভাগ্যবান লোক আছেন – যিনি মুহুর্মুহু ভগবান দর্শন করেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুকে দেখে বুঝেছিলেন – ঈশ্বর বিচারের বস্তু নন।

দয়ানন্দ সরস্বতী ঠাকুরকে দেখে বুঝেছিলেন – ব্রহ্ম বেদপাঠের বস্তু নন।

১০৮২। "তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝবে!"

ব্যষ্টি তিনি যদি তোমার দেহে স্ফুরিত হয়ে মায়ার রহস্য ভেদ করেন – তবে তাঁর সৃষ্টি কত বড় ভেল্কি তা বুঝতে পারা যায়।

' কি দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজি এ সংসারে।' বাজি – সৃষ্টি।

"আবার এ সংসার মজার কুঠী।"

১০৮৩। "আহার, নিদ্রা আর মৈথুন।"

ব্যষ্টি জীবত্ব – পশুত্ব।

১০৮৪। "মূলো খেলেই মূলোর ঢেঁকুর উঠে।"

ব্যষ্টি ভিতরের বস্তু বাইরে প্রকাশ পায়।

১০৮৫। " ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল।"

ব্যষ্টি ১১ বছরে আত্মা ঠাকুরের দেহে প্রকাশ পেয়ে – সচ্চিদানন্দগুরুরূপে ঠাকুরকে ধারণ করেছিলেন।

১০৮৬। " সেই দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম।"

ব্যষ্টি মন অন্তর্মুখী হয়ে গেল।

১০৮৭। " নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলুম।"

ব্যষ্টি দেহেতে ভগবান কারণশরীরে অবস্থান করছেন তাই দেখছেন।

১০৮৮। "আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এসব বলে কে?"

ব্যষ্টি ঠাকুরের ভিতর ভগবান, তিনি বলেন। ব্যবহারিক জীবনে ঠাকুর বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না। অথচ বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র ছাড়া অন্য কথা তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে বেরোত না, –এই দৈবলীলা।

ভগবান ঠাকুরকে উপলক্ষ্য ক'রে জানাচ্ছেন – সমস্ত আমার (ভগবানের) ভিতর।

ঠাকুর বলতেন, – 'আমি কেঁদে কেঁদে বলতুম, মা আমি মুখ্যু, আমায় শিখিয়ে দাও, বেদ, বেদান্তে, পুরাণ, তন্ত্রে কি আছে – মা আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন।'

বিশ্বব্যাপিত্ব "মা" বড় ভুল শিখিয়েছেন। এসব কারণশরীরের লীলা – ঠাকুর "কত" শুনেছেন – সেই সবের প্রতিধ্বনি মাত্র – আর সমস্তই "মতবাদ"– Different Opinions Subject to dispute. "ঋতং" – অনুভূতি – নয়। সত্য – বহুত্বে একত্ব – প্রমাণ সমেত।

১০৮৯। **"শ্রীমতী যখন সহস্রধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন,"-**

ব্যষ্টি সহস্রধারা কলসী – দেহ। দেহের স্বভাব সর্বক্ষণ বহির্মুখী।

১০৯০। **"জল একটুও পড়ে নাই"।**

ব্যষ্টি সর্বদাই অন্তর্মুখী মন – অন্তরস্থ – যোগযুক্ত।

১০৯১। **" তোমরা আমার জয় কেন দাও, বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয় !"**

ব্যষ্টি কৃষ্ণ কৃপা ক'রে এরকম করেছেন – তাঁর কৃপা। আমি কিছু নই।

১০৯২। **" এ দিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি,"**

ব্যষ্টি ঠাকুরের ব্যবহারিক জীবন। 'গোঁসাই দেখলে আমি সাষ্টাঙ্গ দিই'।

বিশ্বব্যাপিত্ব সংস্কারজ আচার। নিজেকে নিজের প্রণাম করবার দরকার হয় না।

১০৯৩। **" সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম,"**

ব্যষ্টি ভিতরে ভগবান প্রকাশ হলেন – তিনি বিজয়কে কৃতার্থ করবেন ব'লে, বিজয়কে পা দিয়ে স্পর্শ করলেন।

১০৯৪। **"সাবধান হওয়া উচিত; হাত জোড় করলে কি হবে ?"**

ব্যষ্টি ডাক্তার মহাশয় কিছু জানতেন না,বুঝতেন না। কালীয় নাগের ভিতর শুধু বিষ, তাই সে শুধু বিষ ঢালে।

১০৯৫। **"তখন কি আমি কিছু করতে পারি ?"**

ব্যষ্টি তখন 'আমি' থাকে না – শুধু 'তিনি'।

১০৯৬। **"তিনিই মানাবেন।"**

ব্যষ্টি ঈশ্বরের জগৎ – তিনি যা করছেন, তাই হচ্ছে; তিনি যা করাবেন তাই হবে।

১০৯৭। **"হয় তাই বল, নয় চুপ ক'রে থাকো।"**

ব্যষ্টি চুপ ক'রে থাকলেও সেই একরকমই হবে – যা তাই।
ডাক্তারমশাই গোলা লোক – এসব জানতেন না।

১০৯৮। **"মাটির নীচে এক ঘড়া মোহর আছে – "**

ব্যষ্টি দেহেতে ভগবান আছেন।

১০৯৯। **"এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, প্রথমে চাই।"**

ব্যষ্টি এ নিত্যসিদ্ধের কথা।

১১০০। **"তারপর খোঁড়ে।"**

ব্যষ্টি সাধন হয়।

১১০১। "খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হ'লে আনন্দ বাড়ে।"

ব্যষ্টি দেহের ভিতর ভগবানের সাড়া পাওয়া যায়, খুব উদ্দীপনা আসে।

১১০২। "তারপর ঘড়ার কাণা দেখা যায়।"

ব্যষ্টি অনুভূতি আরম্ভ হয়।

১১০৩। "এইরকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে।"

ব্যষ্টি ব্রহ্মানন্দ – পরে সহজানন্দ – নিত্যানন্দ।

১১০৪। "হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বলছে,"

ব্যষ্টি দেহেতে ভগবান।

১১০৫। "তাই ওরা লাফাচ্ছে।"

ব্যষ্টি সাধারণের দিক দিয়ে – জগতের কর্মকাণ্ড।

সাধকের দিক দিয়ে – দেহেতে সাধন, আত্মার স্ফুরণ, ভগবানের লীলা।

১১০৬। "যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়"

ব্যষ্টি সাধারণ – আত্মা দেহকে ছেড়ে যায় – মরে যাওয়া।

সাধক – আত্মা ও দেহ পৃথক হয়ে যায়।

১১০৭। "তা হ'লে আর নড়ে না।"

ব্যষ্টি সাধারণ – মৃত।

সাধক – নিষ্ক্রিয় – চুপ।

১১০৮। "তিনিই একমাত্র কর্তা আর আমি অকর্তা।"

ব্যষ্টি তত্ত্বজ্ঞান – "আমি না, তুমি।"

১১০৯। "সেই জীবন্মুক্ত।"

ব্যষ্টি তিনি দেখিয়ে দেন, জানিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন – জীবন্মুক্ত। আবার, অপরকে জানিয়ে দেবেন। আবার, বিপরীত ভাব পোষণকারী– সেও বলবে – 'ওঁর একটা কি হয়েছে।'

অশ্বিনীবাবু ঠাকুরকে বলেছিলেন, – 'আপনি কিন্তু মজার লোক।' সাদাসিধে গোলা লোক – তারা আর কি বলবে, বলে – মজা – আনন্দ।

এ আনন্দ যে আত্মিক আনন্দ – এ তারা কি করে জানবে!

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বই – জীবন্মুক্তি

– তা নইলে নিছক কল্পনা। কল্পনা রূপ ধারণ করে ঠকায়।

– Self created – self illusion.

১১১০। "তার নাম অহৈতুকী ভক্তি।"

ব্যষ্টি ভক্তির একটি রূপ আছে। দেহেতে প্রকাশ পায়। দেখতে পাওয়া যায়। আপনা আপনি স্ফুরিত হয় – ভক্ত দেখে। অবশ্য এসব খুব পাকা অবস্থায় হয়। ঠাকুর বলতেন – 'মহাবায়ু কখন আপনি উঠেছে টের পাইনি – পরে বুঝলাম আমোদ করছিল'।– এই অহৈতুকী ভক্তি।

১১১১। "কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে।"

ব্যষ্টি মন যেন সর্বক্ষণ ষষ্ঠভূমিতে লগ্ন থাকে।

১১১২। "কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি।"

ব্যষ্টি ষষ্ঠভূমি থেকে বিচ্যুত যেন না হই।

ঠাকুর বলতেন, – 'পঞ্চমভূমি ও ষষ্ঠভূমিতে বাচ খেলান।'

১১১৩। "আনন্দ একটু হয় বটে।"

ব্যষ্টি বিলাস – আমি, তুমি।

১১১৪। "বালকের মত যাচ্ছে – কোন ঠিক নাই।"

ব্যষ্টি শুক চলেছে – সঙ্গীন খাড়া – জগৎ ভুল হয়ে গেছে।

বালকবৎ – কোন উদ্দেশ্য নেই – চংক্রমণ।*

১১১৫। "দু' একটি লোক কর্মত্যাগ করতে পারে।"

ব্যষ্টি 'দু' – মাত্রা মাত্র। একটি লোক – তিনি ঠাকুর।

১১১৬। "দু' একজনের শুদ্ধসত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়।"

ব্যষ্টি 'দু'– এখানেও মাত্রা মাত্র। একজন লোক –তিনি ঠাকুর।

১১১৭। "শুদ্ধসত্ত্ব হলেই ঈশ্বর লাভ তাঁর কৃপায় হয়।"

ব্যষ্টি ভগবানের কৃপায় ভগবান লাভ। শুদ্ধসত্ত্ব একটি অবস্থা।

শান্ত – স্থির সমুদ্র (quiet, even, having no ripple too)।

বিশ্বব্যাপিত্ব "ঈশ্বর লাভ" – বিশ্বব্যাপিত্বে। ব্যষ্টিতে – "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ।" প্রমাণ – একত্বের, "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।"

"আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।"

– রবীন্দ্রনাথ।

"একা আমি হই বহু, দেখিতে আপন রূপ।" –স্বামী বিবেকানন্দ।

"He only lives who lives in all" - Swami Vivekananda.

"ভূমৈব সুখং।" ভূমা – বহু; সুখং – সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান।

"ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" – জগৎ দেখে বলবে –প্রমাণ।

---

* বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর ভাবাবস্থায় যোলবার চরণ বিক্ষেপ করলেন– একে চংক্রমন বলে। অর্থাৎ ভাবাবস্থায় এলোমেলো পা ফেলা।

২৭-১০-১৮৮৫

শ্যামপুকুর

১১১৮। "তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে ওঠো! ভাব চেপে রাখতে হবে।"

ব্যষ্টি ডাক্তার মহাশয় বিকারে রোগী – আবোল তাবোল বকছেন – সূর্যকে বলছেন – 'ওগো সূর্য তুমি কিরণ দিও না'।

১১১৯। "কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট!"

ব্যষ্টি শোনবামাত্র বলবামাত্র – দেহেতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ – তাই সমাধিস্থ।

১১২০। "এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান।"

ব্যষ্টি নিশ্চয় বুদ্ধি – আত্মা-সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার না হলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না।

জগতের মধ্যে ঈশ্বর – আবার ঈশ্বরের মধ্যে জগৎ। ঈশ্বর এক।

বহু দেখা – ভুল হচ্ছে– মায়া। একা অবতার আছেন – আর কিছু নেই।

নিজের দেহে ভগবান – জগতে ভগবান।

বিশ্বব্যাপিত্ব "সর্বভূত" – অন্তরে দেখে–এই একত্বের জ্ঞান দান করবে – জ্ঞানের প্রমাণ এবং প্রকৃত জ্ঞান।

১১২১। "তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান।"

ব্যষ্টি দেহের মধ্যে আত্মা – সেই আত্মার মধ্যে জগৎ। বিজ্ঞানীর প্রথম স্তর। এই বিরাট বিশ্ব – বীজ হয়ে যায়, এই বীজ স্বপ্ন হয়ে যায়, শেষে স্বপ্ন লীন হয়ে যায় – স্থিত সমাধি।

আগমে মায়ার রহস্য ভেদ। আমিও ভেদ – আমাকে নিয়ে মায়া। শেষে মহাকারণে লয় হয়। এই সাধারণ নিয়ম।

পূর্ণ বেদান্ত সাধন যাঁর হয়, তাঁর 'জড়' সমাধি হয়, "স্থিত" সমাধির আস্বাদন মাত্র পান – শুক সচ্চিদানন্দ সাগর দর্শন স্পর্শন করেছিলেন মাত্র। তারপর তাঁরা তত্ত্বজ্ঞানে নেমে আসেন।

১১২২। "পায়ে কাঁটা বিঁধেছে।"

ব্যষ্টি 'আমি' রূপ কাঁটা। কাঁটা বেঁধার যন্ত্রণা – দেহ ব্যাপ্তি। কারণ আমি যে দেহব্যাপ্ত।

১১২৩। "সে কাঁটাটা তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার প্রয়োজন।"

ব্যষ্টি আর একটি কাঁটা – আত্মা – সগুণ আত্মা – আভাস সূর্য। দেহব্যাপ্ত আত্মা– এখন সংকলিত (Collected)। ক্রমশঃ বোধ হওয়া – বহু ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটার পর স্থান ও কালের উচ্ছেদের পর – আমি আত্মা, দেহ নই।

১১২৪। "কাঁটাটা তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়।"

ব্যষ্টি 'আমি'র পূর্ণ নাশ – স্থিত সমাধি – মহাকারণে লয় – নির্গুণ ব্রহ্ম।

১১২৫। "তিনি যে জ্ঞান – অজ্ঞানের পার।"

ব্যষ্টি দ্বৈতভূমি, অদ্বৈতভূমির পার – নির্গুণ।

১১২৬। "নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্!"

ব্যষ্টি বোধমাত্র – বোধিসত্ত্ব অবস্থা।

১১২৭। "ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন।"

ব্যষ্টি হিমালয় – দেহ। যতদিন দেহেতে সচ্চিদানন্দগুরু না উদয় হয়, ততদিন দেহ হিমালয় – পাষাণ স্তূপ। ভগবতী – ভাগবতীতনু – কারণ শরীর।

১১২৮। "তাকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন।"

ব্যষ্টি ভাগবতীতনু বহুবিধ দেবদেবীর মূর্তি ধারণ করে দেখা দিলেন – উঁচু সাকার।

১১২৯। "এইবার আমার যেন ব্রহ্মদর্শন হয়।"

ব্যষ্টি আত্মা সাক্ষাৎকার।

১১৩০। "বাবা' ব্রহ্মদর্শন যদি করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।"

ব্যষ্টি সাধু – সৎ – আত্মা।

সাধুসঙ্গ – আত্মা দেহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে,– তবে সাধুসঙ্গ হয়। এই ভাগবতীতনু কৃপা করে যদি আত্মায় পরিবর্তিত হয় – তবে সাধুসঙ্গ। আর এই আত্মাসাক্ষাৎকারকে ব্রহ্মদর্শন বলে।

আত্মাসাক্ষাৎকার, ভগবান দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান – তিনই এক।

১১৩১। "যে দিল্লী গিছলো, সে কি বলে বেড়ায় আমি দিল্লী গেছি, আর জাঁক করে?"

ব্যষ্টি না, তাকে বলে বেড়াতে হয় না। তার দেহের যোগৈশ্বর্য জানিয়ে দেয় – ইনি সহস্রারে ভগবান দর্শন করেছেন।

অবশ্য, যারা জানবার তারা জানবে, যারা বোঝবার তারা বুঝবে। এরকম মহাপুরুষ মুখে ভাগবত বলবেন – আর এঁদের শরীরে ভাগবত ব্রহ্মবিদ্যা রূপে প্রকাশ পাবে।

বেদ – জ্ঞান, শরীরে ধারণা হয় আর প্রকাশ পায়। প্রকাশ পেলে তবে ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১৩২। "যে বাবু, সে কি বলে, আমি বাবু!"

ব্যষ্টি না, বাবুকে বলে বেড়াতে হয় না। সচ্চিদানন্দ যাদের কৃপা করে বাবুকে

জানাবেন, তাদের ভিতরে বাবুর আকার ধারণ করে বলবেন – 'আমি যুগে যুগে অবতার।'

নিজের ভিতরে না দেখলে– লোকের বিশ্বাস হবে না। একজন দেখবে যে তা নয়– কতকগুলি ভক্ত দেখবে। তারা বুঝবে – ইনি বাবু। 'অবতারকে সকলে জানতে পারে না। ভরদ্বাজাদি দ্বাদশ জন মাত্র ঋষি রামকে অবতার বলে জেনেছিলেন।'

বিশ্বব্যাপিত্ব বিশ্বব্যাপী আত্মিক একত্ব। "বাবুর" পরিচয় দেবে, বিশ্ববাসীর কাছে অন্তরে এবং বাইরে।

অন্তরে – চিদ্‌ঘনকায় রূপ সংখ্যাতীত লোক দেখবে, বলবে – বিশ হাজার হলেও হবে না।

বাইরে – জীবন্ত মানুষ। অন্তরে দেখায় জীবন্ত মানুষ – ব্রহ্ম।

সহস্র সহস্র বৎসর আগে বেদ তারস্বরে ঘোষণা করেছে –

"এবম্ এব এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ
উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ।"

১১৩৩। "শালাদের নিজের ভিতরে যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।"

ব্যষ্টি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে ভগবানের বিচার করে।

সে শুধু নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।

তুমি বিচার করে বুঝতে যেও না। ভগবান যদি কৃপা করে বুঝিয়ে দেন – তবে বুঝতে পারবে, তা নইলে নয়।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বে – "শালা" নাই – আছে বহুত্বে "একত্ব"।

১১৩৪। "যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে।"

ব্যষ্টি ঠিক ভক্তের দৃষ্টি ভগবানে আবদ্ধ। তাদের দৃষ্টি কখনও অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না। মধুকর ফুলেই বসে। চাতক আকাশের জল খায়।

ঠিক ভক্ত জানেন ভগবান কৃপা করে তাকে বুঝিয়েছেন, আবার তিনি যদি কৃপা করে অপরকে বোঝান, তবে সে বুঝবে।

বিশ্বব্যাপিত্ব "ঠিক" আর "বেঠিক" ভক্ত – একত্বে নেই। আছে–"এক" – সব ব্রহ্ম।

১১৩৫। "সূক্ষ্মশরীর"-

ব্যষ্টি দেখতে পাওয়া যায় – বায়বীয় মূর্তি। স্বপ্নে উড়ে বেড়ায় যে শরীর – সেটি সূক্ষ্মশরীর।*

---

* আরও একরকম সূক্ষ্ম শরীর ধ্যানে দেখা যায় – নিজের অল্পাকৃতি ছোট প্রতিরূপ – সামনে এবং পেছনে – ধ্যানমগ্ন।

১১৩৬। "কারণশরীর"

ব্যষ্টি দেখতে পাওয়া যায় – চিন্ময়। মোমের তৈরী। এই কারণশরীর ইষ্টমূর্তি ধারণ করে দেখা দেন। আবার ইনি বহুবিধ দেব-দেবীর মূর্তি ধারণ করেও দেখা দেন।

১১৩৭। "মহাকারণ"

ব্যষ্টি যেখানে সব লয়।

ওপরের ভাগটি তন্ত্রমতের ভাগ – বেদমতের নয়।

১১৩৮। "কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সূতা, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের।"

ব্যষ্টি সমাধির তারতম্য। বহুবিধ সমাধি। এক সূতার ফারাকে অনুভূতির অনেক তফাৎ।

মস্তিষ্কের এক একটি তন্তুকে এক একটি খালের মত দেখায়!

১১৩৯। "যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে।"

ব্যষ্টি হরিপাদপদ্ম ষষ্ঠভূমিতে।

মন ষষ্ঠভূমিতে গুটিয়ে এসে বিন্দুতে পরিণত হলে – উন্মনা সমাধি। 'ছড়ানো মন গুটিয়ে আসা।' ষষ্ঠভূমির বহু অনুভূতি–রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন, ইষ্ট দর্শন, বহুবিধ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, জ্যোতিদর্শন, পর্দার আড়ালে সূর্য দর্শন, ইত্যাদি।

১১৪০। "আমি মা'র কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম।"

ব্যষ্টি কখন?

মা যখন সামনে এসেছিলেন। শুদ্ধসত্ত্ব ঐশ্বর্যময়ী বিদ্যারূপিনী মা, সামনে। মায়ের ইচ্ছা সন্তানকে বিদ্যার ঐশ্বর্য কিছু দান করেন। ভক্ত তা নেয় না। তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের মাথায় দেয়, আর বলে, -'মা, ঠাকুরের পায়ে যেন আমার ভক্তি হয়।'

মা আরও সন্তুষ্ট হন, আর ভক্তের শরীরে মিলিয়ে যান।

১১৪১। "যদি কারও শূকর মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য।"

ব্যষ্টি আহার্যের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নেই। ভগবানের কৃপাই সার।

বিশ্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মত্ব বা বিশ্বব্যাপিত্ব বা একত্ব, – প্রতিবন্ধকহীন – অপ্রতিহতগতি।

"শূকর মাংস" – আর "দুর্বাঘাসের রস" একই কথা।

পরাবিদ্যা – একত্ব – স্বয়ম্ভু – সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

১১৪২। "মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।"

ব্যষ্টি মন হরিপাদপদ্মে। মন ও দেহ আলাদা।

১১৪৩। "যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক।"

ব্যষ্টি ব্রহ্মজ্ঞানের পর তত্ত্বজ্ঞানে যাঁরা ফিরে আসেন, তাঁরা শিষ্য করতে পারেন না।
যাঁরা বুঝেছেন ঈশ্বর কর্তা – ঈশ্বরের জগৎ, তাঁরা শিষ্য করতে পারেন না।
যাঁরা সাধন রহস্য বোঝেন, তাঁরা শিষ্য করতে পারেন না।
: 'আত্মার বরণ করা' যাঁরা দেখেছেন তাঁরা শিষ্য করেন না।
সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা আর গুরু সাজতে পারেন না।
"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না।"
"সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই।"

সচ্চিদানন্দগুরু না হলে কুণ্ডলিনী জাগেন না – সাধন ভজন হয় না।

বিশ্বব্যাপিত্ব একত্বে – "শ্রীগুরু" আর "ভাগ্যহীন শিষ্য" নেই।

১১৪৪। "কেবল এক রাম চিন্তা করি।"

ব্যষ্টি মন রামময়। সেখানে অপর কোন বস্তুর স্থান নেই। রাম – এক।

বিশ্বব্যাপিত্ব এক বা একত্ব "চিন্তা" নয়। বাস্তব।

১১৪৫। "আমি টাকা লই না, কাপড় লই না।"

ব্যষ্টি সাধুর ব্যবহারিক জীবন। তিনি কারোর কিছু নেবেন না। দিতে এলেও না। 'ও সাধু হয়েছে ত' অপরের টাকা নেয় কেন?'

১১৪৬। "তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে – ঈশ্বরের আশ্চর্য কান্ড সব দেখে।"

ব্যষ্টি বিকারে রোগীর উক্তি।

১১৪৭। "আর সব কর– but do not worship him as God (ঈশ্বর বলে পূজা ক'রো না।)"

ব্যষ্টি ডাক্তারবাবু জানতেন না, এক অবতারের মধ্যেই ভগবান্ – ভগবানের প্রকাশ আর কোথাও নেই।

অবতারের মধ্যেই দেবলীলা, ঈশ্বরলীলা, জগৎলীলা, আর মানুষলীলা। একা অবতার আছেন। আর কিছু নেই।

"শুধু নৃমুণ্ডস্তুপ – আর তার ওপরে একা ঠাকুর বসে আছেন।"
"যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য" – সে চৈতন্য ঠাকুরের ভিতর।

১১৪৮। "সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ।"

ব্যষ্টি ডাক্তারবাবু ভক্তদের পায়ের ধূলা গ্রহণ করে শুদ্ধ হচ্ছেন। অজ্ঞাতসারে হচ্ছে – দেবলীলা।

১১৪৯। "যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ, না ঈশ্বর।"

ব্যষ্টি ঈশ্বর – বাইরেও ঈশ্বর, ভিতরেও ঈশ্বর। ঠাকুরকে বাইরে দেখতে পাওয়া যায়, আবার দেহের ভিতরেও দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ্বব্যাপিত্ব জৈমিনি বলছেন –

‘সংখ্যাতীত লোক এই উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তমকে তাঁর জীবদ্দশায় দেখবে’– তবে হবে।

বিশ হাজার লোক দেখলেও হবে না।

মৃত– “ব্রহ্মলীন”। তখন দেখলে কিছুই নয়।

১১৫০। “বলে, ‘আমি যা বল্লুম, তাই ঠিক।’ এ কি কথা!”

ব্যষ্টি ডাক্তারবাবুর ভুল। তাঁরা যা বলেছেন, সে যুগোপযোগী – ঠিক। তাঁদের ভিতর থেকে চৈতন্য ঐ কথা বলছেন।

১১৫১। “We offer to him Worship bordering on Divine Worship (এঁকে আমরা পূজা করি, সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি)।”

ব্যষ্টি এও ভুল

অবতারই ভগবান।

“কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।”

বিশ্বব্যাপিত্ব স্বামীজী বলেছেন – “সেই শ্রীধরই ধন্য, যিনি বলতে পেরেছেন কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং”

শ্রীধরস্বামী কিংবা ভাগবত প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণের বেদোক্ত ভগবানের প্রমাণ “স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে” দেননি!

গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তমের বেদোক্ত প্রমাণ–

“স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ” দেননি!

পরমপদ বা ব্রহ্মপদ – উত্তমপুরুষের লক্ষণ – তিনি এক – “বশী” - নিয়ন্তা – আর আত্মিক একত্বই – প্রমাণ।

বেদের সেই চিরপরিচিত বাণী

“ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ”

বা “ভূমৈব সুখং”

– ব্রহ্মত্ব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পুরী - ১৫-৮-১৯৬৩